শব-সাধন

(ধর্ম্মমূলক উপন্যাস)

শ্রীসূর্য্যকুমার সোম
প্রণীত ।

কলিকাতা
১২ নং চোরবাগান লেন বাণী প্রেস হইতে
শ্রীগোষ্ঠবিহারী কয়ড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১।০ বাঁধাই ১॥০

শব-সাধন।

প্রথম কল্প

"উঃ—আর যে সহ্য হয় না—এখন মরিলেই বাঁচি!" একটী সামান্য ক্ষুদ্র কুটীরাভ্যন্তর হইতে মুমূর্ষার শুষ্ককণ্ঠে অতি ক্ষীণস্বরে এই কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইল। অনতি-দূরে গৃহকার্য্যরতা বিন্দুর কোমলপ্রাণে সে কথা শেলবৎ বাজিল। অমনি ত্রস্তভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল—"দিদিমণি কি চাই বল।" তৃষ্ণায় ইন্দুর কণ্ঠ শুকাইতেছিল অতিকষ্টে অনুচ্চস্বরে কহিল, "একটু জল।" বিন্দু ইন্দুর মুখে জল দিল; সে জলবিন্দু গলাধঃ হইলে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইয়া ইন্দু কহিল—"আর ত সহ্য হয় না—এখন যে মরিলেই বাঁচি!" নিশীথে সহসা অশনিসম্পাতে সুষুপ্ত প্রাণ যেমন

চমকিয়া উঠে, ইন্দুর সে মর্ম্মঘাতি হতাশ বাক্য শ্রবণে বিন্দুর প্রাণ ততোধিক শিহরিয়া উঠিল—সে আঘাতে বিন্দুর ক্ষীণ ক্ষুদ্র প্রাণটী যেন ভাঙ্গিয়া গেল—চক্ষে জল আসিল। বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া কাতর বচনে কহিল—"সে আর কোন্ বড় কথা।" পরিত্যক্ত অসম্পূর্ণ কার্য্য শেষ করিবার জন্য বিন্দু গমনোন্মুখিনী হইলে ইন্দু বলিল—"কোথা যাস্ খানিক এখানে বোস্।"

বিন্দু—বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? সন্ধ্যা হয়ে এল এখনও উনুনে হাঁড়ি চড়িল না—সারাদিন হয় ত গোসাঞীর জলবিন্দুও জোটে নাই—কুটীরে ফিরিয়াও যদি এক মুঠো ভাত না পান, তবে তিনি কি মনে করিবেন?

সে কথা শুনিয়া ইন্দু বিন্দুর অনিন্দ্য মুখখানি দেখিতে দেখিতে কিয়ৎকাল কি ভাবিল; ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে জল আসিল; ইন্দু স্বীয় ললাট টিপিয়া কহিল,—"সে ও বোন্ অদৃষ্ট, স্বামীসেবা স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য—নারীর জীবনে মহাসুখ—আমাদের জন্য ভগবান সে ব্যবস্থাও করেন নাই। ঠাকুরের কষ্ট আর দেখা যায় না—যাও আর ব'সে কাজ নাই।" সে কথা শুনিতে শুনিতে বিন্দু সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া গমনোদ্যত হইলে ইন্দু আবার কহিল—"বিন্দু চেলী?" বিন্দু সে কথার উত্তর না দিয়া দুটী কাষ্ঠগোলক সহ ক্রীড়মানা শিশুটীকে মায়ের পার্শ্বে আনিয়া দিল। সহসা আঁধার হইতে আলোকে আসিয়া শিশুটী আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল; হাসি মুখে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; মা রোগক্লিষ্ট দেহখানি ঈষৎ

করিয়া মেয়ের মুখে চুম খাইল—সে সোহাগে মেয়ের মুখে আবার হাসি ফুটিল—নবোদ্গত কুন্দকলিবৎ দশন কয়টী বিকাশ করিয়া আধ আধ স্বরে ডাকিল—"মা"—"মা"। প্রভাতি গোলাপসদৃশ সে সুন্দর সরল হাসি দৃষ্টে ইন্দুর শুষ্ক মুখেও হাসি ফুটিল। মা ও মেয়ের সে সুখের হাসি দেখিয়াও বিন্দুর ব্যথিত প্রাণে হাসি ফুটিল না! বালিকা হাসিল মায়ের সোহাগ পাইয়া মাতা হাসিল মেয়ের রঙ্গ দেখিয়া—আর বিন্দুর মুখে হাসি আসিল না—"এ সুখ বাসর ত্যজিতে আর বেশী দিন বাকী নাই বলিয়া।" বিন্দু রোগীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন আর্ত্তার কাল ফুরাইয়া আসিতেছে। ক্ষণকাল সে কুটীর নীরব—নিস্তব্ধ দুই ভগ্নীই যেন মন্ত্রমুগ্ধা! সে সুযোগে শিশুটী আবার খেলায় মন দিল; বিন্দুও ধীরে ধীরে গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেল। ইন্দু মনে ভাবিল—"এমন লক্ষ্মী বোন্ ক'টা হয়।" বিন্দু ইন্দুর কনিষ্ঠা ভগিনী।

দ্বিতীয় কল্প

দক্ষিণ প্রদেশে গোদাবরী নদীর তীরে করোঞ্জা নামে একখানি গণ্ডগ্রাম ; অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শ্রমজীবিগণের সংখ্যাই অধিক। গ্রামটী দরিদ্রপ্রধান বলিয়া উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা নাই ; যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সে সময় পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটে নাই, সুতরাং তৎপ্রদেশে মহারাষ্ট্রদেরই প্রাধান্য ছিল। শ্রমজীবিগণ প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম করিয়া মহাসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত—আর যাজনিকতাই ব্রাহ্মণ সন্তানের একমাত্র জীবনোপায় ছিল। করোঞ্জায় সুন্দর সৌধমালার সৌষ্ঠব না থাকিলেও প্রাকৃতিক শোভা তত বিরল ছিল না। গ্রামের চারিদিকে শস্যশালী শ্যামল ছোট বড় মাঠ, কোথাও কুসুমবাটিকা—শিবপূজার ফুল ভাণ্ডার—কোথাও দীর্ঘিকার পারে পারে শাল, তমাল ও নাগকেশরের ঝাড়—শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় মিশিয়া একাত্মভাবে বিশ্বকুটুম্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে ; কোথাও সরসীর স্বচ্ছসলিলে মরালমালা শৈবালদল পদদলিত করিয়া মৃণালাসনাসীনা পদ্মিনীর প্রীতিসংবর্দ্ধনার্থ ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া মন্থর-গমনে ইতস্ততঃ সাঁতার কাটিতেছে ; কোথাও নিভৃতকোণে নিরীহ ক্রৌঞ্চমিথুন সভয়ে জল-স্থলের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া চুণা পুঁটীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে—উদ্দেশ্য উদর পূরণের ব্যবস্থা ; স্থূলকথা করোঞ্জা গণ্ডগ্রাম হইলেও গ্রাম্য শোভা—শান্তির অভাব ততটা ছিল না।

যে সময়ের ঘটনা লইয়া এ আখ্যায়িকা আরম্ভ করা হইল তাহার প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এখানেই বলা আবশ্যক। সে সময়ে ভারতে মুসলমান রাজত্ব বিলুপ্তপ্রায়। ধীরে ধীরে ইংরাজ রাজত্ব ভারতময় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রামরাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিতেছিল; সে সময়ে মধ্যভারতে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে—বিশেষতঃ গোদাবরী প্রদেশে দুর্ব্বৃত্ত পীণ্ডারীগণ একান্ত দুর্দ্দম্য ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের অসীম অত্যাচারে নিরীহ গৃহস্থগণ প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী কন্যা লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না—অবিবাহিতা কন্যা লইয়া পিতা মাতার সুনিদ্রা হইত না; গর্ভে সন্তান রাখিয়াও গর্ভবতীর সোয়াস্তি ছিল না। এক কথায় সে সময়ে উক্ত প্রদেশ সমূহে অরাজকতার পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল। মধ্যবিৎ ও দরিদ্র লোকের জাতি মান রক্ষা করিয়া গৃহবাস একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ভদ্রপরিবারগণ কুল মান রক্ষার্থ দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলায়নপর হইল; যাঁহারা সংসারের মায়া প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, বেগতিক বুঝিয়া তাঁহারা বিন্ধ্যাচলের যোগাশ্রমে আশ্রয় লইলেন; কেহ কেহ বা পবিত্র বারাণসীধামে দণ্ডী-দলে আশ্রয় লইয়া যোগব্রতাবলম্বন করিলেন। কতকগুলি লোক পেটের দায়ে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল; কালে এই শেষোক্ত দলই মধ্যভারতে ঠগী নামে পরিচিত হইল। দল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দান্ত পীণ্ডারীগণ চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ

হইয়া পড়িল; মধ্যভারতে নাগপুর ও দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা ও গোদাবরী প্রদেশ ইহাদের প্রধান লীলাস্থল হইল; ঠগীদমন ইংরাজরাজত্বের অক্ষয়কীর্ত্তি; সেই সূত্রাবলম্বনেই এই আখ্যায়িকা প্রকটিত হইল।

সে শঙ্কটময় সময়ে রামানন্দ ভট্ট নামে জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ পরিণিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক মাতৃহীন অপোগণ্ড পঞ্চম বর্ষীয় একমাত্র পুত্র প্রেমানন্দকে করোঞ্চায় স্বীয় সহোদরার হস্তে সমর্পণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে যোগাশ্রম গ্রহণ করিলেন। রামানন্দ ধর্ম্মভীরু যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ; ভগবতীর স্তোত্র তদীয় নিত্যপাঠ ও কাত্যায়নীর পূজা নিত্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহার মুখে মধুর স্তোত্র পাঠ শুনিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করিতেন বলিয়া সকলেই আদর করিয়া ডাকিতেন "পাঠকজী।" শ্রোতৃবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য পাঠকজী পর্য্যায়ক্রমে মহাভারত, হরিবংশ বা পুরাণ পাঠ করিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতেন। ফলতঃ পাঠকতা, মূলগ্রন্থের শুদ্ধ ও সুশ্রাব্য ব্যাখ্যা অতি সুকঠিন; কিন্তু রামানন্দের হৃদয়গ্রাহী পাঠকতায় বিশেষ অধিকার ছিল; তদীয় পিতা দুর্গানন্দ ভট্ট ও একজন সুপাঠক ছিলেন; ধর্ম্মে মতি ও দেব দেবীতে ভক্তি তাঁহার অচলা ছিল; সেই ধর্ম্মচিন্তায় আত্মহারা হইয়া দুর্গানন্দ সংসারকর্ম্ম ভুলিয়া গেলেন; রামানন্দের বয়স যখন ১৩ বৎসর, তখন তিনি সংসারত্যাগী হইলেন, আর করোঞ্চায় ফিরিলেন না। পিতৃশিক্ষামূলে—কর্ম্মফলে রামানন্দও সন্ন্যাস গ্রহণান্তর গৃহত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসী হইলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনাশ্রয়

প্রেমানন্দ পিতৃস্বসার গলগ্রহ হইয়া করোঞ্চার সে ক্ষুদ্র কুটীরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

ক্রমে সেই পঞ্চম বর্ষীয় বালক যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। তখন ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়; ইংরাজ রাজত্বের নবযুগ; ঠগীর অসহ্য অত্যাচার—ঠগীজ্ঞানে যোগী সন্ন্যাসীর উপর তুমুল প্রলয়। সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ মাত্র; ধর্ম্ম-যাজক পাদরীগণ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলিয়া ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষার বীজ উপ্ত করিতেছিল; ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের উপর তীব্র কটাক্ষ কখনও বা পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ চলিতে লাগিল; সে জন্য অনেকেই মাতৃভাষা ছাড়িয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষার তত পক্ষপাতী ছিলেন না বরং তদ্বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মযাজকগণ ভয়ে ভয়ে খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণের সংস্রব হইতে দূরে দূরে থাকিতেন; আর্য্যভাষা ব্যতীত অনার্য্য ভাষার চর্চ্চা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং সামান্য এক চতুষ্পাঠীতে প্রেমানন্দের শিক্ষারম্ভ হইল; সুশিক্ষা বিশেষতঃ সৎসংসর্গগুণে ততোধিক পৈতৃকধর্ম্মে ক্রমে প্রেমানন্দের মনে বৈরাগ্য আসিল; একদা নিশীথে প্রেমানন্দ গৃহত্যাগ করিলেন। পুণ্যধাম বারাণসীক্ষেত্রে এক পরমহংসের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া পরিব্রাজকাশ্রম গ্রহণ করিলেন। কোনও প্রতিকুল ঘটনাবশতঃ প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পরে প্রেমানন্দ আবার গৃহে ফিরিলেন। শনকা পিসীমা সে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রপ্রতিম অন্ধের যষ্টি প্রেমানন্দকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিতা হইলেন। শনকাদেবী বালবিধবা ও নিঃসন্তান; প্রিয়ভ্রাতা রামানন্দের

পত্নীবিয়োগের পর অপোগণ্ড শিশু প্রেমানন্দের লালনপালনের ভার ও ভাইয়ের সংসার শনকার হাতে পড়িল। তাহার স্নেহযত্নে প্রেমানন্দ মুহূর্ত্তেকের জন্য ও মাতৃস্নেহের বিরলতা অনুভব করিতে পারেন নাই।

গৃহে ফিরিবার পর প্রেমানন্দ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কপোল-কল্পিত প্রশংসা বা কুৎসা চলিতে লাগিল; যাঁহারা সরল ও সত্যনিষ্ঠ তাহারা প্রেমানন্দের বিনয় বচন ও বিশুদ্ধ আচার ব্যবহারে ততোধিক শাস্ত্রালাপনে ভাবিলেন প্রেমানন্দ ধর্ম্মভীরু মহাপুরুষ; আর পরশ্রীকাতরতা যাহাদের অঙ্গভূষণ, তাহারা বলিতে লাগিল "প্রেমানন্দ দীর্ঘকাল দস্যুবৃত্তি দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়াছে; ইংরাজের ফৌজ সন্ধান পাইলেই ভণ্ড তপস্বীকে জেলে পুরিবে।" কিন্তু সে ব্যক্তিগত মতামতের উপর প্রেমানন্দের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিল না। ক্রমে তদীয় মহত্ব স্বতঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল; ক্রমে সকলে বুঝিল প্রেমানন্দ প্রকৃত ভক্ত—বৈষ্ণব প্রধান ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তখন যাহাদের পুত্র কন্যার জন্মপত্রিকা লেখাইবার দরকার হইল—তাহারা কাছে আসিয়া আত্মীয়তা করিতে লাগিল; যাহাদের কন্যা শ্বশুরের ঘর হইতে আনাই-বার বা শ্বশুরালয় পাঠাইবার প্রয়োজন হইল তাহারা আসিয়া দরবার করিয়া আসর জাঁকাইতে আরম্ভ করিল। সকলে আদর করিয়া ডাকিত—গোসাঞী বা গোসাঞীঠাকুর। গোসাঞীর ন্যায় সকলের সঙ্গে প্রেমানন্দের সমভাব—আত্মপর নির্ব্বিশেষে ছোট বড় সকলের উপর সমদৃষ্টি! সর্ব্বসাধারণে ভক্তি ও

ভালবাসায় প্রেমানন্দের ভাব আধ্যাত্মিক! সকলের বিশ্বাস প্রেমানন্দ প্রকৃত গোসাঞী। অতঃপর প্রেমানন্দ অনেক সময় গোসাঞী বলিয়াই অভিহিত হইবেন।

গোসাঞী গৃহে ফিরিয়াও গৃহী হইবার বাসনা করিলেন না; বরং সংসারের রহস্যময় লীলা হইতে অনেক দূরে থাকিতেন। সামান্য অশন ও গেরুয়া বসনেই পরিতৃপ্ত রহিলেন! মাতৃকল্প শনকাদেবীর প্রাণে সে দৃশ্য অসহ্য হইল; তদীয় হৃদয়ে আঘাত লাগিল; তিনি ভাবিলেন পূর্ণ শশধর হাতে পাইয়াও কুটীরের অন্ধকার বিমুক্ত হইল না। তাঁহার বিশ্বাস, যোগ্য বউ না আনিলে ঘরের শোভা হইবে না। সুতরাং শনকা পিসীমা প্রেমানন্দের বিবাহের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম প্রেমানন্দ পিসীমার অনুরোধ কাণে তুলিলেন না কিন্তু শেষ রক্ষা করা ভার হইল; পিসীমার উপর প্রেমানন্দের মাতৃতুল্য ভক্তি—যোগশিক্ষায় ভক্তির উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে, পিসীমার উপর ভক্তির মাত্রা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, গুরুভক্তিই সাধনার মূল মন্ত্র! সুতরাং পিসীমার নির্ব্বন্ধাতিশয় উপেক্ষা করা প্রেমানন্দের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। পিসীমার সাগ্রহ-পোষিতা আশালতা ফলবতী হইল। করোঙ্গা হইতে প্রায় বিংশ মাইল দূরবর্ত্তী শান্তিপুরবাসী শিব-প্রসাদ নামক জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের এক পরমা রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গোসাঞী সুখের সংসার পাতিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখখানি দেখিয়া শনকাঠাকুরাণীর আর সুখের অবধি রহিল না। সোহাগে নীরাভরণা সে স্বর্ণ-

প্রতিমাখানিকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া হৈমাভরণে সাজাইলেন; কিন্তু প্রাক্তনফলে শনকাদেবী অধিকদিন সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারিলেন না—বিবাহের বৎসরান্তেই পিসীমা স্বর্গারোহণ করিলেন; গোসাঞীর ভক্তির উৎস লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল; প্রেম ও ভক্তিময় হৃদয়ে শনৈঃ শনৈঃ সংসারের আসক্তি স্থান পাইল। গোসাঞী হরিভক্ত-বৈষ্ণব, তদীয় হৃদয় ভক্তি ও প্রেমের আদর্শ। স্বামীর সুযত্নে ও শিক্ষাবলে ইন্দুমণিও বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। গোসাঞীর স্ত্রীর নাম ইন্দুমণি।

ইন্দুমণি রূপসী ষোড়শী। পিসীমার মৃত্যুর পর গোসাঞীর সংসার ইন্দুমণির হইল; ইন্দু পাকা গৃহস্থের ঘরের মেয়ে—সুগৃহিণী মাতার সযত্নশিক্ষিতা সুতরাং অবস্থানুযায়ী সামান্য আয়ে সে ক্ষুদ্র সংসারের বিধিব্যবস্থা করিয়া উঠা ও সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা ইন্দুর পক্ষে ততটা কঠিন হইল না। অত্যল্প সময়ে ইন্দুমণি সুগৃহিণী হইয়া উঠিলেন; গোসাঞীর সংসার ক্রমে সুখের হইয়া উঠিল। পঞ্চম বৎসরে গোসাঞীর একটী সুকুমারী জন্মিল; সে ক্ষুদ্র সংসারশোভনা—স্নেহপ্রতিমা শিশুটীর রূপলাবণ্যভরা সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ইন্দুমণি নাম রাখিলেন—চঞ্চলকুমারী; কিন্তু পিতা মাতা আদর করিয়া ডাকিতেন "চেলী।" শিশুবেলার ডাক নামটীই শ্রুতি-মধুর বলিয়া আসল নামটী প্রায় চাপা পড়িয়া যায়; এক্ষেত্রেও সে নিয়মের অন্যথা হইল না। সুতরাং আমরাও শিশুমেয়েটীকে অনেক সময় ঐ নামেই উল্লেখ করিব।

চেলীর বয়স যখন কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর—চেলী যখন আধ আধ স্বরে নবোদ্গত দশন কয়টী বিকাশ করিয়া "মা" "বাবা," "দাদা" প্রভৃতি মধুমাখা দুচারিটী কথা মাত্র বলিতে শিখিয়াছিল যখন পিতা মাতা সে সুমধুর ডাক শুনিয়া আহ্লাদে গলিয়া যাইতেন—যখন সুকুমারীর সোহাগভরা রঙ্গ দেখিয়া পিতা মাতার স্নেহের উৎস উছলিয়া উঠিত—সহসা তখন সেই ক্ষুদ্র গৃহে অশনিসম্পাত হইল—সে আঘাতে গোসাঞীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গে ; সুখের সংসারে বিষাদের ধারা বহিল ; বিধি বিড়ম্বনায় গোসাঞীর যোগজীবনের সুখশান্তি চিতানলে ভস্মীভূত হইল ; ইন্দু পীড়িতা হইল—পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া দাড়াইল। গোসাঞা শিশুটীর পরিণাম ভাবিয়া আকুল হইলেন ; মুমূর্ষার জন্য ততোধিক ব্যস্ত হইলেন— শুষ্ককণ্ঠে জল বিন্দু দেয়, সংসারে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। বিপদে 'শ্রীমধুসুদন'কে লক্ষ্য করিয়া গোসাঞী কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেন না।

———

তৃতীয় কল্প।

শান্তিপুর করোঞ্চার ন্যায় একখানি গণ্ডগ্রাম হইলেও তত দরিদ্রপ্রধান নহে। মধ্যে মধ্যে দুএক জন জমিদার ও নবাব সরকারের খয়ের খাঁ কতিপয় জায়গীর-জীবি লোক ছিলেন। প্রজার উপর জমিদারের অনুগ্রহ ও ভালবাসা বিলক্ষণ ছিল প্রজাগণও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভুভক্ত ছিল, ক্রীতদাসের ন্যায় নিয়ত অনুগত থাকিয়া ভূস্বামীর প্রীতি বর্দ্ধন করিত। সে সময়ে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ প্রকৃত পক্ষে প্রীতিকর ছিল। পরস্পরের সাহায্য পরস্পরের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ভক্তি ও ভালবাসার অভাবে সে মধুর সম্বন্ধ স্বপ্নময়—অতি বিরল।

শিবপ্রসাদ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিন্তু সহৃদয়, সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত। তিনি স্থানীয় জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের কুলগুরু বলিয়া দেশ মধ্যে তদীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। মধ্যবিৎ ভদ্র সন্তান ও প্রজাপুঞ্জ অনেকেই তাঁহার মন্ত্রশিষ্য; সুতরাং শিবপ্রসাদের সংসার যাত্রায় অর্থের অনাটন জনিত কোন কষ্ট ছিল না। শিবপ্রসাদের কোন বিষয়েই যজমানের উপর বিশেষ আবদার বা অর্থের লালসা ছিল না, সামান্যেই তিনি পরিতুষ্ট থাকিতেন, এজন্য শিষ্যগণ ভাবিতেন, গুরুজী প্রকৃতই ভোলানাথ। শিবপ্রসাদ শিবোপাসক—ঘোর শৈব!

শিবপ্রসাদের দুই কন্যা জ্যেষ্ঠা ইন্দুমণি—কনিষ্ঠা বিন্দুবাসিনী। শিবপ্রসাদ বিষয় সম্পত্তি অপেক্ষা সত্য ও ধর্ম্ম নিষ্ঠার বিশেষ

পক্ষপাতী বলিয়া নিঃস্ব ব্রাহ্মণ সন্তান প্রেমানন্দের সঙ্গে ইন্দু-মণির বিবাহ দিলেন। শিবপ্রসাদ অপুত্রক—বিশেষতঃ সংসার কার্য্যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর দ্বিতীয় দোসর নাই বলিয়া এবং শিষ্য সম্প্রদায়ের আগ্রহাতিশয্যে বিন্দুবাসিনীকে বিবাহান্তে সজামাতা স্বগৃহে রাখিয়া গৌরীদানের ফল প্রত্যাশায় রহিলেন। কন্যা সৎপাত্রে সম্প্রদত্তা হইলেই কন্যাকর্ত্তার গৌরীদানের ফললাভ হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে সেটী হইয়াছে কি না সন্দেহ। কর্ম্মদোষে বিন্দু তেমন সাধুপাত্রে অর্পিতা হইল না। সুপণ্ডিত সচ্চরিত্র জামাতা লাভ সুকৃতি সাপেক্ষ; চরিত্রহীন প্রগল্‌ভ জামাতা বাবাজীবনগণ অনেক সময়ে দরিদ্র শ্বশুরের গলগ্রহ!

ইন্দুমণি গোসাঞীর সংসারে সুগৃহিণী, যোগ সাধনে নবীনা যোগিনী, তপস্যায় তপশ্চারিণী তপস্বিনী। গৃহাশ্রমে আদর্শ রমণী হইয়া শনকা পিসীমার স্নেহাশীর্ব্বাদের পাত্রী হইল। ইন্দুর আগমনাবধি গৃহের শ্রী ফিরিল—তৈজস পত্রের উজ্জ্বলতা বাড়িল, দেবপূজার আড়ম্বর হইল, মন্ত্র তন্ত্রের উৎকর্ষতা সাধিত হইল। সে হেন লক্ষ্মী বউমা পাইয়া পিসীমার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই আহ্লাদ লইয়া পিসীমা স্বর্গারোহণ করিলেন, তদীয় মৃত্যুর পর ক্রমে চারি-বৎসর কাটিল। পঞ্চম বর্ষে প্রতিকূল তুফান বহিল; সে তুফানে লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হইলেন; গোসাঞীর সুখসংসার মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

সহসা ইন্দু পীড়িতা হইলেন, পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোগীর শুষ্ক কণ্ঠে জলবিন্দু দেয়, এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি

নাই। প্রতিবেশিনী মঙ্গলা আসিয়া পথ্য পাচন দিলে ইন্দু পথ্য পায়—দুধ দিলে চেলী দুধ খায়। অন্যথা গোসাঞীকে সেজন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। গোসাঞীর কখন বা ফলমূলে, কখন বা উপবাসে দিন কাটিতে লাগিল। যেদিন মঙ্গলা আসিয়া রাঁধিয়া দিলেন, সেদিন গোসাঞীর অন্ন জুটিল। একদিন ইন্দু গোসাঞীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে কাতর বচনে কহিল—"জীবন-সর্ব্বস্ব! শরীরের অবস্থা যেরূপ বুঝিতেছি আর যে রোগ-মুক্ত হইয়া এ ক্ষীণ দেহ কার্য্যক্ষম হবে, সে আশা কম, এ অবস্থায় আর কতকাল চলিবে?"

প্রেমা—উপায়ান্তর বিরহিত—সুখের সময় হাসিবার জন্য যাহার কেহ নাই—দুঃখের সময় তাহার জন্য কাঁদিতে কে আসিবে?

ইন্দু—বিন্দুকে আনাইলে কি দোষ আছে? তাহার মত লক্ষ্মী বোন্ যার—তার কিছুরই অভাব হয় না।

সহসা মঙ্গলা আসিলেন; তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ইন্দু কহিল, "আমার এ রুগ্ন দেহের পরিণাম কি কে জানে? আমি বলি এ সময়ে বিন্দুকে আনাইয়া চেলীকে তাহারই হস্তে সমর্পণ করি, অন্যথা এ শিশুর জীবন বাঁচান ভার।"

মঙ্গলা—এ সাধু সঙ্কল্প, বিন্দু আসিলে সকল দিক্ রক্ষা পাইবে; রোগিনীর মনও প্রফুল্ল থাকিবে।

মঙ্গলার বুঝিতে বাকি ছিল না যে, ইন্দুর অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় ও শঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইন্দুর

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মত হইল—যথা সময়ে বিন্দুকে শান্তিপুর হইতে আনান হইল; বিন্দুর হাতে প্রাণের পুতুলটীকে সমর্পণ করিয়া ইন্দু নিশ্চিন্ত প্রাণে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন এবার আর তাঁহার রক্ষা নাই।

গোসাঞী বুঝিতে পারিলেন দৈববল ভিন্ন এ ব্যাধির আর নিষ্কৃতি নাই। সে মৃতসঞ্জীবনী শক্তিসুধা কোথায়? গোসাঞী একদা সে সুধা অন্বেষণে বহির্গত হইয়া রাত্রি প্রহরেকের পর গৃহে ফিরিলেন—কিন্তু সাহস করিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারিলেন না। সশঙ্কিতচিত্তে গৃহদ্বারে সোপানোপরি উপবিষ্ট হইলেন। মধুসূদনের কি বিচিত্র লীলা; ঠিক সেই সময়ে ঘুমের ঘোরে চেলী কাঁদিয়া উঠিল,—গৃহপার্শ্বস্থ অশোক তরুশিরে পেচক অশিব চীৎকার করিল—সে শব্দে গোসাঞীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। রোগ যাতনায় ততোধিক গোসাঞীর চিন্তায় ইন্দুর ঘুম হয় নাই; তিনি ক্ষীণকণ্ঠে কাতর বচনে কহিলেন "চেলীর হয় ত ক্ষুধা পেয়েছে।"

বিন্দু শয্যা ত্যাগ করিয়া ক্ষীণ দীপে স্নেহ দান করিতে করিতে কহিল—"দিদি আজ বুঝি তোমার ঘুম হয় নাই?"

ইন্দু—না একটু ঘুমায়েছিলাম, চেলীর কান্নাতে ঘুম ভাঙ্গিল।

সে সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিল—"বিন্দু!" সে পরিচিত স্বর শ্রবণে সত্রস্তে পরিহিত বসন সংযত করিয়া বিন্দু দ্বারোদ্ঘাটন করিল; গোসাঞী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইন্দু কেমন?"

"ইন্দু কেমন" একথা শুনিয়া অরুণোদয়ে নিশা কৃশা কমলিনীর ন্যায় মুমূর্ষার মৃতকল্প দেহে প্রাণ আসিল---ক্ষীণ কণ্ঠে বল পাইল, তিলেকের জন্য ইন্দু রোগ যাতনা ভুলিয়া গেল; আগ্রহ সহকারে মৃদুস্বরে ইন্দু কহিল "প্রভো! তুমি জীবন-সর্ব্বস্ব--"ইহ সংসারে পরমারাধ্য মহাগুরু, গুরুপ্রসাদ চরণধূলি দাও।"

গোসাঞী সে কয়টী কথা শুনিতে শুনিতে ধীরে ধীরে আসিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন; অতৃপ্ত লোচনে রোগীর আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, ব্যাকুল বাষ্প আসিয়া দৃষ্টিরোধ করিতে লাগিল। অতি সাবধানে অশ্রুবারি সম্বরণ করিয়া কহিলেন—"আজ কেমন?"

ইন্দুর দৃষ্টি গোসাঞীর উপরই ন্যস্ত ছিল; সে দৃষ্টি স্থির অথচ কৌতূহলময়ী; ইন্দুর দৃষ্টিও ক্রমে বাষ্পপূর্ণ হইল। ইন্দু ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল—সে নিশ্বাস নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক তীব্র ও ঈষদুষ্ণ; কি বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বুকের কথা মুখে ফুটিল না। অতি কষ্টে উদ্বেলিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া কাতর বচনে ইন্দু কহিল "নিশান্তে আর এ দুটী কথা শুনিবার আশা ছিল না; তোমাকে দেখিয়া হয় ত আরও দুদিন বাঁচিব, কিন্তু তোমার শ্রীচরণ ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব কি না সন্দেহ। আজ দিন রাত রোগযাতনা অপেক্ষা তোমার অদর্শন বেদনাই বিষম মর্ম্মঘাতী হইয়াছিল।"

তাহা শুনিয়া গোসাঞীর চক্ষে জল আসিল; এক অতীত স্বপ্ন স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল; তদীয় হৃদয়ে দারুণ পরিতাপ-

শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল "গৃহে ফিরিলাম কেন?" আবার ভাবিলেন "গৃহে ফিরিয়া এই রূপসাগরে ঝাঁপ দিলাম কেন?" গোসাঞী তিলেকে আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদীস্বরে কহিলেন "তাহাতেই বা আশা কই?"

ইন্দু—ঠাকুর, এ সংসারে নারীজীবন অতি ছার; নারীর রূপ প্রহেলিকা—গৃহের জঞ্জাল। সে জঞ্জালের নিকট তোমার কিসের আশা? তোমার যোগ তপ সাধন আছে তাহাই যথেষ্ট! আর এ অধিনীর জন্য ভবদীয় স্নেহাশীর্ব্বাদ—ততোধিক যোগতপাদপি প্রিয় লোকস্বর্গ ও যুগলচরণ! শেষ মুহূর্ত্তে যেন সে স্বর্গসুখে বঞ্চিত না হই।

সেই পবিত্রালাপের সময় অজ্ঞাতে নয়নাসার আসিয়া উভয়ের আকুলপ্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করিল; উভয়ের অশ্রু-ধারা উভয়ের পরিহিত বস্ত্র আদ্র করিল; ক্ষণকাল উভয়ে নীরব; উভয়ের বাষ্পাকুল লোচন উভয়ের উপর ন্যস্ত! উভয়ে যেন ক্ষণেকের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ!

সেই অবসরে বিন্দু চেলীকে দুগ্ধপান করাইল; সে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল; "তাহাতেই বা আশা কই" শুনিয়া ব্যাধির পরিণাম বুঝিতে বাকী রহিল না। তাই বিন্দু নিঃশব্দে উভয়ের কথা শুনিল, পাষাণীর ন্যায় সকল সহিল, নীরবে নয়নজলে বসন ভিজিল; হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নৈরাশ্যের বেগবান্ প্রবাহ ছুটিয়া আসিতেছিল। বিন্দু ব্যস্ত

হইলে ইন্দু ব্যথিতা হইয়া কাঁদিবে—গোসাঞীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে, আহারাদি হইবে না—মুহূর্তে বিন্দু এতখানি চিন্তা করিয়া অতিকষ্টে হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিল ; যথাস্থানে পাদ্যার্ঘ্যের বন্দোবস্ত ও জলযোগের ব্যবস্থা করিল। বিন্দুর আগ্রহে গোসাঞী অসম্পূর্ণ সায়ং কৃত্যাদি সমাপন করিয়া অনিচ্ছার সহিত যৎকিঞ্চিৎ উদরস্থ করিলেন। সারাদিন বিন্দুর ও জলস্পর্শ হয় নাই—ইন্দুর অনুরোধে বিন্দু ও বিষবৎ দুই মুঠা গলাধঃ করিল।

আহারান্তে বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল "মহাপ্রভুর সাক্ষাৎলাভ হইল কি ?"

গোসাঞী—সাক্ষাৎ হইয়াছে ; কাল মধ্যাহ্নান্তে আগমন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

বিন্দু—আশ্বাসে বিশ্বাস কি ?

গোসাঞী—মহাপুরুষের বাক্যের অন্যথা হয় না।

বিন্দু—মহাপুরুষের প্রসাদ ভিন্ন নিষ্কৃতির আশা নাই।

গোসাঞী—দৈববলে সকলই সম্ভবে ! দৈববলে দুশ্চিকিৎস্য সুকঠিন ব্যাধিও সহজে আরোগ্য হয় !

বিন্দু—ঠাকুর ! আমাদের কি তেমন সৌভাগ্য হবে ?

গোসাঞী—সকলই শ্রীমধুসূদনের ইচ্ছা ! সুখ দুখ, রোগ শোক, সম্পদ, বিপদ সমস্তই ভগবানের উপর সমর্পণ করিয়া আত্মসংযম করিতে হয়।

গোসাঞী সংযমী ও ত্যাগশীল ; কঠোর কষ্টসহিষ্ণু সন্ন্যাসী ; আর বিন্দু বালিকা—সরলতার প্রতিকৃতি—কুসুমকোমল স্নেহ-

পুত্তলি! সংসারের দারুণ পাপ তাপ শোক দুঃখ নীরবে সহ্য করা বিন্দুর পক্ষে তত সম্ভবপর নহে। অঙ্কস্থিত সুষুপ্তা বালিকার অনিন্দ্য ললিত লাবণ্যময় মুখখানির উপর অতৃপ্ত স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বিন্দু নীরবে কাঁদিল; কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল "এ স্বর্গ ছাড়িয়া আর কোন্ স্বর্গে অধিক সুখ! এ শিশুর অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?" বিন্দুর সাময়িক চিন্তা ও উৎকণ্ঠার কারণ বুঝিতে গোসাঞীর বাকী রহিল না। তিনি আর বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া ভাগবতে মনঃসংযোগ করিলেন, বিন্দু ও মেয়েটিকে লইয়া শয়ন করিল। ইন্দুর তখন তন্দ্রা আসিয়াছিল; রোগ যাতনায় সুনিদ্রার আশা দুরাশা!

চতুর্থ কল্প।

ঠগীর দৌরাত্ম দিন দিন বাড়িতে লাগিল; পার্ব্বত্য প্রদেশই উহাদের লীলাক্ষেত্র। দুর্গম গিরিসঙ্কটে—প্রবাহিনীর তীরে তীরে বনপথে নিভৃতস্থানে প্রচ্ছন্নবেশে লুক্কাইত থাকিয়া পথিকের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক সর্ব্বস্বাপহরণই ইহাদের নিত্য-কর্ম্ম—ব্যবসায় একমাত্র ধর্ম্ম! ঠগীর অত্যাচারে পথিকের পথ চলা দুষ্কর হইল; পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানী রহিত হইল, বাজারে বিপণী বন্ধ হইল; খাদ্যাভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল; অনাহারে প্রাণ যায় সেও স্বীকার তত্রাচ ঘরের বাহির হইয়া ঠগীকরে লাঞ্ছিত হইতে কেহ রাজী নহে; সুতরাং দেশ ত্যাগও প্রায় কাহারো অদৃষ্টে ঘটিল না। অনশনে অনেকস্থানে মহামারীও উপস্থিত হইল! এতদ-বস্থায় সর্ব্বাগ্রে ঠগীদমন, ইংরাজরাজের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল।

মুসলমান রাজত্বকালে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই ভণ্ড তপস্বীর দলই "ডাকু বা ঠগ" বলিয়া রাজপুরুষগণের ধারণা হইল। সে সময়ে তীর্থস্থান বিশেষতঃ পুণ্যক্ষেত্র বিন্ধ্যাচল ও বারানসী ধামে বিস্তর দণ্ডী সন্ন্যাসীর আড্ডা ছিল। শেষোক্ত দুই স্থানেই প্রথমতঃ পুলিশের সুদৃষ্টি পড়িল। গুপ্তচর নিয়োজিত হইল, চরগণ গুপ্তভাবে সাধু সন্ন্যাসীদের কার্য্যকলাপ—গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল; রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধের

ব্যবস্থা যেমন অকার্য্যকর, রাজকর্ম্মচারীগণের এ চেষ্টাও তেমনি প্রথম প্রথম ব্যর্থ ও অফলপ্রদ হইল। প্রাণভয়ে কেহই পার্ব্বত্যপ্রদেশে ঠগীর অনুসন্ধান করিতে সাহসী হইল না। অথবা অত্যাচারের ফলে কতকগুলি সাধু সন্ন্যাসীকে পুনরায় গৃহী হইতে হইল; যাঁহারা সাধনকুশল, দৃঢ় ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ তাঁহারা আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। একদল "নচ গৃহী নচ সন্ন্যাসী" ভাবে রাজপুরুষের হাত এড়াইবার চেষ্টায় রহিল কিন্তু নিশ্চিন্তপ্রাণে যোগসাধন অসম্ভব হইয়া উঠিল; সকলেই বুঝিলেন "এ বড় বিষম ঠাঁই গুরুশিষ্যে দেখা নাই।" অনেক গুরুকেই শিষ্য ছাড়িতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই ঘটনাবিপ্লবে পড়িয়াই প্রেমানন্দকে আবার করোঙ্কায় ফিরিয়া গৃহী হইতে হইল। আবার কিছুকালের জন্য সে ক্ষুদ্র কুটীরই তদীয় শান্তিকুটীর হইয়াছিল।

কালে দণ্ডীধরার হুজুগ কমিল; যোগজীবনে শান্তির নিরুদ্ধ-ধারা বহিল, মহাপ্রভুরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; পরিব্রাজকগণ আবার শিষ্যানুসন্ধানে ছুটিলেন। সেই সময়ে এক পরমহংস বিন্ধ্যাচল ছাড়িয়া বনপথে গোদাবরীর তীরে তীরে গ্রাম্যপথে আসিতেছিলেন—উদ্দেশ্য শিষ্যগণের অনুসন্ধান আর সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার। তাই তিনি পথে পথে ঘরে ঘরে হরিপ্রেম বিলাইতে লাগিলেন। পরমহংস বিষ্ণু উপাসক—পরম বৈষ্ণব। ভক্তের সঙ্গে তদীয় প্রেমবন্ধন অটুট ও অভেদ্য।

তাদৃশ পরমহংসের আগমন বার্ত্তা পাইয়া গোসাঞী একদা তদীয়ানুসন্ধানে চলিলেন। উদ্দেশ্য মুমূর্ষা ইন্দুমণির জন্য

মহাপুরুষের প্রসন্নতালাভ; গোসাঞীর বিশ্বাস পরমহংসের পদধূলি পাইলে ইন্দুর রোগ যাতনা অবসান হইবে। মহাপুরুষ মহাপ্রভুর নামে পাপী তাপীকে কাঁদাইতেছেন শুনিয়া গোসাঞীর প্রাণে লুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিল—পুনঃ গুরুপদাশ্রয় করার ইচ্ছা বলবতী হইল কিন্তু ইন্দুর শুষ্ক শীর্ণ মুখখানি দেখিয়া আবার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। গোসাঞীর ধ্রুব বিশ্বাস এ বিপদের মধুসূদন সেই পরমহংস; মহাপ্রভুর প্রসাদ পাইলে হয়ত ইন্দু প্রাণে শান্তি পাইবে, রোগ যাতনা দূর হইবে। আর মুমূর্ষা ও বুঝিতে পারিবে যে হরিনামের মাহাত্ম্য কত!

পরদিন প্রত্যুষে গোসাঞী পরমহংসের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। ইন্দুকে বলিয়া গেলেন জনৈক বৈদ্যের উদ্দেশে গ্রামান্তরে যাইতেছেন; করোঞ্চা ছাড়িয়া কিয়দ্দূর গ্রাম্যপথ ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া কলনাদিনী বেগবতী গোদাবরীর তীরে একস্থানে দেখিলেন অসংখ্য গ্রাম্য-লোকের নিবিড় জনতা; আর সেই জনতাভেদ করিয়া ঘোর কীর্ত্তনের রোল উঠিতেছে। যেন যমুনাপুলিনে নন্দোৎসব—ব্রজবাসীগণের আনন্দবাজার। দর্শকবৃন্দের ঠেসা ঠেসি ঘেঁষা ঘেঁষির মধ্যেও সুদূর হইতে জনতার স্রোত আসিয়া মিশিতেছে, জমাট বাঁধিতেছে কিন্তু কেহই সরিতেছে না; তদ্দর্শনে গোসাঞী বুঝিতে পারিলেন এ ভবের ঘাটে প্রেমের নূতন হাট বসিয়াছে। জনৈক বিষণ্ণ দর্শককে গোসাঞী জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় এস্থানে এত জনতা কেন? সকলেই হর্ষোৎফুল্ল—কিন্তু আপনি বিষণ্ণ কেন?"

দর্শক।—মহাশয় বোধ হয় আগন্তুক, সম্প্রতি এখানে এক মহাপ্রভু আসিয়া আজ তিনদিন এই শ্মশানক্ষেত্রে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন ; কত পাপী তাপী সুমধুর হরিনামে ত্রাণ পাইল, কেবল এই মহাপাপীরই পাপযাতনা দূর হইল না।"

বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। উদ্বেলিত হৃদয়াবেগে কণ্ঠরুদ্ধ ও নয়ন বাষ্পাকুল হইল। গোসাঞী বুঝিতে পারিলেন দর্শকের জ্ঞান চক্ষু ফুটিতেছে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য পরিতাপ হইয়াছে। প্রকাশ্যে কহিলেন—"বুঝিলাম আপনিও হরিপ্রেমে অনুরক্ত! নামামৃতপানে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে।

দর্শক—আপনার অনুমান সত্য ; আমি ঘোর ব্যভিচারী—পাপাসক্ত সংসারী—সার ফেলিয়া অসারে মজিয়াছি। শ্রীমধুসূদনকে ভুলিয়া স্বার্থমাখা সংসার সাগরে অসারবৎ ডুবিয়া রহিয়াছি!

গোসাঞী—আমাদের অদৃষ্ট কর্ম্মমূলক—সংসারধর্ম্ম মূলক নহে। সংসার পরীক্ষার স্থল, সংসারই জীবকে প্রেম শিক্ষা দেয়—ধর্ম্মে আসক্তি জন্মায়—সাধনায় সিদ্ধব্রত করিয়া তোলে ; সংসারই জ্ঞান শিক্ষার প্রশস্তক্ষেত্র—আত্মসংযমের মূলভিত্তি ; আর সর্ব্বথা আত্মসংযমই যোগের মূল মন্ত্র!

গোসাঞী আর উত্তরের অপেক্ষা করিতে পারিলেন না সে ঘোর সঙ্কীর্ত্তনে মধুর হরিনাম শ্রবণে ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির

উৎস ছুটিল ; "হরি হে দীনবন্ধু !" বলিয়া সে জনতায় মিশিয়া গেলেন ; অতি কষ্টে নিবিড় জনতা ভেদ করিয়া যেস্থানে প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ ভক্তপ্রধানকে পরিবেষ্টন করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছিল সেই প্রেমের আসরে উপনীত হইলেন। দর্শন-মাত্রেই গোসাঞী চিনিতে পারিলেন মহাপ্রভু তাহারই দীক্ষাগুরু মুরারীস্বামী বা স্বামীজী। আজ অষ্টাদশ বর্ষান্তে শিষ্য গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়া পরম প্রফুল্ল হইলেন—ভক্তিতে গলিয়া গেলেন ; তিলেকের জন্য সংসারচিন্তা ও ইন্দুর কথা ভুলিয়া গেলেন। গুরুর দর্শনেই যেন গোসাঞীর প্রাণে এক অননু-ভূতপূর্ব্ব আনন্দের ধারা বহিল ; গোসাঞী সঙ্কীর্ত্তনে তন্ময় হইয়া গেলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে সুর মিশাইয়া উচ্চকণ্ঠে ভক্তগণ গাহিতেছিল :—

"বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন ;
সৃজন পালন যাঁর, যিনি নিত্য নিরঞ্জন !
স্থাবর জঙ্গমে হরি, পরব্রহ্ম ত্রিপুরারী,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় ত্রিভুবন !
যোগতত্ত্ব বিলাইতে, অবতরি ধরণীতে,
খেলাইলে প্রেমলীলা, হরি হরি বল মন !"

গোসাঞীর গাইবার শক্তি ছিল তাই তিনি সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইলেন।

যখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, তখন সঙ্কীর্ত্তন থামিল ; ভক্তগণ এক এক করিয়া মহাপুরুষের পদধুলি লইয়া বিদায়

হইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে জনতা বিরল হইল; ক্রমে স্বামীজীর মত্ততাও কমিয়া আসিল। অবসর বুঝিয়া গোসাঞী দীক্ষিত শিষ্যের ন্যায় গুরুর চরণপ্রান্তে লোটাইয়া পড়িলেন। সে অজ্ঞাত স্থলে—নবীন ভক্তদলে শিক্ষিত ভক্তোচিত ব্যবহার দেখিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, ত্রস্তহস্তে ভক্তকে উঠাইয়া সাগ্রহে কোল দিলেন। দেখিয়াই স্বামীজী চিনিতে পারিলেন প্রণত তদীয় মন্ত্রশিষ্য গোসাঞী প্রেমানন্দ! বহুকাল পর প্রিয় শিষ্য পাইয়া গুরুর আহ্লাদের সীমা রহিল না। স্বামীজী মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"অহো হরিনামের কি বিচিত্র লীলা—এ নব বৃন্দাবনেও বিন্ধ্যাচলের মহাপ্রেমিক আসিয়া জুটিলেন, এও মধুসূদনেরই ইচ্ছা। গোসাঞি, এই নবীন শিষ্যগণকে কোল দাও—ইহারাই হিন্দুর ধর্ম্ম গৌরব—অনন্ত বৈষ্ণব, ভবিষ্যতের ভরসার স্থল! যবন রাজত্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় ছিল, বর্ত্তমানে জাগিয়া উঠিল।" অম্লানচিত্তে শিষ্য গুরুর আদেশ পালন করিলেন। অনন্তর নবীন ভক্তগণ গুরুপদে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলে চলিয়া গেল—ক্রমে সে নব বৃন্দাবন লোকশূন্য হইল। তখন গুরুশিষ্যে অনেক ক্ষণ আলাপ চলিল। করোঞ্চার নাম শুনিয়া স্বামীজীর প্রাণ একটু শিহরিয়া উঠিল, একটু পুলকিত হইল; বহু কালের লুপ্ত স্মৃতি অজ্ঞাতে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। [illegible] মন্ত্রসিদ্ধ মহাযোগী—আত্মসংযম তাঁহার চিরা[illegible]; [illegible] স্বামীজীর ভাবান্তর গোসাঞীর উপলব্ধি হইল না; আলো

ও আঁধারের সংমিশ্রণের ন্যায় স্বামীজীর হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডলে একটুকু অনন্য দৃষ্ট বিষাদের ছায়া পড়িল। স্বামীজী কহিলেন,———"তোমার পিতৃমাতৃবিয়োগের কথা মনে আছে কি ?

উ—পিতা নিরুদ্দেশ—তৃতীয় বর্ষ বয়সে আমার মাতৃ বিয়োগ হয়।

প্র—তোমার পিতা কে ছিলেন ?

উ—পাঠক রামানন্দ ভট্ট, মদীয় মাতৃ বিয়োগের পর যোগাশ্রম আশ্রয় করিয়া ছিলেন। সে আজ কিঞ্চিদধিক পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ; এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ বা কোন সংবাদ পাই নাই।

প্র—সংসারে আর কে আছেন ?

উ—এক পিতৃস্বসা ছিলেন—আজ প্রায় তিন বৎসর তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। উপস্থিত সংসারে একমাত্র স্ত্রী ও একটী শিশু কন্যা।

প্র—কতদিন সংসার করিয়াছ ?

উ—প্রায় ছয় বৎসর! এই সংসারই এখন বিষভাণ্ডার হইয়াছে। সংসার যে এত অসার আগে তাহা বুঝি নাই।

প্র—সংসারী হইলেই ধর্ম্মে অনাসক্তি হয় তাহা নহে; তবে কি না একবার সংসার ছাড়িয়া পুনরায় তাহাতে লিপ্ত না হওয়াই সঙ্গত। সংসার হাসি কান্না—রোগ শোক, সুখ ও দুঃখময়। তুমি আমি সকলেই মানুষ—

একই রক্ত মাংসে গঠিত—প্রপঞ্চময় দেহী মাত্র। ভগবানের রাজ্যে আসিয়া তাঁহার আদেশ বাণী প্রতিপালনই সংসার ধর্ম্ম। নিষ্কাম ব্রত উদ্‌যাপনই সে আদেশবাণী—আর সে ব্রত সাধনই যোগ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য! সংসারই সাধনার প্রথম শিক্ষার স্থল! সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য যে ভালবাসা—যে আগ্রহ ক্রমে উহা ভগবানে অর্পণ করাই সাধনার আরম্ভ।

গোসাঞী বাষ্পাকুল লোচনে, কাতর বচনে কহিলেন,—"প্রভো সে শিক্ষা—সে দীক্ষা অতলে ডুবিয়াছে—আমি আর শিষ্যপদ বাচ্য নহি। গুরুর উপদেশ এখন অপাত্রে প্রদত্ত হইতেছে! সংসার প্রলয়ে যে চিত্তবিকার জন্মিয়াছে, বিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় সে অপ্রকৃতিস্থ হৃদয়ে গুরুর সদুপদেশ স্থান পাওয়া অসম্ভব!"

একবিংশ বর্ষ বয়সে প্রেমানন্দ স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তদীয় প্রিয় মন্ত্র শিষ্য ছিলেন; এই দীর্ঘকালের অধ্যাপনায় শিষ্যের জ্ঞান বুদ্ধি—চিত্তশুদ্ধি, ভক্তি-ভাব যোগপ্রভাব আদি কিছুই জানিতে গুরুর বাকী ছিল না। শিষ্যের কাতরোক্তি শুনিয়া গুরু বুঝিলেন শিষ্যের হৃদয়ে অনুতাপানলের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ধর্ম্মালাপে তদীয় মর্ম্মান্তিক যাতনা বাড়িবে বই কমিবে না। সুতরাং কথার স্রোত অন্য দিকে ফিরাইয়া কহিলেন ঃ—

"আমি গেলে রোগীর রোগযাতনার লাঘব হওয়ার আশা কি ?"

শিষ্য—রোগীর যে অবস্থা, দৈববল ভিন্ন অন্যরূপে রোগোপশমের আশা নাই।

গুরু—বাঁচন মরণ শ্রীমধুসূদনের ইচ্ছা, তাহাতে মানুষের হাত নাই।

শিষ্য—বিশ্বাসে ভগবান—আমাদের চক্ষে শিষ্যের পক্ষে দীক্ষা-গুরুই ভগবান, জীবন মরণ তদীয় প্রসাদ সাপেক্ষ!

শিষ্যের আগ্রহাতিশয্যে একবার জন্মভূমি দেখিবার সাধ হইল; স্বামিজী কহিলেন—"নিশান্তের পূর্ব্বে এস্থান পরিত্যাগ করা অসম্ভব। প্রেমময়ের নবরাজ্যে প্রেমের হাট লাগিয়াছে, ভবিষ্যৎ রক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া আগামী কল্য দ্বিপ্রহরান্তে তোমার গৃহে পৌঁছিব।"

গোসাঞী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীজীর চরণে প্রণত হইলেন; গুরু শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"সাধু! সাধু!! ভগবানের কার্য্য ভগবানই করিয়া থাকেন, আমরা উপলক্ষ মাত্র।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোসাঞী বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। স্বামীজী নব বৃন্দাবনের সুবন্দোবস্তের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

পঞ্চম কল্প

বিন্দু নবোঢ়া রূপসী, ষোড়শী নব যুবতী, রূপ, গুণ দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তি, ভালবাসা আর স্নেহ মমতা যে কিছু রমণীর সৌন্দর্য্য—সে সকলই বিন্দুতে আছে। গৃহকার্য্যে বিন্দু সুগৃহিণী, রোগীর সেবায় প্রীতিময়ী; আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টির জন্য অতি ব্যস্তা—আবার ক্ষুৎপিপাসাতুর ভিখারীর অশ্রু মোচনে ক্ষিপ্রহস্তা। আপন পরে সমভাব—তদীয়া কর্ম্ম নিষ্কাম; এতাদৃশ রূপ গুণের সমন্বয় সত্ত্বেও বিন্দুর অদৃষ্ট মন্দ। এ দুরদৃষ্ট পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতি ফলে কি বিধিলিপির ভুলে বলা সুকঠিন। শিবপ্রসাদ পাণ্ডিত্যাভিমানে বংশ মর্য্যাদার বড় পক্ষপাতী; তাই উচ্চবংশীয় কিন্তু অশিক্ষিত অগঠিত চরিত্র জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণকুমারের হস্তে বিন্দুকে দান করিলেন। ক্রমে সে কুলীন ব্রাহ্মণকুমার পিতৃকুল রক্ষার ছলে ক্রমে আরও দুইটী সংসার করিল; পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র প্রবাহ ত্রিগামী হইলে যেমন সে প্রবাহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায়—বিন্দুর অদৃষ্টে স্বামী সন্দর্শনও প্রায় তেমন বিরল হইল। অন্য দুটীর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের বিষয় অজ্ঞাত আর তদুল্লেখও এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

ধনবান না হইলেও শিবপ্রসাদের নিত্য গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব ছিল না; গৃহস্থোপযোগী অশন বসন, দান ধ্যান—যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত; সুতরাং সামান্য ভূষণ সামান্য বসনেই বিন্দু পরিতুষ্টা থাকিতেন। কালে এই

বসন ভূষণই স্বামী শান্তশীলের অধঃপতনের কারণ হইল। শান্তশীল কুসংসর্গে পড়িয়া বিলাসিতায় ডুবিয়া গেল; দিন দিন অর্থের অনটন বাড়িতে লাগিল; যতকাল অর্থ বা অলঙ্কারে স্বামীর আবদার রক্ষা করিতে পারিলেন, ততকালই বিন্দুর ভাগ্যে স্বামী সন্দর্শন ঘটিল; যখন আর স্বামীর আবদার রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন আর লাঞ্ছনার শেষ রহিল না। কখন বা মর্ম্মঘাতি বাক্য-বাণে প্রপীড়িতা, কখন বা পদদলিতা হইতে হইল। সরলা বালিকা স্বামীর অপ্রিয় কার্য্যে সাহস করিয়া বাধা দিতে পারিল না। কেবল ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া কাঁদিতেন আর করযোড়ে ডাকিতেন—"ব্রজেশ্বর তুমি এক, কিন্তু তোমার অনন্ত গোপিনী—ভক্তদাসী—যে তোমায় ডাকে—সেই তোমায় পায়। কিন্তু আমরা ত জীবনেশ্বরের কয়টী মাত্র দাসী—কই এত ডাকিয়া এত কাঁদিয়াও সে দেবের সাক্ষাৎ পাই না কেন? হে বিশ্বপ্রেমিক—পাপী বলিয়া সে অভক্তকে চরণে স্থান দাও—সে ক্ষীণ ক্ষুদ্র হৃদয়ে সাধু ইচ্ছার বীজ অঙ্কুরিত কর—অভাগিনী যেন ও নামের বলে স্বামীসেবায় বঞ্চিত না হয়! দুঃখিনীর সম্বল—এক বিন্দু অশ্রু জল—ভগবানের ইচ্ছায় তাহাতে যেন বঞ্চিতা না হই; স্বামী এ হৃদয়ের উপাস্য দেবতা, সে সেবাই এ জীবনের মহাব্রত!" বিন্দুর এ মহাব্রতই শব-সাধনের মূলমন্ত্র!

শান্তশীলের চরিত্রদোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুঃশীলতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থানটন জনিত উঞ্ছবৃত্তির পথ প্রশস্ত

হইতে চলিল। কালে কুলগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া দুর্বৃত্ত পাঁওয়ারী দলভুক্ত হইল। ক্রমে শাস্তশীল ঠগীপ্রধান মধ্যে গণ্য হইল। সেই হইতে বিন্দুর জীবন স্বপ্ন ফুরাইল! কিন্তু ফুরাইল না অত্যাশ্চ অশ্রুধারা! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সে নিরুদ্ধ অশ্রুধারা প্রাবৃটের ধারার ন্যায় শতধারারূপে পরিণত হইল। বিন্দু ভাবিলেন আজীবন স্বামীসন্দর্শনআশে এ কান্নায়ও সুখ। যার আছে সেও কাঁদে—আর যার নাই সেও কাঁদে—কিন্তু উভয়ের প্রভেদ আকাশ আর পাতাল; একের অশ্রু স্বর্গের শিশির, অন্যের অশ্রুধারা বেগবতী বন্যার সর্ব্বগ্রাসী প্রবাহ!

ষষ্ঠ কল্প।

স্বামীজী নব প্রতিষ্ঠিত ভগবানের প্রেমরাজ্যে শ্রীমধুসূদনের মহিমা প্রচার করিয়া নবীন ভক্তমণ্ডলীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কহিলেন "ভগবানের চক্ষে ভক্ত মাত্রই প্রিয়দর্শন; আত্ম নির্ব্বিশেষে অকাতরে প্রেম দানই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে বিষয়ে কৃপণতা গুরুর উপদেশ বা আজ্ঞা বিরুদ্ধ! প্রকৃত ভক্তের যত প্রসার ততই সংসার অপাপ—ততই জীবের কল্যাণও ধর্ম্মের সম্মান হইবে। ভক্তগণ! পরস্পরে পরস্পরের শিক্ষা ও দীক্ষাকার্য্যে সহকারী হইয়া সনাতনধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধিকর"। একবার সকলে সমস্বরে গাও :—

"হরি ব'লে বাহু তুলে নাচরে আমার মন,
কৃপা করে কাঙ্গালেরে দাওহে হরি দরশন।
পূজিতে সে রাঙ্গাপদে, ভক্তিপ্লুত কোকনদে
নিভৃতে হৃদয়ন্তরে পাতিয়াছি সিংহাসন।
ভকতি-চন্দন করে, বিবেক বাশরী স্বরে,
মনোবৃত্তি রাধারাণী পূজিবে সে রাঙ্গাচরণ॥"

ভক্ত মণ্ডলী সমকণ্ঠে সপ্তমে চুড়াইয়া গান ধরিল "হরি বলে বাহুতুলে নাচরে আমার মন" ইত্যাদি। তারকাশালিনী মধুরা- যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নৈশ সমীরণে সে সঙ্গীত ধারা মিশিয়া বন হইতে বনান্তরে—এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ছুটিয়া গেল; ভাবে বিভোর প্রেমে উন্মত্ত আত্মহারা স্বামীজী "একবার হরিব'লে বাহুতুলে নাচরে আমার মন" বলিয়া নবীন শিষ্য

গণকে সস্নেহে কোল দিতে লাগিলেন; ভক্তদলে ভক্তির মিশ্রণ আর শিষ্যগণ সহ শিক্ষাগুরুর সাদর সম্ভাষণ বড়ই মনোরঞ্জন! এমন গভীর প্রেম, ভাব ও ভগবৎভক্তি অন্য সম্প্রদায়ে অতি বিরল।

এইরূপে সেই অনাদৃত অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে ভগবানের নামামৃত সিঞ্চন ও ভক্তির বীজ রোপণ করিয়া, ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইয়া সে পতীত স্থানকে হরিনামে উন্মত্ত করিয়া স্বামীজী— নবীন ভক্তগণের নিকট বিদায় হইলেন। ভক্তগণ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গুরুর অনুগমন করিল, স্বামীজী আবার কহিলেন—"সংবৎসরান্তে মহোৎসবে মহাপ্রভুর ভোগ হইবে, অনন্ত ভক্তমণ্ডলীর ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলভারই কাঙ্গাল সেবার পক্ষে যথেষ্ট! ভগবানের আদেশ—যাহারা সংসারী—শ্রীহরির নামে তাহাদের সংসার করিতে বাধা নাই; কিন্তু মুষ্টিমেয় সংগ্রহের কথা ভুলিও না। আর যাঁহারা সংসারত্যাগী—বিরাগী—বা যোগী—তাঁহারা যোগরত হইয়া বিশ্বভাণ্ডারে শান্তিস্থাপন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করুন। ভক্তির যত প্রসার ততই দেশের কল্যাণ; সকলেই ভগবানের সন্তান—তাঁহাকে ডাকিবার অধিকার সকলেরই সমান। অহিংসা পরম ধর্ম্ম—নিষ্কামভাবে ধর্ম্মাচরণই মুক্তির কারণ!"

কথা প্রসঙ্গে ভক্তগণ অনেকদূর আসিয়া পড়িল। অতঃপর স্বামীজী ভক্তগণের নিকট বিদায় হইলেন। বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়; প্রখর ভাস্করকরপরিতপ্ত রাখালগণের গ্রাম্য গীতি, গোচারণের মাঠে তৃষ্ণমানা গাভীগণের

হম্বারবে ও ভারবাহী গোপবৃন্দের মন্থরগতি দৃষ্টে স্বামীজীর মনে আভীরপল্লীনিবাসী ঘোষবৃন্দের কথা মনে হইল ; সঙ্গে সঙ্গে গোচারণপ্রিয় গোপিনীবল্লভের প্রেমময়মূর্ত্তি মানসপটে জাগিয়া উঠিল ; সে মধুর বাঁকা শ্যামচাঁদের চিন্তায় হৃদয় ভক্তি-রসে পরিপ্লুত হইল ; স্বামীজী বুঝিলেন বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্রই ভগবানের বিচিত্র লীলা—প্রেমের প্রতিকৃতি ; স্থাবর জঙ্গম লইয়াই ভগবানের সৃষ্টি শোভা। কোথাও বা পথপ্রান্তে উচ্চ শাখিশিরে তপনতাপিত বিহঙ্গকুল কলকলরবে অরণ্যাণী আকুল করিয়া তুলিতেছে ; কোথাও বা পথশ্রান্ত ক্লান্ত পথিক বিশালবটের বিমলছায়ায় বসিয়া অনুচ্চ পঞ্চমে ভবানি-বিষয়ক গান গাইতেছে। এ সকল মনোহর দৃশ্যে স্বামীজীর মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব বিশ্বপ্রেমিকতার উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল স্বয়ং প্রকৃতি দেবী যেন জনকোলাহল-বিরহিত নিভৃত প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনায় শান্তিধারা ছড়াইতেছেন ; প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপ্রিয় বিশ্বপ্রেমিকের চক্ষে সাময়িক গ্রাম্য শোভা অতি রমণীয় ও চিত্তরঞ্জন ! সে প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে অক্লান্তভাবে দূরপথ চলিতে চলিতে দিবাবসানের অত্যল্প পূর্ব্বে স্বামীজী গোসাঞীর কুটীরে পৌঁছিলেন। গোসাঞী তন্ময় হইয়া স্বামীজীরই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; আজ একাদশী, গোসাঞীর নিরম্বু উপবাস। ইন্দুর পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসাও নাই ; তাই মুমূর্ষার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জয়দেব পাঠ করিতেছিলেন ; সহসা বাহির হইতে কে ডাকিল—"গোসাঞী জি" ? সে স্বরে স্বামী-

জীর পদার্পণ জানিয়া "স্বামীজী শুভাগমন করিয়াছেন" বলিয়া সত্রস্তে কুটীরের বাহিরে আসিলেন তচ্ছ্রবনে বিন্দু চেলীকে লইয়া গৃহের এককোণে সরিয়া গেলেন এবং ইন্দু অতি কষ্টে পরিহিত বস্ত্র সংযত করিয়া বস্ত্রাঞ্চল শিরোপরি টানিয়া দিলেন।

গোসাঞী বাহিরে আসিয়া সসম্ভ্রমে স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন; কুটীরের অত্যল্প দূরে নৈঋতকোণে নিবিড়পত্র অশোকতরুর সুস্নিগ্ধ ছায়ায় শিলাখণ্ডোপরি স্বামীজী উপবেশন করিয়া কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন—চিন্তা করিতে করিতে এক একবার অভিনিবেশ সহকারে কৌতুহলময় দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—দেখিতে দেখিতে প্রশ্ন করিলেন—"এ সুন্দর অশোক তরুটী বোধ হয় তোমারই সুযত্নে রক্ষিত? ইহার সুশীতল ছায়া বড় প্রীতিকর।

উ—পিসিমা বলিতেন—এটী পিতার বড় আদরের তরু ছিল; এই তরুমূলে এই শিলাসনেই তদীয় সাধনার সূচনা হয়।

প্র—এই তরু ছায়া সাধনার উপযুক্ত স্থান বটে; ইহার দুই পার্শ্বে সহোদরের ন্যায় তমাল ও অক্ষয় বট থাকিলে এ শিলাখণ্ড পবিত্র যোগাসনরূপে পরিগৃহিত হইত।

উ—পিতৃদেবের বাসনা বোধ হয় তাহাই ছিল; এই তরুর বামে একটী সুন্দর তমাল ও দক্ষিণ দিকে একটী অনত্যুচ্চ শাখা-পল্লবমুণ্ডিত বিনোদ বট বৃক্ষ ছিল দুরদৃষ্ট বশতঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত তরুযুগল প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে উৎপাটিত হইয়াছে।

প্র—সে হয় ত উপযুক্ত যত্নের ত্রুটীতে।

উ—তা হবে—পিসিমা যতদিন জীবিতা ছিলেন, পিতার প্রিয় তরু বলিয়া তিনি যথেষ্ট যত্ন করিতেন। পিসিমা বলিতেন,—"এ পবিত্র ত্রিছায়া ক্ষেত্র।"

প্র—কতকাল তাঁহার অভাব হইয়াছে?

উ—আজ প্রায় সার্দ্ধ ত্রিবর্ষ। এই সময়ের মধ্যে এ ক্ষুদ্র কুটীরের বহুল পরিবর্ত্তন।

স্বামীজী—প্রকৃতি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল—সংসার লীলা কালচক্রে নিত্য ক্রীড়মানা—তাই আজ যে ঘোর সংসারী—কাল মাহাত্ম্যে কাল সে আত্মত্যাগী—মহাযোগী। আজ যে সসাগরা ধরণীর অধিপতি—কালমাহাত্ম্যে কাল হয় ত সেই ধর্ম্মের পথে মুক্তি ভিখারী! ভগবানের রাজ্যে এ হেন "পরিবর্ত্তন"ই নিয়তিবন্ধন—কর্ম্মানুশাসন। সে শাসনমূলেই দেহী মাত্রই আপন আপন কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হয়। যে যত বেগে অগ্রসর হইতে পারে, সেই তত আগে লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে পারে; যে যত তন্ময়, ভগবৎলাভ তাহার তত সহজে হয়!

সে সদুপদেশ পূর্ণ সুমধুর গুরুবাক্য শুনিয়া গোসাঞী নীরব—নিষ্পন্দ! সে কথাগুলি যেন গোসাঞীর অন্তরতম প্রদেশে তীক্ষ্ণ সূচিকার ন্যায় বিদ্ধ করিতেছিল; আত্ম-পরিবর্ত্তন স্মরণ করিয়া—যোগ জীবন ও সংসারাশ্রমের পার্থক্য চিন্তা করিয়া গোসাঞী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন—ক্ষণকালের জন্য স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। পরিতাপে

গোসাঞীর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল—বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইল, আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল; শিষ্যকে তদবস্থ দেখিয়া গুরুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে গোসাঞীর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এ গ্লানির সময় নয় বলিয়া স্বামীজী কহিলেন—"কথাপ্রসঙ্গে কাল বিলম্ব হইতেছে, আর্ত্তাকে একবার সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দেখা আবশ্যক।"

শিষ্য—সে ভবদীয় অনুগ্রহ!

গুরু—সে আর অনুগ্রহ কি? ভগবানের নির্দেশ পালনে তোমার আমার সমান অধিকার! আর্ত্তের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা, ব্যাধিগ্রস্তকে ব্যাধি বিমুক্ত করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য; সে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হওয়া ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধ—বলিয়া স্বামীজী গাত্রোত্থান করিলেন; গোসাঞী নিঃশব্দে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কুটীরের দিকে চলিলেন; স্বামীজী তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে গোসাঞী ইন্দু ও বিন্দুকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন, মহাপুরুষ আসিয়াছেন; প্রভুকে প্রণাম কর। বিন্দু ভক্তিভরে স্বামীজীর পদে প্রণতা হইল, একমুষ্টি পদরজঃ লইয়া মেয়েটীর মাথায় দিল; ইন্দু ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ব্যাধিগ্রস্ত দুর্ব্বল দেহখানি তুলিতে পারিল না—অতিকষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—প্রভো! "গুরুর গুরু মহাগুরু দাসীর মস্তকে শ্রীচরণ দিন।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ মুমূর্ষার বাসনা পূর্ণ করিলেন। গোসাঞীর অনুরোধে স্বামীজী রোগশয্যা-

পার্শ্বে বিস্তৃত অজীনোপরি উপবিষ্ট হইয়া অভিনিবেশ সহকারে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস, অক্ষিকোটর ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বিমর্ষ হইলেন। বিস্ময় সহকারে মানসিক ভাব গোপন করিয়া কহিলেন—"হরি—হরি! এ অপার্থিব ধন সংসারে দুর্ল্লভ, ত্রিদিবের ভূষণ! এ হেন রত্ন সংসারীর অদৃষ্টে বিরল! গোসাঞীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে তাহার "সুখস্বপ্ন" ভাঙ্গিয়াছে। সে মর্ম্মঘাতী কথা শুনিয়া গোসাঞী আত্মহারা হইলেন না। আগত প্রায় মহাপ্রলয়কে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া কহিলেন—"প্রভো, সকলই মধুসূদনের ইচ্ছা!"

স্বামীজী ব্যস্ত হইয়া কুটীরের বাহিরে আসিলেন; গোসাঞী তদনুগমন করিলে স্বামীজী কহিলেন "আজ অনন্ত চতুর্দ্দশী, নক্ষত্রমালিনী মধুরা যামিনী—ঠাকুরের নাম কীর্ত্তনের প্রশস্ত সময়! সর্ব্বপাপনাশন শ্রীমধুসূদনকে ডাকিবার মাহেন্দ্রযোগ! গাও তবে :—

"একবার হরিবলে বাহুতুলে নাচ্ রে আমার মন;
কৃপা ক'রে কাঙালেরে দাও হে হরি দরশন।"

ইত্যাদি।

গুরুশিষ্যে সাধা কণ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; সমাগত প্রতিবাসীগণের মধ্যে যাহাদের গলা ভাল ছিল, তাহারাও সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিল। সঙ্কীর্ত্তনের রোল যত বাড়িতে লাগিল, উন্মত্ততা ততই অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মুক্তকণ্ঠে সপ্তমে চড়াইয়া ঘোর সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, সহজে থামিল না। অবশেষে যখন থামিল, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত।

সন্ধ্যার পরক্ষণ হইতেই ইন্দুর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল; রোগক্লিষ্ট মলিন মুখমণ্ডলে যেন ক্ষণকালের জন্য শারদ কৌমুদী রাশি ফুটিয়া উঠিল: যেন কি এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃতে সে মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সে মুখ দেখিলে রোগ যাতনা আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রফুল্ল নলিনীদলে বিমল প্রতিভা, ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নে সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি মুহূর্ত্তেকের জন্য ফিরিয়া আসিল—সে দৃষ্টি স্থির কিন্তু কৌতুহলময়ী—সরল কিন্তু হৃদয়ের ভাবব্যঞ্জক; ক্ষীণ শ্বাস ক্রমে দীর্ঘ হইল; দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্রমে মহাশ্বাসে পরিণত হইল। শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা মঙ্গলা সহসা সে অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন এ দীপনির্ব্বাণের পূর্ব্বাভাস মাত্র! বিন্দু সঙ্কীর্ত্তনে তন্ময় হইয়াছিলেন, সহসা মুমূর্ষার সে ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। মঙ্গলা সশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া গোসাঞীর কাণে কাণে কি কহিলেন। গোসাঞী অতি ব্যস্তভাবে কুটীরে প্রবেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন "ইন্দু"? ইন্দু অনিমিষলোচনে স্বামীর অনিন্দ্য মুখখানি দেখিতে দেখিতে কহিলেন "জীবন সর্ব্বস্ব!—এ পাপজীবনের দেবতাজ্ঞানে মনের একটী কথাও সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই; রমণীসুলভ লজ্জাভয়ে প্রাণের সাধ মিটাইয়া ও শ্রীমুখ দেখিতে পারি নাই। আজ আর সে লোকলজ্জা বা ভয় নাই;—মহাগুরুর চরণপ্রসাদে আজ আমার দিব্য জ্ঞান ফুটিয়াছে, হৃদয়ে বিমল ভক্তির উচ্ছ্বাস বহিয়াছে। অই সম্মুখে তুমি এ দুর্ব্বল হৃদয়ের উপাস্য-দেবতা—আর দেবতার পার্শ্বে দেবগুরু মহাগুরু! আজ আমার

নয়ন ধন্য—জীবন সার্থক! আজ আমার মরিয়াই সুখ! আর চেলী? সে দেবপ্রসাদ! মধুসূদনে তোমার ভক্তি অচলা, তাই সে দেবপ্রসাদ ভক্তেরই রহিল;"—আর কি বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে সাধ পুরিল না। লোচনদ্বয় বাষ্পাকুল হইল, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; মনের কথা মুখে আর ফুটিল না। স্বামীজী সংসারাভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষ; মঙ্গলার ব্যস্ততাদর্শনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—"শিষ্যপত্নীর সময় হইয়া আসিয়াছে; গোসাঞীর সাধের সংসারে এতদিনে সব ফুরাইল!" ধীর পদে স্বামীজী ও গোসাঞীর অনুগমন করিলেন। ইন্দুর উর্দ্ধশ্বাস—নিথর উর্দ্ধদৃষ্টি দেখিয়া স্বামীজী কহিলেন—"আর কি দেখিতেছ—সময় হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া গোসাঞী মঙ্গলা ও বিন্দুর সাহায্য সে অপার্থিব রত্ন লইয়া কুটীরের বাহির হইলেন। স্বামীজী "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিয়া সে মৃতদেহে শান্তিবারি ছড়াইয়া দিলেন; ইন্দুর মৃতদেহ কুটীরাঙ্গনে রক্ষা করা হইল। সে সময়ে সঙ্কীর্ত্তন থামিয়াছে বটে—কিন্তু প্রতিবেশীগণ তখনও ভাবে গদগদ, কীর্ত্তনে তন্ময়, তাহাদের উন্মত্ততা তখনও ছোটে নাই। স্বামীজী প্রতিবেশীগণকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেনঃ—শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্রগায়ন্তি তত্রাহং তিষ্ঠামি নারদ!"

ভক্তগণ ভক্তিপ্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া সবে গাও—

"বল সে কেমন যে হৃদয়েরই ধন;"

যেন সে মধুর গানে—ভক্তির উচ্ছ্বাসে সতীর অনিত্যদেহে

নিত্য নিরঞ্জন শ্রীমধুসূদনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। সে দেবপ্রসাদে অবলার সরল প্রাণে যেন অক্ষয় শান্তিলাভ হয়। তখন আবার ঘোর সঙ্কীর্ত্তন চলিল ; সে সঙ্কীর্ত্তনের আবেশে—গুরুর সাময়িক সদুপদেশে গোসাঞীর প্রাণ এক অননুভূত অদ্বৈতভাবে পরিপ্লুত হইল ; সংসারের মায়া মোহ স্বপ্নবৎ তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল! তাই সে হৃদয়বিদারক দৃশ্যে,সহসা অশনিসম্পাতে মর্ম্মভেদী দুঃসহবেদনায়,ইন্দুনিভ সংসারশোভনা সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জনে ও গোসাঞীর প্রাণ কাঁদিল না। অচল, অটল মহাশৈলের ন্যায় সে মহাপ্রলয়ে ও নিশ্চল থাকিয়া ধর্ম্মবীর কহিলেন—"যাও সতি গোলকধামে—সেখানে যেন স্বামীজীর প্রসাদে ক্লিষ্ট আত্মার চির শান্তিলাভ হয়।"

তাহা শুনিয়া স্বামীজী কহিলেন—"গোসাঞি! তোমারই ব্রহ্মজ্ঞান সার্থক! যে অম্লানচিত্তে সংসারের মায়া কাটাইতে পারে, এহেন ভীষণ প্রলয়ে—এহেন বিষম বিপদপাতে যে অবিচলিত ও অক্ষুব্ধভাবে স্নেহময়ী জীবনসঙ্গিনীকে বিদায় করিতে জানে—তাঁহার দীক্ষা অলৌকিক, ভক্তিমাহাত্ম্য কল্পনাতীত! সে অসাধারণ সাধনবলে পরলোকে সতীর অক্ষয় শান্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী!

গোসাঞী—সেও ভগবৎপ্রসাদাৎ! মহাপুরুষের শ্রীচরণ সংস্পর্শে মুমূর্ষা যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল!

মঙ্গলা ইন্দুর মৃতদেহপার্শ্বে বসিয়া ব্যাকুল হইতেছিল ; গোসাঞীর পূর্ব্বোক্ত বচন শুনিয়া মঙ্গলা কহিলেন "ঠাকুর এ মুখ দেখিলে কে বলিবে যে ক্ষণপূর্ব্বে এদেহে রোগ যাতনা

ছিল, এমুখে বিষাদের কালিমা ছিল ? এ মুখ দেখিয়া বোধ হয় যেন ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন ; সাবিত্রীর ন্যায় সত্যব্রত পালনে মন্ত্রমুগ্ধ ! এ মৃত্যুতে সতীর পরম সুখ !

স্বামীজী—সংসার মায়ায় যে আবদ্ধ তাহারই মৃত্যুতে কষ্ট হয়। আর যে ভগবানের অনুগ্রহে অনায়াসে সে মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারে, আর শ্রীমধুসূদনকে সাক্ষাৎ জানিয়া প্রসন্ন মনে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে তাহার পক্ষে মৃত্যু—পঞ্চ ভূতাত্মক নশ্বরদেহের রূপান্তর মাত্র।

সে ভীষণ দৃশ্যে—সে সাংঘাতিক বজ্রাঘাতে বিন্দুর ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল ; পাছে শিশুটী ভয়ে আড়ষ্ট হয় এই আশঙ্কায় বিন্দুর কণ্ঠাবরোধ হইল, অসহ্য মর্ম্মবেদনায় অর্দ্ধাজ্ঞানাবস্থায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইলেন। প্রিয়জন বিরহে উচ্চরোদনে মনোবেদনার লাঘব হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিন্দুর পোড়া অদৃষ্টে আজ সে শান্তিটুকু ও বিরল হইল। চেলীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুর ধরিয়া কাঁদিতে বিন্দুর সাহস হইল না। মেয়েটির কল্যাণকামনায় বিন্দুর হৃদয়বেদনা প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ক্রমে সে কালনিশা সুগভীর হইল, ক্রমে দিঙ্মণ্ডল নীরব ও নিস্তব্ধ হইল ! ক্রমে সুষুপ্ত পল্লীতে লোককোলাহল থামিয়া গেল, চন্দ্রিমাবিধৌত আকাশ বিরলতারকা হইল ! ক্রমে প্রতিবেশীগণ নিঃশব্দে চলিয়া গেল ; যাহাদের সঙ্গে গোসাঞীর ঘনিষ্ঠতা ছিল কেবল তাহারই শব-সৎকারের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত

হইলেন। স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে উপযুক্ত পরিমাণে চন্দন কাষ্ঠ ও ঘৃত সংগৃহীত হইল; যথা সময়ে গোদাবরীর তীরে সতীর শবদেহের সৎকার করা হইল। হবিঃ সংযোগে চন্দনকাষ্ঠ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; অত্যল্প সময়ে সে স্বর্ণকান্তি সুন্দরদেহ ভস্মে পরিণত হইল। আজ গোসাঞীর অদৃষ্টে বিজয়া-দশমী; তাঁহার হৃদয়মণ্ডপশোভা সোনার প্রতিমা— গোদাবরী-নীরে বিসর্জ্জিত হইল! সৎকারান্তে সেই শ্মশান-ক্ষেত্রে অবশিষ্ট রাত্রি পুনরায় ঘোর সঙ্কীর্ত্তনে কাটিল। সূর্য্যোদয়ে শ্মশানবন্ধুগণ গোদাবরীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া করোঞ্জায় ফিরিলেন। চঞ্চলা মাতৃহীনা হইল, বিন্দু বান্ধবশূন্যা হইলেন; গোসাঞীর সংসারে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, আশা ভরসা সব ফুরাইল! রহিল কেবল পূর্ব্ব সাধনার স্মৃতি—আর গুরুর আদেশবাণী।

সপ্তম কল্প।

সে কালনিশা অবসান হইল; আবার তরুণ অরুণকরে দশদিক উদ্ভাসিত হইল; পাখীগণের কলরবে উপবন আবার পরিপূর্ণ হইল; লোকালয়ে সংসারের কোলাহল জাগিয়া উঠিল; ঘরে ঘরে নিদ্রোত্থিত শিশুগণের আবদার ছুটিল; প্রাতঃস্নান করিয়া বৃদ্ধাগণ পুষ্পাহরণে নিরতা হইলেন; কিশোরীরা অবদ্ধ কুন্তলদাম সুঠাম কপোলদেশ হইতে ত্রস্ত হস্তে সরাইতে সরাইতে জলপূর্ণ কুম্ভকক্ষে গৃহে ফিরিলেন!

অন্যদিনের ন্যায় গোসাঞীর সুখের কুটীরে আজ ও প্রভাতের বিমল কিরণ উঁকি মারিল, নিদ্রোত্থিতা চঞ্চলা 'মা' 'মা' রবে কাঁদিয়া উঠিল; খাওয়ার জন্য আবদার ধরিল; অন্যদিন "মা" বলিলেই রোগক্লিষ্ট দেহখানি লইয়া মা মেয়েকে লইয়া সোহাগ করিত; মায়ের স্নেহচুম্বনে মেয়ের আবদার থামিয়া যাইত; চঞ্চলা আজ আর সে সোহাগ পাইল না; আজ আর তেমন করিয়া সস্নেহে কেহ চুম্বন করিল না; আজ সে শয্যা শূন্য--আজ যেন সে গৃহ অন্ধকার! বালিকা যেন তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিল, কাল যাহা ছিল আজ আর তাহা নাই; কাল যে স্নেহময়ী জননী ছিলেন আজ যে তিনি সংসারে নাই এত কথা বুঝিবার শক্তি বালিকার ছিল না; বালিকা বুঝিল কেবল নিত্যনব সোহাগের অভাব। স্নেহমাখা মাতৃকোলের অসত্তা! চেলীকে ভুলাইবার জন্য বিন্দু বালিকাকে চুম্বন করিলেন, সুন্দর কাষ্টগোলক হাতে দিয়া খেলা দিলেন; সে সোহাগে শিশু আবদার ভুলিয়া গেল!

সূর্য্যোদয়ের অনতিবিলম্বে স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া গোসাঞী গৃহে ফিরিলেন; কিন্তু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন না। পূর্ব্বদিন স্বামীজীর আহার হয় নাই—আজ অনন্ত চতুর্দ্দশীর পারণ;—কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থায় গোসাঞী উদ্বিগ্ন হইলেন। বিন্দুর মানসিক অবস্থা ভাবিয়া তাহাকে কোন কথা বলিতে গোসাঞীর সাহস হইল না। অনন্যোপায় হইয়া মঙ্গলাকে সে কথা জানাইলেন। মঙ্গলা প্রতিবেশিনী, জ্ঞাতি,সম্পর্কে ভগ্নী কিন্তু কর্ম্মদোষে বিধবা! ইন্দুর সঙ্গে মঙ্গলার ঘনিষ্ঠতা বিশেষ ছিল; সমপ্রাণা সখীর ন্যায় উভয়ে অভিন্ন হৃদয়া। পিশীমার মৃত্যুর পর সংসারের অনেক কার্য্যেই মঙ্গলা প্রধান সহকারিণী ছিলেন; সুতরাং গোসাঞীর গৃহসামগ্রী কিছুই মঙ্গলার অজ্ঞাত ছিল না। তাই মঙ্গলা বিন্দুকে না বলিয়া স্বামীজীর জন্য জলপান এবং গোসাঞী ও বিন্দুর জন্য সামান্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছা ক্রমে স্বামীজী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন; আর তাঁহারই আদেশে ও মঙ্গলার আগ্রহাতিশয়ে গোসাঞী কিছু উদরস্থ করিলেন। বিন্দুর আহারের ভার মঙ্গলার হাতে রহিল। আহারান্তে স্বামীজীর সঙ্গে গোসাঞীর অনেক কথা হইল; কেবল উল্লেখযোগ্য কয়েকটী কথার উল্লেখ করিয়া স্বামীজীর নিকট হইতে আমরা বিদায় লইব।

স্বামীজী—মঙ্গলা কে?

গোসাঞী—আচার্য্য দয়ারামের কন্যা, সম্পর্কে জ্ঞাতি ভগ্নী কিন্তু কর্ম্মদোষে বিধবা! মঙ্গলা সরলা ও বুদ্ধিমতি! জ্ঞানে প্রবীণা: শ্রীমধুসূদনে তাঁহার ভক্তি অচলা!

স্বামীজী—মঙ্গলার প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিলেই মনে হয়, উহার উপর সর্ব্বমঙ্গলার অনুগ্রহদৃষ্টি যথেষ্ট ; সময়ে হয় ত সর্ব্বমঙ্গলার সেবায় নিযুক্তা হইবে !

গোসাঞী—ভগবানের ইচ্ছায় সে কার্য্যের জন্য মঙ্গলা সর্ব্বথা উপযুক্তা আর সে জন্য সে নিত্য প্রস্তুত !

স্বামী—আর বিন্দু ?

গোসাঞী—শান্তিপুর নিবাসী ৺পণ্ডিত শিবপ্রসাদের কনিষ্ঠা কন্যা ! শিশুটীর মাতৃস্বসা ! রোগীর শুশ্রূষা এবং কন্যাটীকে প্রতিপালন করার আর দ্বিতীয় কেহ নাই বলিয়া মুমূর্ষাপত্নীর ইচ্ছায় ও মঙ্গলার অনুরোধে বিন্দুকে শান্তিপুর হইতে আনান হইয়াছে।

স্বামীজী—ইহার স্বামী কে ও স্বামীর ঘরে আর কে আছে ?

তদুত্তরে গোসাঞী সংক্ষেপে ললনাললাম কিন্তু মন্দভাগিনী বিন্দুবাসিনীর দুরদৃষ্টের পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া স্বামীজী কহিলেন—"এখন তোমার প্রধান কর্ত্তব্য বিন্দুর স্বামীসন্ধান ও তদ্‌হস্তে ইহাকে প্রদান। বিন্দু বালিকা ও নিঃসহায়া, স্বামীর আশ্রয় ভিন্ন অন্যত্র রাখিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না।

গোসাঞী—ইহার স্বামীর অনুসন্ধান অনেক করা হইয়াছে কিন্তু কোনই খোঁজ পাইতেছি না !

স্বামীজী—সম্ভবত সে অশিক্ষিত যুবক উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ হইয়া পাণ্ডারীদলভুক্ত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে সেটী প্রশস্ত পথ !

গোসাঞী—তবে আর তাহার গৃহে ফিরিবার আশা নাই !

ভবদীয় আদেশ পালনে ত্রুটী হইবে না। বিন্দুর স্নেহ যত্নেই শিশুটী বাঁচিয়া আছে। বিন্দুকে তাহার স্বামীর হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিলে মেয়েটীর অস্তিত্ব বিষয়েও নিশ্চিন্ত হইয়া আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি।

ইত্যবসরে মঙ্গলা চঞ্চলাকে আনিয়া স্বামীজীর চরণতলে পুষ্পাঞ্জলি দিল। স্বামীজী শিশুটীকে সস্নেহে অঙ্কোপরি স্থাপন করিয়া উহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিশুটি সে অপরিচিত কোল পাইয়া চমকিয়া উঠিল কিন্তু সাহস করিয়া কাঁদিতে পারিল না। স্বামীজী সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"শিশুটী সুলক্ষণাবতী কিন্তু বাল্যকালেই বিষম বিভ্রাটের আশঙ্কা। ইহার বয়স কত?

উঃ—আজও তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হয় নাই! আর পূর্ণ হবে কিনা কে জানে?

স্বামী—জীবনের আশঙ্কা নাই। কিন্তু পঞ্চদশবর্ষের পূর্ব্বে ইহাকে পাত্রস্থা করিও না। আর পাত্র নির্ব্বাচণ সম্বন্ধে কুলমর্য্যাদা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলেই ভাল! এই বলিয়া স্বীয় উত্তরীয়াঞ্চল হইতে একটী কবচ উন্মুক্ত করিয়া শিশুটীর বামবাহুমূলে বাঁধিয়া দিলেন এবং কহিলেন "ইচ্ছা করিয়া এ ইষ্টকবচ কখনও বাহুভ্রষ্ট করিও না; কখনও ছিন্ন হইলে যেন পুনঃ যথাস্থানে বিন্যস্ত করা হয়।"

তদনন্তর স্বামীজী প্রস্থানোন্মুখ হইলে সকাতরে গোসাঞী কহিলেন—প্রভো আর কি সাক্ষাৎ পাইব না?

উঃ———ভগবানের ইচ্ছায় অসম্ভব কিছু নহে; সম্ভবতঃ পুনঃ

সাক্ষাৎ পাইবে—"কল্যাণে কল্যাণীর মন্দিরে।" পাপ পীণ্ডারীদমনার্থ নাগপুর হইতে ইংরাজ ফৌজ সত্বরই সেখানে পৌঁছিবে। যোগী সন্ন্যাসীর যোগসাধন নিষ্কণ্টক করার জন্য পরিব্রাজক সম্প্রদায়কে ইংরাজের সাহায্য করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সে ক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ধর্ম্মবীরের বাহুবল বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে।

প্রঃ—কল্যাণে কত পরিব্রাজক আছেন?

উঃ—অনেক। কল্যাণীর সেবক মাত্রই অসংসারী পরিব্রাজক—ব্রহ্মচারী; তাহারা 'কল্যাণ সম্প্রদায়' বলিয়া অভিহিত।

সে কথা শ্রবণে—মঙ্গলার মনে কি এক অননুভূতভাবের উদয় হইল—আশার স্বপ্ন জাগিয়া উঠিল। মঙ্গলা সোৎসাহে জিজ্ঞাসু হইলেন "কল্যাণ সম্প্রদায়ে কি স্ত্রীলোক আছেন"?

উঃ—মায়ের সেবার ভার প্রধানতঃ যোগিনীদিগের হাতে, তাহারা "কল্যাণীর পরিচারিকা" বলিয়া পরিচিতা।

মঙ্গলা—প্রভো আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সেখানে লইয়া চলুন—আমি জনমদুঃখিনী নিরাশ্রয়া কাঙ্গালিনী! আমি মায়ের সেবার অধিকার পাইলে হয়ত সুখিনী হইব।

স্বামীজী—সেখানে কাহাকে নেওয়ার অধিকার আমার নাই। কল্যাণীর অনুকম্পা হইলে প্রকৃত ভক্ত মাত্রই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মহারা হইয়া আপনি সেখানে উপস্থিত হয়। সাধনার পথ কুটীল, কণ্টকাকীর্ণ ও নিতান্ত বন্ধুর হইলে ও ভক্তের পক্ষে দুরারোহ নহে! পাপের প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া যাহারা সাধনা বলে

অগ্রসর হইতে পারে—তাহাদের পক্ষে অধঃপতনের আশঙ্কা তত থাকে না !

"গোসাঞী ঠাকুর পুনঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুর অনুগমনে প্রস্তুত" এইরূপ জনশ্রুতির অনুবর্ত্তী হইয়া প্রতিবেশিগণের মধ্যে অনেকেই "গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ" দেখিতে গোসাঞীর কুটীর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন ; জনতা ক্রমে বাড়িতে লাগিল ; তখন প্রস্থানোদ্যত স্বামীজী উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে কোল দিয়া কহিলেন—গাও সবে —

"হরি বলে বাহু তুলে নাচ্ রে আমার মন,
কৃপা ক'রে কাঙালেরে দাও হে হরি দরশন"

ইত্যাদি।

তখন সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন চলিল ; সে সংকীর্ত্তনের আবেশে বিভোর হইয়া সঙ্কীর্ত্তনের শিরোমণি স্বামীজী গৌর চাঁদের ন্যায় করেঙ্গা ত্যাগ করিলেন। গোসাঞীপ্রমুখ প্রতিবেশীগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। স্বামীজীও ভাবাবেশে সকলের নিকট বিদায় লইয়া গোদাবরীর তীরে তীরে পার্ব্বত্যপথে প্রস্থান করিলেন। স্বামীজী ক্রমে দৃষ্টি বহির্ভূত হইলে গোসাঞী ও প্রতিবেশীগণ শূন্যমনে গৃহে ফিরিলেন।

অষ্টম কল্প।

ভারতে ইংরাজাধিকার দিনে দিনে সুবিস্তৃত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিল; পাশ্চাত্য শাসনকৌশলে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিল। মিত্ররাজদের সহানুভূতি বলে ও প্রজারঞ্জন কৌশলে অনতিবিলম্বে ভারতের অদৃষ্ট ফিরিয়া উঠিল; ইংরাজরাজ সুশিক্ষিত ও সুসভ্য—সে রাজত্বে যথেচ্ছাচার ও উঞ্ছবৃত্তি অসম্ভব। ইংরাজ প্রজারক্ষক—ভারত শান্ত শিষ্ট রাজভক্ত—সুতরাং ভারতের সুখ সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সুদূর ব্রহ্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া প্রদীপ্ত বলবিক্রম—ব্রিটিশ-রাজের রাজপ্রভা যখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল—বীরগৌরব ও যশঃ সৌরভ সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ভারতের নির্ম্মল শারদাকাশে এক খণ্ড কালমেঘ দেখা দিল; মহামতি লর্ড আমহার্ষ্ট তখন ভারতের অদৃষ্ট পুরুষ। সে কালমেঘ দৃষ্টে ভারতেশ্বরের সিংহাসন টলিল; ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল; ভারত ভরিয়া প্রতিধ্বনি হইল "ভরতপুরের দুর্গ অজেয়। মহাবল জাটরাজের বীরকীর্ত্তি ভারতে অবিনশ্বর।" তাদৃশ পৌরুষ বাক্য ভারতেশ্বরের প্রাণে বাজিল—বীরগর্ব্ব ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া এ কলঙ্ক তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইল। সুতরাং ব্রহ্মযুদ্ধের ধূমরাশি নিঃশেষিত হইতে না হইতেই ভরতপুরের দুর্গ সমভূম করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল; যোদ্ধৃবর্গ বর্ম্ম চর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে না

করিতে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা হইল। জীমূতহুঙ্কারে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, জয়োন্মত্ত অনন্ত বৃটীশচমূ মহোল্লাসে ভরতপুরের দিকে অগ্রসর হইল। লর্ড কম্বরমেয়ার এযুদ্ধে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া চলিলেন। এই সংবাদে ভরতপুররাজ ও আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। যথা সময়ে ভরতপুরে ভীষণ সমরশিখা জ্বলিয়া উঠিল। সে সংগ্রামে ভরতপুরের গৌরবরবি অস্তমিত হইল ; ১৮২৬ খৃঃঅব্দে ভরতপুরের দুর্গ ইংরাজাধিকৃত হইল। তদানীন্তন ভরতপুরেশ্বর দুর্জ্জনশাল দুর্গ রক্ষার্থ যথেষ্ট চেষ্টা ও বলক্ষয় করিলেন কিন্তু ইংরাজ তোপের মুখে সে বল তিষ্ঠিতে পারিল না ; প্রবল প্রলয়পীড়িত বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় সুদৃঢ় প্রাচীন দুর্গপ্রাকার বিচূর্ণ হইল ; প্রমাদ গণিয়া দুর্জ্জনশাল পলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। শত্রুহস্তে ধৃত হইয়া সপরিবারে ৺ বারানসী ধামে প্রেরিত হইলেন ও অক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সমুচিত বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

লর্ড আমহার্ষ্টের পর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাহাদুর ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। তদীয় রাজত্বের চির-স্মরণীয় কীর্ত্তি সুনিয়মে রাজ্য শাসন ও দুষ্টদমনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ঠগী নিবারণ" কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। ঠগী নিবারণ কাহিনীই এ গ্রন্থের ভিত্তি—ঠগী দলন মূলেই "শবসাধন"।

ঠগীর নামে আজও অনেকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে ; হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। ঠগীগণ লুণ্ঠন ও হত্যাকারী—অসভ্য পার্ব্বত্য

নরপিশাচ পাপাত্মা পীণ্ডারীগণই এই সম্প্রদায়ের নেতা; নাগপুর ও মধ্য ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহই—এই নৃশংস কর্ব্বুরদলের লীলাভূমি; ঠগীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দুর্গম ও নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথের সন্নিকটে প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি গুহায় লুক্কাইত থাকিয়া সমাগত পথিকের প্রাণ বধ করিয়া সর্ব্বস্বাপহরণ করিত। অত্যল্প সময়ে ঠগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে দুরাচারদের অত্যাচারে পথিকের পথ চলা ভার হইল; হাটুরীয়াদলের হাটবাজার বন্ধ হইল, বণিক মহাজনের দোকান পাট খোলা দায় হইল; বাজারে বাজার লাগে না; দোকানীর বেশাতি বিক্রয় হয় না; যাহারা পেটের দায়ে বাহির হইল তাহারা দস্যুকরে প্রাণ হারাইল। আর প্রাণভয়ে যাহারা গৃহে স্থান লইল, তাহাদিগকেও অনাহারে মরিতে হইল। গ্রামে গ্রামে মহামারী উপস্থিত হইল—এক কথায় দেশ অরাজক প্রায় হইল। সে ভীষণ দৃশ্য ভারতেশ্বরের চক্ষে সহিল না; বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঠগী নিবারণের জন্য স্বতন্ত্র একটি কার্য্যবিভাগের সৃষ্টি হইল; ঠগী দলনোদ্দেশ্যে কর্ম্মকুশল একদল সুশিক্ষিত সৈন্য মেজর স্লিম্যানের অধ্যক্ষাধীনে নিয়োজিত হইল। কতককাল পর্য্যন্ত মেজর সাহেবের সূক্ষ্মানুসন্ধান ঠগীগণের প্রচ্ছন্ন গতিবিধির নিকট পরাস্ত হইল; যে পথে ইংরাজফৌজ ঠগীর অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, সে পথেই আবার ঠগীগণ পথিকের প্রাণসংহার করিয়া ফৌজদলের গন্তব্য পথের ধারে নিক্ষেপ করিয়া সৈনি

গণের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতেছে। সে বীভৎস ব্যাপার দর্শনে ফৌজগণ আপন আপন অকর্ম্মণ্যতা ভাবিয়া মরমে মরিয়া গেল; তাদৃশ লোমহর্ষণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মেজর সাহেবের বীরগর্ব্ব খর্ব্ব হইল; তাঁহার ধারণা হইল, ভণ্ডযোগী সন্ন্যাসী-গণই মূল ঠগী, কেবল ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লোক ভুলাইবার জন্য সাধুর বেশ ধারণ করিয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে উহাদেরই সমুচিত শাসন হওয়া আবশ্যক; সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল; তখন দণ্ডী ধরার হুজুক পড়িল; তীর্থক্ষেত্রে ধর্ম্মপ্রাণ সংসারবিরাগী সাধু সন্ন্যাসীগণের যোগ সাধন অসম্ভব হইল। ৺ কাশীধামে সে হুজুকের মাত্রা প্রায় চরমসীমায় পৌঁছিয়াছিল; তৎকালে কাশীক্ষেত্র একরূপ সাধুশূন্য হইল। হিন্দুর চক্ষে সে দৃশ্য অসহ্য হইল; ক্রমে সে অনুচিত অত্যাচারের কথা বেণ্টিক বাহাদুরের কর্ণগোচর হইল; কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভারতেশ্বরের প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে—যে দেশ ধর্ম্মপ্রাণ—যে দেশের হিন্দু-ললনাগণ অশঙ্কিত প্রাণে অবিমর্ষ হৃদয়ে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া "সতী" হইতে জানে, সে দেশের হিন্দুগণ ধর্ম্মের ভাণ করিয়া জীবহিংসারূপ মহাপাপ করিতে পারে না। তাই সত্বর আদেশ প্রচারিত হইল "সন্দেহের বিশেষ কারণ না থাকিলে সাধু সন্ন্যাসীগণের উপর যেন অবথা অত্যাচার না হয়। পরন্তু অভয় প্রদান করিলে ও তাহাদের ধর্ম্মাচরণে সহানুভূতি দেখাইলে সাধু সন্ন্যাসীর সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।" সে আদেশ বাক্যে ব্যবস্থাপক সভার চক্ষু কুটিল এবং তন্নিয়োগক্রমে মেজর সাহেব সাধুগণের সাধন-

কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের সাহায্য-লাভের জন্য মনোযোগ দিলেন। তদীয় চেষ্টা অচিরেই ফলপ্রদ হইল; কালক্রমে দলে দলে দণ্ডীগণ ঠগী নিবারণকল্পে ফৌজগণের দলভুক্ত হইল।

ঠগীগণ ইচ্ছা করিয়া প্রায়ই লোকালয়ে আসিত না; নিভৃত নির্গম গিরিশঙ্কটই উহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র। ঠগীগণ করালবদনী নৃমুণ্ডমালিনী কালীমায়ীকেই সর্ব্বমঙ্গলা বরদাত্রী মহাদেবী জ্ঞানে পূজা করিত! দলভুক্ত অহিন্দুগণও মায়ের পূজা না দিয়া কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিত না। দেবীর প্রসন্নতাজ্ঞাপক কয়েকটী সাঙ্কেতিক লক্ষণ ছিল, পূজার সময় সেগুলি পরিলক্ষিত হইলে ঠগীগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। তাহাদের ধ্রুববিশ্বাস মায়ের প্রসন্নতা ভিন্ন ঠগীবৃত্তির উন্নতি ও সিদ্ধি অসম্ভব। সুতরাং ঠগীগণ পূজান্তে নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিত। যে বৎসর ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইল, সে বৎসর বার্ষিক পূজায় মানুষের রক্তে মায়ের রাঙাচরণ সুরঞ্জিত হইত। মায়ের পূজায় নারিকেল বলিদান ঠগীর প্রথা ছিল।

ঠগী কখনও বিনাঅস্ত্রে পথে বাহির হইত না। মাহী ঠগীর প্রধান অস্ত্র। মাহী কুঠারের ন্যায় শাণিত অস্ত্রবিশেষ। লোকত্রাস ঠগীগণ বিবিধ রঙ্গে বিকটাকারে সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া সময় সময় এমন ভীষণরূপ ধারণ করিত যে তদ্দর্শনে কেহই তাহাদিগকে চিনিতে পারিত না; সুতরাং ঠগীর প্রকৃত সন্ধান পাওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ঠগীর উপস্থিত বুদ্ধি

অতি প্রবল ছিল। পথিক দেখিলেই দলস্থ কতিপয় ব্যক্তি আপনাদিগকে পথিকের ভাণ করিয়া পূর্ব্বোক্তদলে মিশিয়া যাইত এবং অগ্রণী হইয়া প্রকৃত পথিকগণকে বিপথে লইয়া গিয়া উপযুক্তস্থানে পৌঁছিবামাত্র গলদেশে কাপড় মোড়া দিয়া পলকে পথিককে ধরাশায়ী করিত; এত তীব্রবেগে ও ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্য সাধন করিত যে হতভাগ্য পথিক আত্মরক্ষার্থে বলপ্রকাশ করা দূরে থাকুক, নিশ্বাস ফেলিবার ও অবসর পাইত না। শেষ মাহী আঘাতে মস্তক দেহ হইতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রবল তরঙ্গ প্রবাহে ছিন্ন মস্তক নিক্ষেপ করিত। তদনন্তর হতব্যক্তির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। ঠগীগণ দলবদ্ধ হইয়া কখনও একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিত না।

ঠগীগণের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা ও প্রকৃষ্ট ছিল; কর্ম্মকুশল কার্য্যাভিজ্ঞ জনৈক ঠগী দলপতি থাকিত; সম্প্রদায়ের অন্যান্যেরা দলপতির অনুগত—মন্ত্রশিষ্যরূপে তাহার আদেশ পালন করিত। সম্বৎসরের উপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ মায়ের পূজায় ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট সকলে সমভাবে বণ্টন করিয়া লইত। সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সময়ে কোন বিষয়ে মতান্তর বা মনোমালিন্য ঘটিলে সে বিবাদ মিমাংসার ভার দলপতির হাতে থাকিত; ঠগীগণ জানিত তাহারা মায়ের সন্তান; মায়ের সন্তান হইতে হইলে প্রথমতঃ নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া শপথ করিতে হইত—"দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ কোনও সন্তান শত্রুহস্তে ধৃত হইলে প্রাণান্তে ও অন্য সন্তানের নাম করিবে না।" এতাদৃশ

দৃঢ় সংস্কার প্রযুক্ত পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও যথেষ্ট ছিল এবং সে সমবেত চেষ্টার ফলে ঠগীদল দিন দিন দুর্দ্দম্য হইয়া উঠিল।

নবম কল্প।

ইন্দুমণির মৃত্যুর পর চঞ্চলার লালন পালনের ভার বিন্দুর উপর পড়িয়াছিল। আবার গোসাঞীর অনুরোধে বিন্দুকে দেখার ভার মঙ্গলার হইল। বিন্দু মঙ্গলাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভক্তি করিত; মঙ্গলাও কনিষ্ঠার ন্যায় বিন্দুকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বিন্দুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সংসারের পাপ প্রলোভন হইতে দূরে দূরে রাখিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। মঙ্গলার উপদেশ ও শিক্ষাগুণে বিন্দুর ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র হৃদয় হরিময় হইয়া উঠিল; যৌবনে যোগিনীর ন্যায় দেবে ভক্তি ও ধর্ম্মে আসক্তি জন্মিল; আর বিন্দুর যত্নে ও স্নেহাতিশয্যে চঞ্চলাও শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

ইন্দুর মৃত্যুর পর গোসাঞী কুটীরে বড় একটা থাকেন না; সময় সময় গৃহে আসিয়া মেয়েটীকে দেখিয়া যান। যতক্ষণ করোঞ্জায় থাকেন, ততক্ষণ ধর্ম্মালোচনায় কাল কাটে; কখন ভক্তমাল কখন বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে নিবিষ্ট থাকেন, সন্ধ্যান্তে প্রতিবেশিগণের অনুরোধে ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া শ্রীহরির মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেন। কখন বা স্বীয় গৃহাঙ্গনে কীর্ত্তন হইত। পঞ্চম বর্ষীয়া চেলী নাচিয়া নাচিয়া গাইত, "হরি আমায় কর কোলে"—এ কীর্ত্তনের অর্থ কুসুম কোমলা চঞ্চলাকে হরিমতি করা আর বিন্দুর মনকে হরির নামে প্রফুল্ল রাখা। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারেও মঙ্গলাই

প্রধান নেতৃ। মঙ্গলার হরিভক্তি অচলা—সাধাগলা; সঙ্কীর্ত্তনে মঙ্গলার বড়ই আনন্দ ও উৎসাহ।

দিনের পর দিন—পক্ষের পর পক্ষ—মাসের পর মাস কাটিয়া গেল; ইন্দুর অভাবের পর এক এক করিয়া ক্রমে তিন বৎসর কাটিল; গোসাঞী কত খুঁজিলেন—কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিন্দুর স্বামীর সন্ধান পাইলেন না; শেষ ধ্রুব জানা গেল, সে অশিক্ষিত প্রগল্ভ যুবক অর্থের দায়ে পীণ্ডারী-দলভুক্ত হইয়া ঠগীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সে সংবাদে সকলেরই ধারণা হইল, শান্তশীলের গৃহে প্রত্যাগমনের আর আশা নাই। ফৌজের হস্তে ধৃত ও বন্দী হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। গোসাঞী বুঝিতে পারিলেন, বিন্দুর অদৃষ্টে স্বামী সন্দর্শনের আশা মরিচীকা মাত্র! বিন্দু শূন্যমূলা স্বর্ণলতা; অনাশ্রিত ও সহায় বিহীন; এ অবস্থায় জীবনসংগ্রাম অতি গুরুতর; ধর্ম্মের পথ অতি কুটিল ও বন্ধুর, সুতরাং পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হওয়ার আশঙ্কা। আবার বিন্দুর ইষ্টানিষ্টের উপরই চঞ্চলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এদিকে দিন যতই যাইতেছে, ততই গোসাঞীর মন অধৈর্য্য ও সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিতেছে। একদিকে বিন্দুর ভবিষ্যচিন্তা, অন্য দিকে পুনঃ যোগাশ্রম গ্রহণের নির্ব্বন্ধতা—এই উভয় চিন্তায় গোসাঞীর মন অশান্তিতে পূর্ণ হইল; একদা সঙ্কীর্ত্তনান্তে গোসাঞী কহিলেন, "মঙ্গলে, এত চেষ্টাতেও যখন মিছিরজীর সন্ধান হইল না, তখন গুরুর আদেশ পালন ও কর্ত্তব্য সাধন আমার সাধ্যাতীত!" স্বামীজী বলিয়াছেন "বিন্দুর স্বামীর

সন্ধান করা প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।" ভগবানের ইচ্ছা বোধ হয় তেমন নহে। বিন্দুর স্বামীর নাম শান্তশীল।

মঙ্গলা—সে কথা বিন্দুর বুঝিতে বাকী নাই। যে দিন স্বামীর অর্থের আবদার রক্ষা করিতে পারে নাই—সে দিনই বিন্দু বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার অদৃষ্টে স্বামীসুখ নাই—শারদ প্রতিমার চির বিজয়া!

গোসাঞী—সেও মধুসূদনের ইচ্ছা! যাহার আছে, সেও কাঁদে, আর যাহার নাই সেও কাঁদে, ভক্ত কাঁদে শ্রীহরির প্রসাদ পাইয়া, আর যাহার অদৃষ্টে সে প্রসাদ জুটিল না, সে কাঁদে মর্ম্মঘাতী যাতনায় অস্থির হইয়া। অপুত্রক রাজ্যেশ্বর কাঁদেন, রাজ্যের পরিণাম ভাবিয়া—আর পঞ্চ পুত্রবতী ভিখারিণী কাঁদে, 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করিয়া। তাই ভাবি—সংসারের লীলা বিচিত্র—রহস্যভেদ অসম্ভব!

মঙ্গলা—আশাই জীবনের মূল! কিন্তু আশার আশায় আর কতকাল চলে? বিন্দুর অদৃষ্ট ভাবিয়া আমার প্রাণ কাঁদে—হৃদয়ের শোণিতবিন্দু শুষ্ক হয়। অভাগিনীর এ রূপ যৌবনের পরিণাম কি কে জানে? ততোধিক চিন্তা চঞ্চলার জন্য!

বিন্দু নীরবে উভয়ের কথোপকথন শুনিতে ছিলেন কিন্তু সাহস করিয়া সে আলাপে যোগ দিতে পারেন নাই। এখন সুযোগ পাইয়া কহিলেন, দিদি আমার জন্য ভাবিতেছ কেন? পিতার মুখে শুনিয়াছি—"স্বামী স্ত্রীর একমাত্র উপাস্য দেবতা;

স্বামীর অনুমতি ভিন্ন শ্রীহরিকে ডাকিবার—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও স্ত্রীর নাই।" স্বামীর সাক্ষাৎ না পাই, ক্ষতি নাই—দূরে থাকিয়া তাঁহার চিন্তা করিব—সে রূপ ধ্যান করিব—সে চিন্তায়—সে ধ্যানে—আমার সুখ হয়। স্বামীর হইয়া শ্রীহরিকে ডাকিলে তিনি যেন আমার হৃদয়ের ভার হরণ করেন—গোবিন্দ নামে প্রাণে এক অননুভূত অচিন্ত্য আনন্দের উদয় হয়! ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করুন আমার সে আনন্দকণা টুকু যেন অশ্রুজলে ভাসিয়া না যায়—ভগবান যেন সেটুকু কাড়িয়া না লন! পিতৃবাক্য পালন করিব—স্বামীপদ পূজা করিব—ইহা ব্যতীত ইহজীবনে অন্য সুখের লালসা নাই।

বলা বাহুল্য যে বিন্দুর এই স্বামীভক্তিই শব-সাধনের মূলমন্ত্র! আজ সেই মহাসাধনের বীজ বিন্দুর হৃদয়ে উপ্ত হইল—শব-সাধনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিন্দুর সে সরল সাধূক্তি শুনিয়া গোসাঞীর বড় কষ্ট হইল; তিনি ভাবিলেন:—"পাপ কীটক দংশনে কুসুমকোরক বিনষ্ট হয়, দারুণ নিদাঘ তাপে বসন্তের বনশোভা জ্বলিয়া যায় এইটী বিধাতার সৃষ্টির খুঁত"!

মঙ্গলা—তাহাতে যে ভগবানের কোনরূপ সাধু ইচ্ছা লুক্কাইত নাই কে জানে? যে সাগর গর্জ্জনে প্রাণ আড়ষ্ট হয়, সেই পয়ঃপয়োধি আবার জগজ্জীবন বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। সেই সাগরবারিই পাপতাপহারী শান্তিদাতা—সে জলে স্নান করিলেই মুক্তি। বিন্দুর স্বামীভক্তি অচলা, স্বামীর উপর আসক্তি অদম্য; ইহার শেষ কোথায় কে জানে?

গোসাঞী—সেও কল্যাণীর ইচ্ছা! সাধিলেই সিদ্ধি! বিন্দুর প্রতিজ্ঞায় বল আছে, সাধনায় শক্তি আছে, ভগবানে অনুরক্তি আছে, এই হেমকাঞ্চনের সংমিশ্রণে অমূল্য রত্নোৎপত্তি অসম্ভব নহে।

মঙ্গলা—সে অমূল্য রত্ন কি?

গোসাঞী—হৃদয়ের উপাস্যদেবতা-পতিরত্ন!

সে কথা শুনিয়া বিন্দু মনে মনে কহিলেন "এ দাসী পতিপদভিখারিণী মাত্র; ভগবান যেন তাঁহাকে সুমতি দেন।"

মঙ্গলা—ঠাকুর, ভবদীয় প্রসাদে ততোধিক আপনার পরসুখ-কামনায় কিছুই অসম্ভব নহে। পরসুখ খুঁজিয়া যে সুখী, ভগবান তাঁহার কার্য্যে সহায়; তিনি প্রার্থনা শোনেন, আশা পূর্ণ করেন।

গোসাঞী—মঙ্গলে, তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বঘটে তোমার মঙ্গল-কামনা—সর্ব্বত্র তোমার সাধু ইচ্ছা। তোমার শিক্ষায়, তোমার সদাচারে—সর্ব্বোপরি তোমার আধ্যাত্মিক সরল বিশ্বাসের জয় সর্ব্বত্র; আর সে পবিত্র পুণ্যফলে বিন্দুর ভগ্নহৃদয়ে শান্তিলাভ অসম্ভব নহে। মঙ্গলে, দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে তোমার যেমন দয়া, নিঃসহায় স্বজন-পরিত্যক্তা অবলার জন্য তোমার ততোধিক স্নেহ মমতা; আত্মত্যাগের এ হেন সাধু দৃষ্টান্ত এ কপট সংসারে অতি বিরল! পরের জন্য তুমি কাঁদ, পরকে আপন করিয়া নিয়ত পরের সুখ খুঁজিয়া আপনাকে পর করিতে তুমি জান, তোমার এই উদাহরণ মহাজনেরও শিক্ষণীয়

মঙ্গলা—ইহাও আপনারই শিক্ষা! আপনার মুখেই শুনিয়াছি দেহ অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, তজ্জন্য মায়া বৃথা। সে মায়া স্নেহ মমতাটুকু উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হইলে অসময়ে তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায়। যতক্ষণ আত্মপর ভেদ জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ পরের জন্য কেহ খাটিতে পারে না। আবার যতক্ষণ না পরের জন্য অকপটে খাটিতে পারিবে, ততক্ষণ ভগবানের দ্বারে মজুরী পাবে না। সকাম যজনে ভগবান সন্তুষ্ট হন না।

গোসাঞী—ঠিক বলিয়াছ; পরের জন্য যে খাটিবে ভগবান তাহার জন্য খাটিবেন; যতক্ষণ তুমি পরের সুখের জন্য কার্য্য করিবে, ততক্ষণ তোমার কার্য্যের ভার শ্রীমধুসূদন লইবেন।

মঙ্গলা—ঠাকুর, আপনারই সার্থক জ্ঞান! ভগবানে আপনার এত প্রেম বলিয়াই আপনার অশ্রুধারা ঘোচে না। তাই আপনি সংসারে আশক্তিশূন্য, আত্মসুখচিন্তা বিরহিত —আত্মপরে সমস্নেহ!

গোসাঞী আর দ্বিতীয়োক্তি না করিয়া কুটীরের বাহিরে আসিলেন এবং অশোক তরুমূলে উপবিষ্ট হইয়া ভগবচ্চিন্তায় অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইলেন। করোঞ্চায় অবস্থিতিকালে এ ভাবেই গোসাঞীর দিন কাটিতে লাগিল।

দশম কল্প।

ভরতপুরের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন। ভরতপুরের "বিশাল দুর্গ অজেয়" এতদিনে সে কিম্বদন্তি অমূলক হইল। ইংরাজের রণকৌশলে সে গগনস্পর্শী বিপুল গড় সমভূমিকৃত হইল; ভরতপুরে ইংরাজের বিজয় পতাকা উড়িল; তদানীন্তন গড়াধিপতি দুর্জ্জনশাল বন্দীভাবে সপরিবারে পুণ্যভূমি ৺ কাশীধামে প্রেরিত হইলেন।

এ ঘটনার কিছুকাল পরেই ঠগীর আবির্ভাব হইল, সর্ব্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল; ইংরাজফৌজ অনুচিত সন্দেহানুবর্ত্তি হইয়া সংসারবিরাগী সাধু সন্ন্যাসীদিগকে ঠগীজ্ঞানে জেলে পূরিতে লাগিল। সে সময়ে বারাণসীক্ষেত্রে যোগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা বাহুল্য ছিল সুতরাং দলে দলে দণ্ডীদল ইংরাজ ফৌজের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। যাহাদের প্রাক্তন সুপ্রসন্ন ছিল, কেবলমাত্র তাঁহারাই দুর্গা বলিয়া অন্নপূর্ণার পুণ্যক্ষেত্র হইতে পলায়নপর হইয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

মোহিৎলাল সাধ করিয়া ইংরাজের হস্তে বন্দী হইলেন। তিনি জাতিতে সুব্রাহ্মণ, ভরতপুররাজের গুরুবংশীয়। পিতৃ-মাতৃহীন বলিয়া বাল্যকাল হইতেই ভরতপুর রাজপুরে প্রতিপালিত ও মহারাজের অনুগৃহীত; মোহিৎলাল সাহসী ও সুপুরুষ; দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক, সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীনচেতা। মোহিৎলালের ধর্ম্মে আস্থা ও কর্ম্মে স্পৃহা আছে। ভগবানে অনুরাগও যথেষ্ট; ৺কাশীধামে—সে হেন পুণ্যক্ষেত্রে সাধন তৎপর সাধু সন্ন্যাসীগণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চক্ষে প্রিয়দর্শন! অনুচিত-

ভাবে ইংরাজ ফৌজের হস্তে তাহাদের লাঞ্ছনায় কাশীবাসী মাত্রেরই মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইল; সে দৃশ্যে মোহিৎলালের প্রাণ কাঁদিল; তিনি দণ্ডীদলকে নিরাপদ করার জন্য তাহাদের অগ্রণী হইয়া অনেকবার ফৌজের হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ভুলিলেন না।

কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে মেজর স্লিম্যান ঘোষণা করিলেন "ঠগী নিবারণ শাসন তন্ত্রের মূলমন্ত্র। যেরূপেই হউক, দুষ্ট দমন করিয়া সর্ব্বথা প্রজারঞ্জন ইংরাজরাজের আশু কর্ত্তব্য। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি বিশেষতঃ পরোপকারে ব্রতী যতী সন্ন্যাসীদের সহায়তা ভিন্ন এ কার্য্যোদ্ধার অসম্ভব! সাহায্যকারীগণ রাজদ্বারে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইবেন।"

মোহিৎলাল সে সুযোগ ছাড়িলেন না; রাজঘোষণানুবর্ত্তী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মোহিৎলাল প্রগল্‌ভ যুবক—ও সাহসী; তিনি রাজদ্বারে ধনমানাকাঙ্ক্ষী নহেন। বরং ভরতপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শাসনের অপক্ষপাতীই হইয়াছিলেন; ধর্ম্মক্ষেত্রে তাদৃশ অরাজকতা দৃষ্টে সে অভিমান ঘুচিয়া গেল; জাতীয় কর্ত্তব্যানুরোধে ভোগ-বিলাসবিবর্জ্জিত ভগবদ্ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীগণের সাধনার পথ সর্ব্বথা নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ কল্পে ইংরাজের ফৌজদলভুক্ত হইয়া মহোৎসাহে দুরাচার ঠগীর অনুসন্ধানে পার্ব্বত্য পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মোহিৎলাল কর্ম্মকুশল ও কষ্টসহিষ্ণু; কর্ম্মক্ষেত্রে দলের অগ্রণী হইয়া কার্য্যোদ্ধারে তৎপর হইলেন। তদীয় সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে ও কর্ম্মকৌশলে দলে দলে

ঠগী ধৃত হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মেজর সাহেব আশ্চর্য্য ও আশ্বস্ত হইলেন; মোহিৎলাল সত্যপ্রিয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত জানিয়া মেজর সাহেব তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন; সে অনুগ্রহফলে মোহিৎলালের পদোন্নতি হইল। ক্রমে ক্রমে জানা গেল যে দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে নাগপুর প্রদেশই পীণ্ডারীগণের প্রধান লীলাক্ষেত্র। তখন একদল সৈন্য নাগপুরে প্রেরিত হইল; মোহিৎলাল এই দলের নেতা হইয়া চলিলেন; অন্য এক বিশিষ্ট সৈন্যদল সহ স্বয়ং মেজর সাহেব অন্যপথে দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুকাল পরে নাগপুর প্রদেশে উদয়গিরিতে উভয় দলের ছাউনি হইল; কালে এই উদয়গিরিতেই ঠগী দমনের বিজয় পতাকা উড্ডিন হইয়াছিল।

মোহিৎলালের সাহায্যার্থ অনেক সাধু সন্ন্যাসী তদীয় দলভুক্ত হইলেন। মোহিৎলাল সাধ করিয়া বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। পরোপকার ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন দেখিয়া কতিপয় মহাপুরুষও তাঁহার কার্য্যে সহকারী হইলেন। দুর্গম গিরিশঙ্কটে এই মহাজনপ্রদর্শিত পথই ঠগী দমনের আলেখ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই সহকারীগণের মধ্যে কল্যাণ সম্প্রদায়ই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য!

কল্যাণে কল্যাণী জাগ্রত দেবী—কল্যাণী জীবের সর্ব্ব-মঙ্গলা। ঠগীগণ কালী উপাসক সুতরাং কল্যাণীর উপর উহাদের মানসিক ভক্তি অচলা ছিল; কিন্তু জীব হিংসাকারী বলিয়া পাষণ্ড পীণ্ডারীগণের মায়ের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল

না; তবে পীণ্ডারী স্ত্রীলোকদের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না; নিঃশত্রু কল্যাণসম্প্রদায় মুক্তহস্তে ইংরাজফৌজের সাহায্যে প্রস্তুত হইলেন। পীণ্ডারীদলন ভিন্ন সংসারে শান্তি নাই; সাধু অসাধু সকলেই সেই একই মন্ত্রে শিক্ষিত, একই সূত্রে কার্য্যক্ষেত্রে সম্মিলিত! তাই কল্যাণের সঙ্গে লালজীর ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সাধুগণ আদর করিয়া মোহিৎলালকে ডাকিতেন—"লালজী"; অতঃপর তিনি উক্ত নামেও অভিহিত হইবেন।

একাদশ কল্প।

ভবানীর অনুগ্রহে এবং বিন্দু ও মঙ্গলার স্নেহাতিশয্যে চন্দ্রকলার ন্যায় চঞ্চলা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল! ক্রমে চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পা দিয়াছে। চঞ্চলা এখন কত সুমিষ্ট ও মধুর কথা বলিতে শিখিয়াছে। চঞ্চলা বলে—"হরির আঙা চরণ" মঙ্গলাকে বলে "ময়লা মাছি" কাপড়কে "কাপোল" চাঁদকে "তান", দয়েলকে "গয়েল" জলকে "দল" সন্দেশকে "ছনেশ," টিয়াপাখীকে "তিয়াপাখী" ফটিককে "ফতিক" ঠোট নালকে "থোতনাল" ইত্যাদি কত স্বরচিত কথা বলে। চঞ্চলা শিক্ষিত পাঠক কন্যা—তাই ব্যাকরণ শুদ্ধ ছড়া কাটিত :—

"খেলে আমি ফূলে ফুলে, ছুতে যাব ফতিক দলে ;
ময়লা মাছি বাছি ভাল, দেবো আমায় আঙা কাপোল ;
দাকেন যবে বনমালী, নাচেন দিয়ে কলতালি ;
ছুতে আসি তানের আলো—ছনেচ খেতে বাছি ভালো !"

ইত্যাদি—

চঞ্চলা বিন্দুর বিষময় জীবনে নয়নতারা, মেঘাচ্ছন্ন গগনে বিদ্যুৎ ধারা ;—আঁধার গৃহে মাণিক রতন, পাপতাপময় সংসারে মায়ার বন্ধন। সুতরাং বিন্দু চঞ্চলাময় !

ইন্দুমণির মৃত্যুর পর গোসাঞী করোঞ্চার শ্মশানকল্প—শূন্য কুটীরে দুই বৎসর কাটাইলেন ; যে কর্ত্তব্য পালনে এত দিন গৃহে রহিলেন দুর্ভাগ্য বশতঃ সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। বিন্দুর স্বামীর কোন সন্ধান মিলিল না। তৃতীয় বর্ষে

গোসাঞী গৃহত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের পথে দাঁড়াইলেন; স্বামীজী বলিয়াছিলেন পুনঃ সাক্ষাতের সম্ভাবনা—"কল্যাণে কল্যাণীর মন্দিরে।" তাই গোসাঞী পার্ব্বত্য পথে কল্যাণের দিকে চলিলেন। গোসাঞীর জানিতে বাকী ছিল না—যে বিন্দুর অদৃষ্টে সুখের আশা অতি অল্প—তাই তিনি সংসার ললাম সরলা বালিকাকে শিখাইয়াছিলেন—"স্বামীই স্ত্রীর পরম দেবতা—উভয়ের সম্বন্ধ কেবল জীবনাবধি নহে—এ পবিত্র সম্বন্ধ পরকালেও কর্ম্মাধীন থাকে, আত্মার সঙ্গে কর্ম্মফল সহগমন করিয়া সে সম্বন্ধের সুখ স্মৃতি রক্ষা করে।" এই শিক্ষাগুণে বিন্দু বুঝিয়াছিলেন—'পতি ধর্ম্ম—পতি কর্ম্ম—আর পতির পদ সাধনই পরম তপ!' বিন্দুর এই সাধু শিক্ষাই শেষ শব-সাধনের জপ মন্ত্র হইয়াছিল।

কন্যার শোক মাতার পক্ষে অসহ্য হইল; ইন্দুর মৃত্যুর সংবাদে তাহার মাতা শয্যা লইলেন, আর উঠিলেন না। পক্ষান্তের পূর্ব্বেই মাতা কন্যার অনুসরণ করিলেন। বিন্দু মাতৃহীনা হইলেন—শান্তিপুরের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক রহিত হইল; সুতরাং মঙ্গলার অনুকম্পা ও মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় করোঞ্জার সেই ক্ষুদ্র কুটীরেই প্রোষিতভর্তৃকা বিন্দুর যোগ জীবনের সূত্রপাত হইল; এ নব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষাগুরু মঙ্গলা—শিষ্টা শিষ্যা বিন্দু—আর নয়নাভিরাম আশ্রমবালা চঞ্চলা। গুরু-শিষ্যে এক ধ্যান—এক জ্ঞান—এক প্রাণে যোগ সাধন আর প্রেম ভরে হরিভজন; প্রাণমনোন্মত্তকর সঙ্কীর্ত্তন উভয়ের নিত্য কর্ম্ম! হরিকে ডাকিয়া পরের সুখ খুঁজিয়াই

উভয়ে সুখী। আর চঞ্চলার ভবিষ্যৎ কল্যাণই উভয়ের একমাত্র কামনা!

মঙ্গলা ও বিন্দু গোসাঞীর কাছে যে পরম তত্ত্ব শিখিয়াছিলেন, উপকথাচ্ছলে তাহাই আবার চঞ্চলার ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ শিক্ষা হইল; নবোদ্গতা মাধবী লতার ন্যায় শিশুর কোমল মনকে যে দিকে চালাইবে—সেদিকেই ধাবিত হইবে। প্রকৃতি গঠনের এই প্রশস্ত সময়, বাল্যকালের সাধু শিক্ষা, সরল বিশ্বাস বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; জীবাত্মার উপর আধিপত্য বিস্তারের অধিকার পায়। সুশিক্ষায় চিত্তবৃত্তিগুলি একবার উন্নতির দিকে অগ্রসর হইলে ক্রমেই সে চরিত্রের উন্নতি হয়; সে নির্ম্মল চরিত্রে দেবত্বের বিভা বিকাশ পায়!

একদা বাসন্তী পঞ্চমীর সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাগমে মঙ্গলা ও বিন্দু চঞ্চলাকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন। সহসা সরলা বালিকা আবদার ধরিল—"ঐ যে মা তান—আমি নেব তান্!" বাঁকা চাঁদ তখন তারকা মালিনী—মধুরা যামিনীকে চন্দ্রিমা বিধৌত করিয়া হাসিতেছিল।

মঙ্গলা—পেতে ফাঁদ ধর্‌ব চাঁদ দিব তাঁর বিয়ে।
বিন্দু—আমি তবে বরণডালা দিব সাজাইয়ে;

চঞ্চলা কহিল—ময়লামাছি অই তান ধর,
মঙ্গলা—আজি তোর দিব বিয়ে চাঁদ হবে বর!

চঞ্চলা একটুকু অভিমানভরে ভগ্নস্বরে কহিল—

চাইনা আমি বর-পর চাই আমি তান;

মঙ্গলা—দিব আজি চাঁদের বিয়ে ভেঙ্গে যাবে মান!
চঞ্চলা—মা, বর দিয়ে কি হয়-বর কি করে খেলা?
বিন্দু—ফুলে ফুলে খেলে বর বসে চাঁদের মেলা!
চঞ্চলা—দে মা তবে বর ধরে বরে শুনাব গান,
নেব কোলে ছোত বরে নাচ্‌বে হরির প্রাণ!

চঞ্চলার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে চাঁদ অতি ছোট খেলার সামগ্রী।

বিন্দু—বরকে তুমি কি দিবে-হবে চাঁদ বঁধু;
চঞ্চলা—পরতে দেব আঙা কাপোল খেঁতে দেব মধু!

চাঁদ খেলার সঙ্গী হবে ভাবিয়া চঞ্চলা আহ্লাদে গদগদ, হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে উদ্যত। কিন্তু চাঁদ ধরা দেয় না। চঞ্চলা যতবার হাত বাড়ায়, দ্রুতগামী কাল মেঘের কোলে চাঁদ ততবারই লুকাইয়া যায়। চঞ্চলার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "না মা তান আছে না—তান বুঝি খেলে না।"

চঞ্চলার অশ্রুজল বিন্দুর পক্ষে তীক্ষ্ণ শেল। সে শেলবিদ্ধ হইয়া বিন্দু সোহাগে চেলীর অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন না মা, তুমি কেঁদ না; গান না গাইলে চাঁদ আস্‌বে না।" সে কথায় বাধা দিয়া মঙ্গলা কহিল।—

চাঁদ আস্‌বেন দোলায় চ'ড়ে, কাল কুর্ত্তা আর নীলাম্বর প'রে।

বিন্দু আর মঙ্গলা গেরুয়া পরে চঞ্চলা আঙা কাপোল ভালবাসে; রক্ত জবায় আদর করে অপরাজিতা দেখিলে অভিমানে যায় দূরে; তাই নীলাম্বরীর উপর চঞ্চলার যত রাগ!

চঞ্চলা আবার অভিমান করিয়া কচি কচি হাত দুখানি নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া কহিল ঃ—

"তবে আমি চাইনা বর বর পরে নীলাম্বর,
কাকাতুয়া করে খেলা, শিখাই তারে হরিবলা ;
থেকে থেকে দেই দোল ।"

বিন্দু হাসিয়া কহিল "গাও তবে হরিবলা"

মঙ্গলার একটি আদরের পোষা কাকাতুয়া ছিল। অবসর-মত মঙ্গলা কাকাতুয়াকে হরিবলা শিখাইত। পাখীও 'হরি' 'হরি' বলিতে শিখিয়াছিল, বিন্দু তাই সাধ করিয়া পাখীটীর নাম রাখিয়াছিলেন "হরিবলা।" চঞ্চলার খেলার আভাস পাইয়া হরিবলা মঙ্গলার দিকে চাহিল, সে চাহনির অর্থ তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা। কাকাতুয়া চঞ্চলার খেলার দোসর—হরিবলা চঞ্চলার গানের সঙ্গী ; মঙ্গলা সস্নেহ দৃষ্টিতে হরিবলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, গাও তবে 'হরিবলা।' আদেশ পাইয়া কাকাতুয়া গাইল—

"নামটী আমার হরিবলা
হরি হরি বল মন খাবে যদি দুধ কলা।
মায় কেঁদে হরির নামে, চেলী চায় হরির কোল,
শুন্‌ব আজ চেলীর মুখে মধুমাখা হরিবোল"

মঙ্গলার গ্রাসাচ্ছাদনের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কাকাতুয়ার দুধ কলার বন্দোবস্তের ত্রুটী ছিল না। বিন্দুকেও মাঝে মাঝে সে জন্য বেগ পাইতে হইত। সেটী সুমতি চঞ্চলার আবদার-জনিত। কাকাতুয়াকে খাইতে না দিয়া চঞ্চলা খাইত না।

একদিন কুটীরে কিছু ছিল না ; মাত্র চঞ্চলার জন্য কয়েকখানা রুটী ছিল, চঞ্চলা তাহা না খাইয়া রুটী কয়খানি কাকাতুয়াকে দিল। দুধকলা প্রিয় কাকাতুয়ার মুখে রুটী তত ভাল লাগিল না; সে সামান্যমাত্র খাইল তাও বোধহয় দাতার সম্মান রক্ষার্থ ; অবশিষ্টগুলি চঞ্চুপুটে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিল। সে অবধি বিন্দু প্রায়ই কাকাতুয়ার জন্য ছোলার ছাতুর বন্দোবস্ত রাখিতেন।

প্রিয় কাকাতুয়ার গান শুনিয়া চঞ্চলা চাঁদের বিয়ের কথা ভুলিয়া গেল ; অমনি সে গান ধরিল —

হরি আমায় কর কোলে,
আমি কোলের কাঙালিনী ডাকি হরি হরি ব'লে ;
হরি আমার দয়াল পিতা, হরি আমার জগন্মাতা ;
আমি হরিনামে করি খেলা নাচি দুটী বাহুতুলে।
(আমি) হেসে বলি হরি হরি,, কেঁদে ডাকি শ্রীমুরারী,
(আমি) দুখ জানিনা, সুখ চাহিনা,
হরিনামে সব যাই ভুলে।

মঙ্গলা ও বিন্দু সে গানে যোগ দিলেন ; তখন অনুচ্চ পঞ্চমে সুখ সঙ্গীত চলিল। হরিনামে বিভোর হরিবলা ঘন ঘন দোল দিয়া বলিতে লাগিল—

"শোনরে আজ চেলীর মুখে মধুমাখা হরিবোল।"

প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে মঙ্গলার মনের মিল— প্রাণের টান ছিল, বিন্দুর তাদৃশ ভাগ্যহীনাবস্থার সঙ্গে যাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, তাহাদের মধ্যে স্নেহ

কেহ আসিয়া যোগ দিলেন; যাহাদের গাইবার শক্তি ছিল তাহারা গাইল;—

"হরি আমায় কর কোলে,
আমি—দুঃখ বুঝিনা সুখ খুঁজিনা হরিনামে সব যাই ভুলে।"

এসময়ে কাকাতুয়া আবার বলিয়া উঠিল ঃ—

"দোল দোলা দোল—হয় না যেন ভুল
হরি হরি ব'ল সুমধুর বোল।"

আহা মঙ্গলার কি শিক্ষা! বনের পাখী লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বনের স্বাধীনতাসুখ ভুলিয়া শিখিয়াছে 'হরিবলা।' পাখী তোর জন্ম সার্থক!

সেই পঞ্চমীর চাঁদ অস্ত গেল—ক্রমে আকাশ মেঘমুক্ত হইল, তারকা মণ্ডলী যেন ক্রমে উজ্জ্বলতর হইল; হরি নামের সে বিমোহন উচ্ছ্বাস যেন নৈশ সমীরণে মিশিয়া অনন্ত হইতে অনন্ত দূরে চলিয়া গেল, প্রতিধ্বনি আদেশবাণী রূপে সে সঙ্গীতধারা নিস্তব্ধ পল্লীতে সুপ্তগৃহে বহন করিয়া গৃহবাসীর কর্ণমূলে বলিয়া দিল—

"হয় না যেন ভুল—হরি হরিব'ল সুমধুর বোল।"

সঙ্গীতাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া চঞ্চলা ঘুমাইয়া পড়িল। সঙ্গীতাবেশে হৃদয়ের আবেগে বিন্দুও নিঃসংজ্ঞ হইলেন। এ তন্দ্রা, মূর্চ্ছা কি হরিপ্রেমের মোহ—সে বিচারের ভার পাঠক পাঠিকাগণের উপর রহিল। সঙ্গীত থামিল কিন্তু বিন্দুর মোহ ছুটিল না; সে মোহবশে বিন্দু একবার বলিতেছিলেন,—

"কই মা তোর মমতাময়ী শান্তি ছায়া? দেও মা দাও একবার দেখা—দেখি মা তিলেকের জন্য দেখিয়া এ তাপিত প্রাণে শান্তি পাই কি না।"

আবার বলিতেছিলেন ঃ—

"ঠাকুর আমি তোমার কে? কাহার জন্য প্রাণাদপি প্রিয় দেব ধর্ম্ম ভুলিয়া এ শ্মশানক্ষেত্রে কালাতিপাত করিবে? —স্বামীর সন্ধান অসম্ভব—আমার অশ্রু বিন্দুই সম্বল! যদি ক্ষীণ ক্ষুদ্র অশ্রুধারা মহাপ্রভুর পদমূল স্পর্শ করিতে পারে, মধুসূদন যদি হাত বাড়াইয়া পাপীকে অভয় প্রদান করেন, পাপীর হয় ত মন ফিরিবে;—ঠাকুর সে অপেক্ষায় থাকিও না—যাও তবে যাও—সে কল্যাণময়ী কল্যাণীর ধামে—স্বামীজী হয় ত তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। গাও তবে আবার সে মধুর গান—

"বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন;
সৃজন পালন যাঁর—যিনি নিত্য নিরঞ্জন!"

ঐ যে কে আকাশে গাইতেছে—"বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন।" উঃ ঐ যে থামিয়া গেল—সে মধুর মহা-সঙ্গীত পাপীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না করিতে অর্দ্ধপথে নিশ্বাস পবনে যেন মিশিয়া গেল! ওঃ—আর শুনিব না—আর কেহ গাইবে না—সে মধুর গান—প্রাণানন্দ—হৃদয়স্পর্শী হরিনাম! হরি! হরি!! তবে আর সাধন সিদ্ধ হইল না; ভগবৎবাসনা পূরিল না!"—বলিতে বলিতে বিন্দুর কণ্ঠ রোধ হইল; কেবল উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ও ধারাবাহী

নয়নাসার সে ক্ষীণ জীবাত্মার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছিল! বিন্দুর তাদৃশী হরিভক্তি ও তন্ময়তা দেখিয়া মঙ্গলা আদরে বিন্দুকে নিজ অঙ্কে টানিয়া লইলেন, আর মনে মনে কহিলেন—"বিন্দু বয়সে বালিকা কিন্তু তাহার ভগবদ্ভক্তি ও আসক্তি জ্ঞান বৃদ্ধারও অনুকরণ যোগ্য!

মঙ্গলার স্নেহময় কোমল কর সংস্পর্শে বিন্দুর লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; বিন্দু স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় কহিলেন—"মঙ্গলে! সত্যই কি স্বর্গে সুরকণ্ঠে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন হইতেছিল?" বিন্দুর চিবুক ধরিয়া সোহাগ করিয়া মঙ্গলা কহিলেন—"স্বর্গে নহে—ভক্তি কুটীরে—বিন্দুর বিনোদ অঙ্গনে।"

সে কথা শুনিয়া বিন্দু লজ্জিত হইয়া মঙ্গলার কর-পল্লব আপন যুগল করে চাপিয়া ধরিয়া সে সোহাগভরা আদরের সদুত্তর দিলেন।

দ্বাদশ কল্প।

কালের রহস্যোদ্ভেদ দুষ্কর। সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হয়, ধনধান্যে ভরা প্রীতিময়ী বসুন্ধরা অজন্মা অফলা হয়; মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সৃষ্টিস্থিতিবিলয়কর ভীষণ প্রলয় আদি প্রকৃতির বিকৃতি, এ সমস্তই কালের কুটীল কটাক্ষের পরিচয়। সে দুষ্টকালও চলিয়া যায়; কালবশে সে বিকার ও বিলোপ পায়—থাকে কেবল স্মৃতি—লোক শিক্ষার বিচিত্র আলেখ্য!

গোসাঞীর গৃহত্যাগের পর বর্ষাধিক কাটিয়া গেল; কিন্তু বিন্দুর ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল না—তদীয় অদৃষ্টে স্বামী সন্দর্শন ঘটিল না। শিক্ষাগুণে বিন্দু আর পতিপ্রেম ভিখারিণী নহেন! বিন্দু এখন মধুসূদনের শ্রীচরণে পতির সুমতির ভিখারিণী! বিন্দু অন্য সুখাকাঙ্ক্ষিণী নহেন, ভোগবাসনাবিরহিতা বিন্দু চাহেন স্বামীর সুখ শান্তি। বিন্দুর সংসারের আসক্তি ভগবান আর কর্ম্ম চঞ্চলার কল্যাণ! চঞ্চলা [illegible] খেলা ধুলা ছাড়িয়া উপকথাছলে ভক্তিমালা লইয়াছে; শিক্ষা কৌশলে হরিনামের খেলা শিখিয়াছে; চঞ্চলা বিন্দুর প্রাণ; চঞ্চলা জানে বিন্দুই তাহার মা, বিন্দুই তাহার সর্ব্বস্ব! বিন্দু ব্রহ্মচারিণী যৌবনে যোগিনী, পরিধানে গেরুয়া, গলায় হরিনামের মালা বাহুমূলে রুদ্রাক্ষ, একান্ন বা ফলমূল আহার, রুক্ষকেশে জটাভার।

করোঞ্চা গণ্ডগ্রাম হইলেও অধিবাসীর সংখ্যা বিস্তর! পল্লীতে পল্লীতে মিশামিশি, ঘরে ঘরে ঠেসাঠেসি! সর্ব্বত্র লোক কোলাহল—আনন্দ উৎসব! সে জনতাপূর্ণ গ্রামে

বিন্দুর সুখ দুঃখ বোঝে তেমন সদাশয় ব্যক্তি কেহ নাই; বিন্দুর রূপভরা যৌবনের নদী আছে, কিন্তু নাই তরঙ্গ; অসহায়া অবলাকে আপন জ্ঞানে আবরিয়া রাখে মঙ্গলা ব্যতীত তেমন আর কেহ নাই। সুতরাং লোকচক্ষুজ্বালা ছাইরূপ বিন্দুর বিষম অশান্তির কারণ হইল, মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতে হইল; কিন্তু যাঁহার প্রাণ ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত, যাঁহার জীবন মন মধুসূদনের পদকমলে উৎসৃষ্ট, সংসারের বিকট ভ্রূভঙ্গি তাঁহার নিকট তুচ্ছ; যিনি ভগবচ্চিন্তায় তন্ময়, বাহ্যবিকার তাঁহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ ছায়া মাত্র! বিন্দু ধর্ম্মের পথে অচলা অটলা হইয়া একমাত্র ভগবানের পদছায়াকে জীবনের ধ্রুবতারা জানিয়া সাধনের পথে অগ্রসর হইলেন। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই বুঝিতে পারিলেন, বিন্দুর চরিত্রবল আর হরি সাধনের মাহাত্ম্য কত! পরশ্রীকাতরতা যাহাদের অঙ্গভূষণ, পরনিন্দা যাহাদের নিত্যসাধন, পরপীড়ায় যাহাদের আনন্দ, মিথ্যাপবাদরটনা যাহাদের স্বভাব, তাহারা বিন্দুর সেই উদার হৃদয়ের নিকট লজ্জা পাইল; তাহারা বুঝিল, হরিনামে যে কাঁদে, অলীক অমানুষিক ভ্রূভঙ্গি তাহাকে কাঁদাইতে পারে না। মহাবটের নিবিড় ছায়াতলে উপবিষ্ট দুস্থ পথিক যেমন নিদাঘতপনতাপে ভীত হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মমায়া ও সত্যছায়ায় যাঁহার প্রাণ আচ্ছাদিত, পঙ্কিল পাপ প্রবাহ তাহার নখাগ্র ও স্পর্শ করিতে পারে না। সেই অলোকসম্ভব ত্রিদিববাঞ্ছিত ধর্ম্ম ও সত্যবল সম্বল করিয়া বিন্দু সেই ক্ষুদ্র কুটীরে চঞ্চলাকে লইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। বলা আবশ্যক

যে সংসার-সমরে বিজয় লাভের প্রধান অস্ত্র মঙ্গলা। মঙ্গলার অকৃত্রিম স্নেহ মমতা ও একপ্রাণতাবলে বিন্দু সর্ব্বত্র অপরাজিতা থাকিলেন।

এভাবে আরও কিছুকাল কাটিল; একদা সহসা আকাশে প্রলয় বহিল, সাগরে বান ডাকিল, সোহাগের শেফালি নিশাবসানের পূর্ব্বেই ঝড়িয়া পড়িল। অবলার সম্বল অঞ্চলের নিধি চঞ্চলা চোরকরে অপহৃতা হইল। বিন্দুর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সংসারের বন্ধন ছিন্ন হইল। বিন্দু হা চঞ্চলা—হা হতোস্মি বলিয়া পথের ভিখারিণী হইলেন; করোঞ্জার সে আশ্রমকুটির ত্যাগ করিয়া চঞ্চলার খোঁজে বিন্দু কোথায় চলিয়া গেলেন। অতঃপর করোঞ্জায় আর বিন্দুর ছায়া দৃষ্ট হইল না।

প্রায় সর্ব্বত্রই পীণ্ডারীর উপদ্রব দিন দিন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। গোদাবরীপ্রদেশে ঠগীগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে লাগিল। একদা গোসাঞীর কুটীরে ডাকু পড়িল; সে কুটীরে ঐশ্বর্য্য বা মূল্যবান তৈজসপত্র কিছুই ছিল না; কিন্তু ধনলোলুপ দস্যুগণ ব্যর্থমনোরথ হইয়া শূন্যহস্তে ফিরিবার নহে; রজতকাঞ্চনের অভাবে সেই অপার্থিব দেবতাবাঞ্ছিত সুযুপ্তা সরলা বালিকাকে অপহরণ করিল; এই ব্রাহ্মণ কন্যাপ-হরণই ঠগী দমন ও পীণ্ডারীকুলের মূলোচ্ছেদনের কারণ হইল। ফৌজ মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল; গোদাবরী প্রদেশ ঠগীগণের প্রধান লীলাক্ষেত্র জানিয়া সর্ব্বাগ্রে মেজর সাহেবের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হইল এবং অসংযতবেগে

ঠগীদমনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ইংরাজ ফৌজের সহকারী হইলেন। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় ঠগীর গুপ্ত অভিসার ফৌজগণের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। সুতরাং অনতিবিলম্বে ঠগীদমনের উপায় উদ্ভূত হইল।

ত্রয়োদশ কল্প।

কাল আর স্রোতগতি সমধর্ম্মাবলম্বী, কবি-কল্পনার প্রমত্ত রথ। কালের গতি যেমন অনিয়ত ও অপ্রতিরোধ,সাগরস্রোত ও তেমনি অনিরুদ্ধ ও অনন্তগামী। কালেরগতিকে যেমন রোধ করা যায় না, সাগরের বেগবান প্রবাহও তেমনই বাধা মানেনা ; শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের অঙ্গশোভা প্রকাণ্ড শিলা খণ্ডকে ফুৎকারে উড়াইয়া সাগর হইতে সাগরান্তরে চলিয়া যায়! গোষ্পদে সাগরের সৃষ্টি যে কালমাহাত্ম্য, সে কাল মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষভাবে সাগরবক্ষে চিত্রিত করিবার জন্যই যেন স্রোতের সৃষ্টি। সাগর জীবনে মানব জীবন প্রতিবিম্বিত, প্রত্যেকটি তরঙ্গে যেন জীবনবিন্দু প্রতিফলিত! প্রত্যেকটী কালমুহূর্ত্ত যেন অঙ্গুলী সঙ্কেতে বলিয়া দিতেছে—ঐ দেখ সাগর জলে তরঙ্গ লীলা। মানবগণ ঐ তরঙ্গের এক একটি বুদ্‌বুদ্ মাত্র, উঠিতেছে—পড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, লয় পাইতেছে—আবার উন্মত্ত-প্রায় ইতস্ততঃ ছুটিতেছে ; কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দিন যায়, পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম গগনে দিনমণি অস্ত যায় ; বনশোভা সরস বসন্ত নিদাঘে জ্বলিয়া যায়। কেহ থাকে না, কেহ কাহারো মুখাপেক্ষী হয় না, আপন মনে আপন ধ্যানে চলিয়া যায় ; সংসারে আসা দুই দিনের জন্য, শরীর অনিত্য, শরীরী অনিত্য—শরীরযাত্রা ততোধিক অনিশ্চিত! তবে নিত্য—সার ধর্ম্ম কি? বিবেক আসিয়া কর্ণমূলে বলিয়াদিল—"নিষ্কাম যোগ সাধন—শ্রীমধুসূদন!"

শীতের অন্ত হইল, বিনোদ বসন্ত আসিয়া হাসিয়া দেখা

দিল; বনশোভা তরুগণ কিশলয়দলে বিভূষিত হইল, কোকিলের কুহুরবে কুঞ্জকানন জাগিয়া উঠিল; সে ধ্বনি বিলাসিনীর প্রাণে বিষম বাজিল, বিরহিণীর হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। কুসুমের সুবাস লইয়া দুষ্ট পবন দূরে দূরে ছুটিল, মধুর ঝঙ্কারে অলিগণ বসন্তের আগমনী গাইল; সে ঝঙ্কারে প্রকৃতির ভাঙ্গাবাণা বাজিয়া উঠিল; সুখবসন্তে মধুমাসে—প্রকৃতির মনোমোহন নবীন বেশ—জীবজগতে নূতন চিন্তা—কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন উৎসাহ আনয়ন করিল।

আজ মধুমাসের শুক্লাষ্টমী—সুধাংশুশোভিনী মধুরযামিনী, তারকামালিনী নীল নভোমণ্ডল! বনে বনে যোগীজনমনলোভা ফুলশোভা, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র দৃশ্যপট! অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও বিন্দুর কুটীরাঙ্গনে কীর্ত্তন হইল, অন্য দিনের ন্যায় কীর্ত্তনান্তে মঙ্গলা আপন গৃহে ফিরিলেন, কাকাতুয়া অন্য দিনের ন্যায়—"দোল্ দোলা দোল্, হয় না যেন ভুল, হরি হরি ব'ল—সুমধুর বোল" বলিয়া বিন্দুর নিকট সে রাত্রির জন্য বিদায় লইল। বিন্দু কোন কথা কহিলেন না, আজ তিনি চিন্তামগ্ন—নিঃসংজ্ঞ। মঙ্গলা যখন চলিয়া গেলেন, নিশা তখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত; মাথার উপর দিয়া দুইবার পাপিয়া ডাকিয়া গেল; অপূর্ব্বদৃষ্ট কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ভাঙ্গা মেঘ স্বচ্ছ গগনে সহসা দল বদ্ধ হইয়া যেন কি এক ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত হইল! মঙ্গলা যাওয়ার পর আর একবার পাপিয়া ডাকিয়া গেল, কিন্তু আজ আর বিন্দুর মোহ ছুটিল না। আজ বিন্দু ব্যাধিগ্রস্ত, জ্বর বিকারে সংজ্ঞাহীন; আর চঞ্চলা? অবোধ বালিকা শান্তিময় সুনিদ্রার কোলে

আনন্দময় ক্ষুদ্র প্রাণটীকে হরিপদে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল। শিক্ষাগুণে সরলা বালিকার ধ্রুব বিশ্বাস যে "হরিনামে যে খেলে সংসারে সে নির্ভয়" "হরির নামে যে কাঁদে, শোক দুঃখ, পাপ, তাপ তাহার নিকট আসে না।"

ছিদ্র পাইলে অনর্থ বহুল হয়; নৈশগগনে যেমন একটী তারকা হাসে না, কুসুম বাটিকায় যেমন একটি কুসুম ফোটে না, সাগরবক্ষে যেমন একটি তরঙ্গ ছোটে না, সময় মন্দ হইলে বিপদ ও তেমনি একাকী আসে না। সেই কাল নিশাতে নিরাশ্রয়া নিঃসংজ্ঞা বিন্দুর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল; সে আঘাতে অবলার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল. ভবিষ্যতের আশা ভরসা সব ফুরাইল: পরমযত্নপোষিতা স্নেহলতা সহসা অন্তর্হিতা হইল।

ভগবানের কি বিচার কে জানে? সেই ভীষণ রাত্রিতে— গোসাঞীর করোঞ্চার সেই ক্ষুদ্র কুটীরে ডাকাত পড়িল; নিশা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঘোর অন্ধকার, পল্লী নিস্তব্ধ ও সুষুপ্ত; বনকোলে ঝিল্লীরব, সুদূর পল্লীতে সারমেয় চিৎকার রজনীর সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আর থাকিয়া থাকিয়া অশোক তরুশাখে পেচকের অশিব ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। এতাদৃশ ভীষণ নিশাই নরপিশাচ-গণের অভিসারের প্রশস্ত সময়। পামর পীণ্ডারীগণ সাবধানে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু কোথাও রজতকাঞ্চনের গন্ধ মিলিল না; সামান্য দু' একখানা অর্দ্ধভগ্ন থালি কোটরা ভিন্ন সে সংসারে অন্য তৈজস

পত্রের সম্পূর্ণ অভাব। ঠগীগণ একেবারে নিরাশ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল; রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন ঠগীর স্বভাব ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ! কুটীরাঙ্গনে একখণ্ড ছেঁড়া মাদুরে চঞ্চলা নিদ্রিতা আর বিন্দু সংজ্ঞাহীনা মৃতকল্পা; বিন্দুকে তদবস্থ দেখিয়া দলস্থ কোন কোন দুষ্ট পীণ্ডারী কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিলাসে ডুবিতেছিল; সে হাবভাব দেখিয়া দলপতি কি সঙ্কেত করিল, দুষ্ট পীণ্ডারীগণ নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। * এ দলাধিপতি স্বয়ং আমীরআলী; পীণ্ডারীগণ ও ফৌজের ন্যায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত, যোগ্যতানুসারে একজন দলপতি থাকে, দলস্থ অন্যান্য দলাধিপতির অনুগত ও আজ্ঞাধীন হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তদনুগমন করিয়া থাকে। আমীরআলী কহিল "আজ আমরা রূপের মোহে কালসাগরে ডুবিতেছি, এ পাপ আমাদের ধর্ম্মে সহিবেনা। সতীর রূপাগ্নি বস্ত্রে আবরণ অসম্ভব; বরং সে আগুণে পীণ্ডারীকুল ভস্মীভূত হইবে।"

তচ্ছ্রবণে সকলেই নীরব—নিস্তব্ধ! জনৈক প্রগল্‌ভ যুবক অন্যের অশ্রুত স্বরে স্বগত কহিল—'ধন রত্ন অনেক লুণ্ঠন করিয়াছি তাহাতে আর সাধ নাই; আজ এ রমণী রত্ন লইব; অলোকসম্ভব এ রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলেও সুখ।"

দ্বিতীয় এক ব্যক্তি কহিল, আজ এ মনোহর রূপের ডালাই আত্মসাৎ করা সঙ্গত! মেয়েটার রূপ আছে, কালে দেব সেবায় লাগিবে।

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল এ মেয়েটা কে? সেদিন সর্দ্দারজীর

যে মেয়েটা মারা গিয়াছে এ রূপ দেখিয়া যেন আমার সে স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! যেন ঠিক সেই মুখখানি!

চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, গাছ আর ফলের একত্র সমন্বয় সুবিধা-জনক নহে; বরং ফলটা আহরণ করাই বিধেয়।

পীণ্ডারীগণের মধ্যে ক্ষণকাল এরূপ বাদানুবাদ চলিল; অবশেষে স্থির হইল মৃতকল্প পীড়িত প্রাণ লইয়া বিপন্ন হওয়ার প্রয়োজনাভাব; সুফল সংগ্রহই সঙ্গত। তখন অধিনায়কের অনুমোদনক্রমে একজন বলিষ্ঠ পীণ্ডারী হরিমতি সুষুপ্তা চঞ্চলাকে অঙ্কদেশে লইয়া অতি সন্তর্পণে প্রস্থান করিল; দলস্থ অন্যান্য ঠগীগণ ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গেল। অধিনায়ক আমীর আলী দুইজন বিশিষ্ঠ পীণ্ডারীসহ চঞ্চলার অনুগমন করিল।

চঞ্চলা জানিত না দুঃখ আর দুঃখের অশ্রু কি? বালিকা জানিত নয়ন বাষ্পাকুল হয় কেবল সেই মধুর হরিনামে—আর সেই প্রাণ মনোন্মত্তকর সুমিষ্ট গানে "হরি আমায় কর কোলে"। চঞ্চলা বুঝিত না "সুখের হাসি" কি? চঞ্চলা জানিত হাসি আর কান্না একাধারে এক তারে বাঁধা! হরিনামে মা কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হয়, অশ্রুজলে বদন ভাসিয়া যায়, আবার নাম করা শেষ হইলেই হাসিমুখে মেয়েকে সোহাগ করেন। মায়ের সে হাসিতে মেয়ের মুখে হাসি ফুটিত; আর চঞ্চলা হাসিত কাকাতুয়ার গান শুনিয়া; সান্ধ্যসমীরণের সুকোমল পরশে কুটীর পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র উদ্যানে যখন ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিত, পবনহিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া একটি ফুল যখন অন্যটীর গায়ে ঢলিয়া পড়িত, চঞ্চলা হাসিত ফুলের সেই খেলা দেখিয়া! চঞ্চলার

হাসির ও পাত্রাপাত্র ভেদ ছিল। বিন্দু, মঙ্গলা আর কাকাতুয়া ভিন্ন অন্য কাহার কাছে চঞ্চলার হাসি ফুটিত না; প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কখনও কেহ আদর করিয়া কোলে করিলে চঞ্চলা লজ্জায় মুখ নত করিয়া থাকিত; হাসিমুখে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে চঞ্চলা অতি মৃদু অতি সুমিষ্টভাষে উত্তর দিত কিন্তু হাসিত না। তা বলিয়া সে মুখছবিতে কখনও অতুল লাবণ্যের—সুধা হাসির অভাব হইত না। পিতৃস্থানীয় প্রতিবেশীগণের নিকটে যাইতে যে চঞ্চলা ভয় পাইত, আজ সে অপরিচিত বিকটাকার পুরুষের অঙ্কারোহণে—যেন যমদূতের কঠিন বক্ষে মস্তক রাখিয়া শমনসদনে চলিয়াছে!

চঞ্চলার সুখনিদ্রা যখন ভঙ্গ হইল তখন কালনিশা প্রভাত হইয়াছে। তরুণ তপনকর নিবিড় বনকোলে উঁকি মারিতেছে; যেন দূরে দূরে থাকিয়া অতি সন্তর্পণে দুষ্ট দস্যুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। দস্যুগণ দুর্গম দুরারুহ বিহঙ্গকুলকূজনবিরহিত পার্ব্বত্য পথে অবিরাম চলিতেছে। চঞ্চলা চোখ মেলিয়াই আবার চোখ মুদিল; সে ভীষণ বনদৃশ্য—ততোধিক সে বিকটাকার দস্যুবাহকের রুক্ষাকৃতি দর্শনে শিহরিয়া উঠিল; আর চোখ মেলিতে পারিল না; মনে মনে শ্রীহরিকে ডাকিল কিন্তু সাহস করিয়া কাঁদিতে পারিল না; সেটী বালিকার স্বভাববিরুদ্ধ! করোঞ্চায় যে বালিকা পুরুষের ছায়া হইতে দূরে দূরে থাকিত, আজ অজ্ঞাতকুলশীল কদাকার পুরুষাঙ্করুহা চঞ্চলার অবস্থা অন্যরূপ। বালিকা বুঝিতে পারিয়াছিল বাহকগণ দস্যু, তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া

যাইতেছে ; আর মাকে দেখিতে বা কাকাতুয়ার সঙ্গে খেলিতে পাইবে না। বুদ্ধি ও অবস্থানুযায়ী হইল, মুক্তকণ্ঠে চঞ্চলা যম-কিঙ্করদের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল ; কেহ যেন হৃদয়ের অন্তর-তম প্রদেশ হইতে বলিয়া দিতেছিল "ইহারা পাষণ্ড পীণ্ডারী, দুর্দ্দান্ত ঠগীদস্যু, দুর্ম্মতি ও ঘোর নিষ্ঠুর ; আকুল রোদনে ইহাদের হৃদয় গলে না;" সুতরাং ইহাদের মতবিরুদ্ধে চলায় লাভের অংশে লাঞ্ছনা মাত্র। ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকা এত কথা ভাবিতে পারিয়াছিল কিনা জানি না কিন্তু বালিকা যে চৌরকরকবলিত একথা তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে বাকী রহিল না। ভয়বিহ্বলা স্বগণবিরহকাতরা বালিকা মনে মনে ডাকিতেছিল "হরি হরি" আর ভাবিতেছিল করোঞ্চার সে ক্ষুদ্র কুটীর, মা, ময়লা মাসী, সাধের কাকাতুয়া আর কাকাতুয়ার প্রাণ মন মুগ্ধকর মিষ্ট গান "দোল-দোলা দোল, হয় না যেন ভুল, হরি হরি ব'ল সুমধুর বোল।"

চঞ্চলা আবার মনে মনে শ্রীহরিকে ডাকিল। সে ডাকে চঞ্চলার মনে সাহস আসিল, মুখের জড়তা ঘুচিল, মৃদু কাতর বচনে বাহকগণকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে ?"

প্রঃ বাঃ—আমরা কালীমায়ীর সেবক, মায়ের সেবাই আমাদের কার্য্য !

প্রঃ—মায়ের সেবক কত ?

উঃ—এ হেন সেবক সম্প্রদায় অনেক !

প্রঃ—আর সব কোথায় ?

উঃ—বনে বনে শৈলশিখরে মায়ের মন্দির আছে; অন্যান্য সকল মায়ের সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

প্রঃ—তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?

উঃ—সর্দ্দারজীর গড়ে!

প্রঃ—সে কতদূর?

উঃ—এখান হইতে অনেক দূর!

প্রঃ—আমার মা কই?

উঃ—বোধ হয় মরিয়াছেন!

প্রঃ—কে মারিয়াছে?

উঃ—কেহ মারে নাই, ব্যধিবিকারে মৃতকল্প হইয়াছিলেন, এতক্ষণে সম্ভবতঃ মারা গিয়াছেন!

প্রঃ—তোমরা আমাকে মাতৃকোল হইতে কাড়িয়া লইলে কেন? আমি মার কোলে মহাসুখে মরিতাম! আমাদ্বারা তোমাদের কি হবে?

উঃ—তুমিও মায়ের সেবা করিবে!

প্রঃ—আমি মায়ের কে? তিনি আমার সেবায় সন্তুষ্ট হবেন কেন?

উঃ—সর্দ্দারজী নিঃসন্তান, তিনি তোমাকে সন্তানবৎ পরম যত্নে প্রতিপালন করিবেন; তুমি সুখী হবে!

প্রঃ—সুখ কি? সুখ হয় হরির গানে, তিনি কি আমাকে গান শিখাইবেন?

বাহক—গান—মায়ের স্তব?

চঞ্চলা—মধুর হরির নাম—তবেই মায়ের গান!

এত কথা বলা চঞ্চলার অভ্যাস নাই। কথা বলিতে বলিতে বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণটী কাঁদিয়া উঠিল, কণ্ঠরোধ হইল, চক্ষে জল আসিল; কিয়ৎক্ষণ এভাবে কাটিল; বালিকার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; সহসা অজ্ঞাতে বালিকার কণ্ঠে গান ফুটিল "হরি আমায় কর কোলে; আমি কোলের কাঙ্গালিনী ডাকি হরি হরি বলে" ইত্যাদি।

গাইতে গাইতে বালিকার হৃদয়ে শান্তি আসিল, সে শান্তি বিন্দু সংস্পর্শে বালিকা আবার ঘুমাইয়া পড়িল; বাহকগণ আর বালিকার শান্তি ভঙ্গ করিল না। যথাসময়ে আমীর আলী মুণ্ডলশৈলে মায়ের মন্দিরে পৌঁছিয়া চঞ্চলাকে সর্দ্দারজীর হস্তে অর্পণ করিল। সর্দ্দারজী কল্পনাতীত স্বর্ণ পুত্তলিকা লাভ করিয়া সহর্ষে গদ গদ ভাবে কহিল, 'আমীর, এ অমূল্য রত্ন লাভ তোমারই কার্য্য কৌশলে; তোমার এ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার কি হইতে পারে? আজ হইতে তুমি আমার সহকারী "দফাদার" বলিয়া সকলকে যথেষ্ঠ পুরস্কৃত করিলেন। পূজান্তে মায়ের চরণামৃতে চঞ্চলাকে শৈবমন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়া বালিকার নামকরণ করিলেন 'জয় তারা' জীবনের ধ্রুবতারা! পরদিন তারাসহ সর্দ্দারজী নওয়াগড় পৌঁছিলেন। এই সর্দ্দারই পীণ্ডারীদলাধিপতি চিতু সিং নাগপুর প্রদেশে একজন বর্দ্ধিষ্ণু জাগীরদার।

চতুর্দ্দশ কল্প ।

এস্থলে ঠগী দলপতি চিতু সর্দ্দারের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। চিতুসর্দ্দার বড় ঘরের ছেলে; তদীয় পিতা বীরসিংহ ওরফে বীরুসর্দ্দার রাট সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন গণ্য মান্য ও নাগপুর প্রদেশে একজন বড় জাগীরদার ছিলেন। বীরুসর্দ্দারের পিতা তদানীন্তন ভনসলা রাজের প্রিয় পারিষদ ছিলেন; রাজকার্য্যে তদীয় সুনাম ও যথেষ্ট ছিল; শিষ্টতা ও কার্য্য দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ সতের খানি মৌজা জাগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে প্রায় সমস্ত গ্রামই জঙ্গলাকীর্ণ অনুর্ব্বর ছিল। নাগপুর পর্ব্বতপ্রধান প্রদেশ; সে দেশের ভূমি ও স্বাধারণতঃ উপলময়। কিন্তু "পাষাণে পারিজাত ফোটে" এ প্রবাদের সার্থকতা ভন্সলা রাজ্যে বীরুসর্দ্দারই প্রথম প্রমাণ করিয়াছিলেন। তদীয় যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে পার্ব্বত্য গ্রামগুলি দিন দিন লোকালয়ে পূর্ণ ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইয়া উঠিল। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীরুসর্দ্দারের যশঃগৌরবও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কালে বীরুসর্দ্দার রাট সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিশিষ্ট জমীদার ও সমাজপতি বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে নাগপুর প্রদেশে ধান্যের চাষ প্রায় অজ্ঞাত ছিল; সকলেরই সরল বিশ্বাস ছিল যে সে দেশে বসুন্ধরার ধান্যোৎপাদিকা শক্তি নাই; সজলা না হইলে ধরণী সুফলা হয় না; ক্ষেত্র শস্যশ্যামলা

হয় না; প্রাবৃটের প্রবল ধারা ব্যতীত যে দেশ অজন্মা; যে দেশে বর্ষার বিরাট ধারা পার্ব্বত্য প্রবাহে মিশিয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়, সে দেশে বর্ষাপ্রাণ ধান্যোৎপাদন অসম্ভব। বীরুসর্দ্দারই প্রথম সে ভ্রম দূর করিয়া হেমবরণ ধান্যোৎ-পাদনের প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও অধ্যবসায় সহকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক পয়ঃ প্রণালীকে প্রস্তরখণ্ডে বাঁধিয়া জলাধারের সৃষ্টি করিলেন; বর্ষার জল উহাতে রক্ষিত হইত এবং আবশ্যকমত সমতলক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইত। এতদুপায়ে ধান্য আবাদের সূত্রপাত হইল; ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্থানে জলাধারের সৃষ্টি হইতে লাগিল, এবম্বিধ জলাধারের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে দিন দিন ধান্য আবাদের ও প্রসার পাইল; উপলখণ্ডময় অনুর্ব্বর মাঠ শস্যপূর্ণ সুন্দর শ্যামল রূপ ধারণ করিল। ক্রমে গ্রামে গ্রামে কূপ খনন ও জলাধার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল; ক্রমে বীরসিংহের গ্রামগুলি শস্যশালিনী হইয়া উঠিল; সুতরাং তদীয় গৃহ ভাণ্ডার ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইল। বর্ত্তমানে নাগপুরে ধান্যাবাদের প্রসার বিস্তর। উপস্থিত গ্রামে গ্রামেই বাঁধ ও কূপ আদি দৃষ্ট হয়। এখনও তত্রত্য অধিবাসীগণ নূতন বাঁধ বাঁধাইয়া মহাবীরের পূজা করিয়া থাকে। ব্যবস্থা প্রচারকের উপর আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য।

ভন্সলারাজ রঘুরাও স্বীয় রাজ্যের যথাসম্ভব উন্নতি সাধন কল্পে কৃষিকর্ম্ম বিসারদ বীরসিংহকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন; কার্য্যকুশল বীরসিংহকে অত্যল্প সময়ে রাজ্যের যথেষ্ঠ

উন্নতি সাধন করিয়া বিশেষরূপে রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। বীরুসর্দ্দারের বাসস্থান "দেওয়ানগড়" বলিয়া পরিচিত ছিল; তদীয় বাসস্থানের আদি নাম শীলাহুর, কিন্তু বীরুসর্দ্দার ভবানী ভক্ত ছিলেন, বহু অর্থব্যয়ে এক উন্নত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা ভগবতীর মোহিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া শীলাহুর ভবানীপুর নামেই বিখ্যাত ছিল; ভবানীর নিত্যসেবার জন্য হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর ছিল।

বীরুসর্দ্দারের একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্রপ্রবর চিতুসর্দ্দার অর্থাৎ চিত্রবর সিংহ পিতৃ বিয়োগের পর পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইলেন বটে কিন্তু ভাগ্যদোষে পিতা বা পিতামহের কোন সদ্‌গুণই তাহাতে অর্শিল না। বাল্যকাল হইতেই চিতু দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্বিনীত; বিলাসী ও দুঃসাহসী। যৌবনে সংসর্গ দোষে মানসিক বৃত্তিগুলি ক্রমে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল; বিবাদ বিসম্বাদ নিত্যকার্য্য মধ্যে দাঁড়াইল; বিবিধ উঞ্ছবৃত্তিতে পৈতৃক সঞ্চিত অর্থ ক্রমে নিঃশেষ হইল।

একদা দেশে মন্বন্তর উপস্থিত হইল; ক্রমে দুই বৎসর অনাবৃষ্টি হইল, বসুন্ধরা অফলা হইল; জমিদারীর আয় হইতে চিতুর সংসার চলা ভার হইল। অতিথিসেবা বন্ধ হইল; দাস দাসীর বেতন বাকী পড়িল, পণাভাবে বাণিয়া নিত্য রসদ যোগাইতে অক্ষম হইল। চিতু 'হা অর্থ' 'কৈ অর্থ' বলিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রাঠজাতী কঠোর কষ্ট সহিষ্ণু, সাহসী ও বলবান্‌। তরবারী তাহাদের বাল্য সহচর, তীরধনুতে সিদ্ধ হস্ত—নিত্য

খেলার উপাদান ; অনন্যোপায় হইয়া রাটগণ পেটের দায়ে দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিল ; কালে ইহারাই কোথাও পামর পীণ্ডারী কোথাও ঠগী নামে পরিচিত হইল। চিতুসর্দ্দার এই দলের নেতা হইলেন এবং দিন দিন দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থোপার্জ্জনের পথ খুলিয়া গেল ; এখন আর চিতুর অর্থের অনাটন নাই সুতরাং ভবানীপূজার সমারোহ বাড়িল ; দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য অন্নছত্র পুনঃ খোলা হইল ; প্রজাগণের বাকী খাজানা মাপ হইল ; আশ্রিত জ্ঞাতি কুটুম্বগণের সাহায্যে চিতু সিং মুক্ত হস্ত হইলেন।

ভবানীর পূজকগণ নিরীহ ও ধর্ম্মভীরু বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তান ; চিতুর নৃশংস বৃত্তি ও তদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থে ভবানীর পূজা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া পূজকেরা প্রাণে ব্যথা পাইলেন ; মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহারা মায়ের নিত্যপূজা মাত্র রক্ষা করিয়া কাঙ্গালী সেবার জন্য যে প্রচুর পরিমাণে ভোগের ব্যবস্থা ছিল তাহা বন্ধ হইল। মন্দিরাধ্যক্ষ জ্ঞানবৃদ্ধ বাসুদেব মিশ্র একদিন সর্দ্দারকে জানাইলেন "সরকার হইতে যে প্রচুর পরিমাণে ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে উহা মায়ের পক্ষে অস্পৃশ্য! তচ্ছ্রবণে রোষাক্তলোচনে কর্কশবচনে চিতু কহিলেন—"গুরুজি! ভবানীর নিত্যসেবার জন্য যে দেবোত্তর রহিয়াছে তাহাতে কি সরকারের সংস্রব নাই?" বাসুদেব সুপণ্ডিত, শিষ্টাচারী ও দেওয়ান বংশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী! চিতুসর্দ্দার ও মিছিরজীকে কুলগুরু জ্ঞানে ভক্তি ও সম্মান করিতেন ও গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু গুরু শত চেষ্টায়

ও শিষ্যের মতি ফিরাইতে পারিলেন না। যাগ যজ্ঞ সাধন পূজনেও চিতুকে যখন অমানুষিক নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিলেন না, তখন ভবানীর পূজকগণ ধ্রুব বুঝিতে পারিলেন এই মহাপাপে ভবানীপুরের অধঃপতন নিশ্চিত!

চিতুর উত্তর শুনিয়া গুরুজী স্তম্ভিত হইলেন, নীরবে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, সর্দ্দারজি, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মায়ের সেবাই আমার আনন্দ! আর মহামায়ার রাতুল চরণে ভবদীয় কল্যাণ কামনাই এ জীবনের ব্রত; ছোট বড় ধনী দুঃখী সকলেই মায়ের সন্তান—সমস্নেহাস্পদ! এক সন্তানের শোণিত-কলুষিত করে অন্য সন্তান মায়ের রাঙ্গা চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলে তাহাতে কি মায়ের আনন্দ হয়? তদ্বিপরীতে বরং অপ্রসন্নতাই ঘটে; মায়ের সেবার বরাদ্দ এ সরকারেরই বটে, কিন্তু পরস্বাপহরণ মূলক নহে; স্বর্গীয় মহাপুরুষের পৌরুষত্বে ও পুণ্যবলে; আর দেশে যে মন্বন্তর মহামারী চলিতেছে, সেও কেবল দানবিক উঞ্ছবৃত্তির ফলে।

গুরুজীর সে কথা শুনিয়া চিতুর প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগিল; সে আঘাত শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতিঘাত করিল কিন্তু সাহস করিয়া চিতু সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। চিতু নীরব নিস্পন্দ; গুরুজীর কথায় কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। চিতু কর্ম্মবীর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্য ভুলিবার নহেন; ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "গুরুজি যথার্থ বলিয়াছেন, ভবানীর পায়ে আমি মহাপাপী; সত্যই আমি কুলকলঙ্ক! কিন্তু এ পাপ বৃত্তি ও মায়ের সেবার জন্য!

পাপীর অর্থে এ সেবায় যদি ভবানী সুপ্রসন্না না হন, তবে অদ্য হইতে তাহা বন্ধ থাকিল। এখন হইতে ভবানীপুরে চিতুর পাপছায়া দৃষ্ট হইবে না; শেষ নিবেদন, মায়ের নিত্যসেবা যেন বন্ধ না হয়। সে জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ই যথেষ্ঠ! অদ্যাবধি সে সম্পত্তির ভারও ভবদীয় হস্তেই সমর্পিত হইল; এ পাপিষ্ঠের সঙ্গে আর সংস্রব রহিল না। "চোরা না শুনিবে কভু ধর্ম্মের কাহিনী" গুরুজী বুঝিলেন আর চেষ্টা বৃথা, একেবারে রসাতলে চলিয়াছে। প্রকাশ্যে কহিলেন—"ভবানীপুর ছাড়িয়া স্থানান্তর যাওয়া ভবানীর অভিপ্রেত না ও হইতে পারে!"

চিতু—একেবারে দেশান্তরিত হইব না; উপস্থিত মুণ্ডল শিখরে অবস্থিতি করিব; ইতিমধ্যে ক্ষিপ্রার কূলে নূতন গড় নির্ম্মাণ করার জন্য অদ্যই আদেশ দিব; আর সে পূরে কুলকুণ্ডলিনী নৃমুণ্ডমালিনী কালীকা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মায়ের সেবা করিব, দেখি মা প্রসন্না হন কিনা?

গুরু—সন্তান বিভিন্ন বটে কিন্তু মা একই! কাল ও প্রয়োজন-ভেদে আকারের ভেদ মাত্র! এই যে হেমবরণী শান্তি স্বরূপিনী ভবানী ইহা মায়ের আনন্দময়ী মূর্ত্তি; আর যে নৃমুণ্ডমালিনী করালবদনা কালীকামূর্ত্তির কল্পনা করিতেছ উহা মায়ের দনুজদলনী বিষাদমূর্ত্তি!

চিতু—মায়ের আবার বিষাদ কেন?

গুরু—কামনাই কর্ম্মের মূল; বাসনানুযায়ী কর্ম্ম ও কর্ম্মানুযায়ী বাসনা! সুতরাং বাসনানুযায়ী কর্ম্মফল ভাবিয়া এবং

ঠগী সম্প্রদায়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা সত্ত্বেও মা প্রসন্না নহেন—সুতরাং বিষণ্ণা!

চিতু—তবে কি মায়ের ইচ্ছা যে অনাহারে রাটকুল নির্ম্মূল হয়, দুর্ভিক্ষে দেশ রসাতলে যায়। মা বরদানে বসুন্ধরাকে ধনধান্যবতী করিয়া জীবকুল রক্ষা করেন না কেন?

গুরু—মায়ের অনুকম্পার অভাব নাই; অবর্ষণের পর সুবর্ষণ হইল, বসুন্ধরা সুজলা সুফলা হইল; ভিখারীগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; ভরপেট খাইয়া শ্রমজীবিগণ অজন্মা কষ্ট ভুলিয়া গেল। দুঃখ না থাকিলে সুখের মধুরতা উপলব্ধি হয় না; মন্বন্তর লোক শিক্ষার জন্য; সফলবর্ষে যথোচিত সঞ্চয় করিলে, লোক মিতব্যয়ী হইলে আর অজন্মার দিনে কষ্ট পাইতে হয় না।

চিতু—বুঝিলাম ঠগীবৃত্তি মহাপাপ! যে নরমুণ্ড মায়ের কণ্ঠ ভূষণ, সে মুণ্ডপাতে সন্তান কুণ্ঠিত হইবে কেন? ঠগীগণ কালীমায়ীর ভক্ত সন্তান, নরশোণিতে মায়ের পূজা সন্তানগণের জীবনব্রত!

গুরু—মায়ের করালরূপ ধারণ কেবল সুরদ্বেষী দনুজদলন হেতু; নিরীহ নিরাশ্রয় পথিকের মুণ্ডপাতের জন্য নহে। ধর্ম্মপথে উপার্জ্জিত অর্থই সত্য আর ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য। অকিঞ্চিৎকর অর্থলোভে দগ্ধ উদরের দায়ে সেই সদা সত্য নিত্যধনকে বিসর্জ্জন করা কদাপি ও বিধেয়

নহে; বিশেষতঃ এই ইংরাজ রাজত্ব, একদিন ইংরাজ ফৌজের হস্তে ঠগীগণের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী!

চিতু—জন্মিলে মরিতে হয় এ ধ্রুব নিশ্চয়! একদিন মরিতে হবে অমর হ'য়ে কে রবে? মৃত্যুভয়ে পীণ্ডারীপতি কাতর নহে, কাতর কেবল মায়ের সেবার জন্য! ভবানীপুরের সঙ্গে আমার সংস্রব এই শেষ! কিন্তু মায়ের পূজার যেন প্রতিবন্ধক না ঘটে—এটী পিতৃ-নিদেশ!

এই বলিয়া চিতু গুরুপদে প্রণত হইয়া বিদায় হইলেন; সেই দিনেই ক্ষিপ্রার কূলে নূতন বাটীর পত্তন হইল; চিতুর অর্থ ও লোকজনের অনাটন নাই; অত্যল্প সময়ে সৌষ্ঠবশালী সুন্দর পূরী ও কমনীয় কালীমন্দির বিনির্ম্মিত হইল; চিতু আর অবশিষ্ট জীবনে ভবানীপুরাভিমুখী হন নাই। কিন্তু পরিবারবর্গের ভবানীপুরে যাতায়াতে কোন বাধা ছিল না। অতঃপর নওয়াগড় হইতে মায়ের সেবার জন্য ভোগোপযোগী সামগ্রী পাঠাইবার আর ব্যবস্থা থাকিল না।

চিতু সর্দ্দারের দুই পরিবার—রমা ও অনুপমা। চিতু নিঃসন্তান; রমার একটি কন্যা জন্মিয়া চতুর্থ বর্ষে লীলা সম্বরণ করে। অনুপমার কোন সন্তান হয় নাই। সুতরাং করোঞ্জার সেই ব্রাহ্মণ কন্যা চিতুর জীবনতারা; রমা ও অনুপমার সংসারবন্ধন, হৃদয়াকাশের ধ্রুবনক্ষত্র, চন্দ্রিমা বিধৌত সুখধারা! রমা ও অনুপমা উভয়েই ভবানীভক্ত সুতরাং ভবানীর পূজায় পরমোৎসাহ! সর্দ্দারজীর ভবানীপুর পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সে উৎসাহ ও আসক্তি বাড়িয়া গেল; মায়ের সঙ্গে মেয়ের ও

ভবানীপুরে যাতায়াত ছিল ; দিন দিন তারার আদর বাড়িতে লাগিল ; গুরুজী তারাকে স্নেহ করিতেন, আদর করিয়া ডাকিতেন "শুকতারা"। ভবানীর সেবিকাগণ সকলেই তারাকে ভাল বাসিত ; দেবধর্ম্মে তারার ভক্তি অচলা বলিয়া ভবানীপুরের সঙ্গে তারার ঘনিষ্ঠতা ভক্তিমূলক।

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চিতু সর্দ্দার পীণ্ডারীপ্রধান ঠগীগণের অধিনায়ক। সুকৌশলে ব্যবসার সুপ্রসার ও অবলুণ্ঠিত ধনভাণ্ডারের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ভার দলপতির উপর ন্যস্ত ছিল ; সুতরাং কর্ত্তব্যানুরোধে চিতু সর্দ্দারকে কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিতে হইত ; মুণ্ডল শৈল-শিখরে কালীমায়ীর বিচিত্র মণিমন্দির ; মন্দিরের এক পার্শ্বে কুবেরের ধনভাণ্ডার ; সে তোষাখানা সংরক্ষণ ও ঠগী সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী কালীমায়ীর নিত্য সেবার জন্য চিতু সর্দ্দারকে অধিকাংশ সময় মুণ্ডল শৈলে থাকিতে হইত। প্রয়োজন হইলে ঠগীগণ সেই মণিমন্দিরেই সর্দ্দারের সাক্ষাৎ পাইত, সেজন্য আর নওয়াগড়ে প্রায় কাহাকেও যাইতে হইত না। প্রকাশ্যভাবে নওয়াগড়ের সঙ্গে ঠগীগণের তত একটা সংশ্রব ছিল না।

নওয়াগড়ে চিতুর অন্তঃপুরে দাস দাসীর অপ্রতুল ছিল না। নওয়াগড়ে বড় ঘরের চাল চলন, দেব দেবী অর্চ্চন, যাগ যজ্ঞ সাধন প্রায় নিত্য কর্ম্ম ছিল ; বুভুক্ষিতের জন্য অন্নছত্র খোলা ছিল ; আর্ত্তের জন্য যথাযোগ্য পথ্য পাচনের ব্যবস্থা ছিল ; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্য দানের খাতা অবারিত ছিল ; আবশ্যকানুযায়ী শিপাহী শাস্ত্রী, ঢালী শূলী, চোপদার, কোষাধ্যক্ষ, তীরন্দাজ, হয়,

বাজী প্রভৃতি সমস্তই ছিল—ছিল না কেবল অর্থের গৌরব, গৃহ জঞ্জাল—দাস দাসীর অশান্তিকর কোলাহল। সে কেবল সুগৃহিণীর গৃহিণীপণার ফল। চিতুর সম্পত্তির আয় বেশ ছিল, নওয়াগড়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় সঙ্কুলন হইয়াও যাহা কিছু বাঁচিত তাহা তোষাখানায় সঞ্চিত হইত; চিতু পৈতৃক সম্পত্তির কিছুই গ্রহণ করিতেন না। চিতুর আর অর্থানটন নাই।

শান্তশীল নামে জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার সঙ্গদোষে জাতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দুর্দ্ধর্ষ পীণ্ডারীদলভুক্ত হইয়াছিলেন; কার্য্য ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সন্তানের পুরুষকারের পরিচয় পাইয়া চিতু সিং শান্তশীলকে পৈতৃক সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণ ও সংসারিক নিত্য-কার্য্যকলাপের তত্ত্বাবধানার্থ নিযুক্ত করিলেন; তোষাখানার ভারও তাহাকে দেওয়া হইল; আর পাছে তারা জাতিতে পতিতা হয় এই আশঙ্কায় তাহার পান ভোজনের ভারও শান্ত-শীলের উপর ন্যস্ত হইল; প্রত্যুত মায়ের নিত্য সেবার যে ব্যবস্থা ছিল সে প্রসাদই উভয়ের আহার্য্য হইল। ভক্তিমতী ধর্ম্ম-প্রাণা রম্ভা ও অনুপমাও মায়ের প্রসাদ ভিন্ন অন্য দ্রব্য আহার করিতেন না। শুদ্ধাচারে ও বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি হয়, কালমাহাত্ম্যে শান্তশীলের ও তাহাই হইল; শান্তশীল কে এ স্থানে তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চদশ কল্প।

এই সেই করোঞ্চার ক্ষুদ্র কুটীর—গোসাঞীর সংসার লীলার প্রিয় ভবন। কুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী সেই অশোক তরুর নিবিড়-পল্লব শাখা প্রশাখা ধীরপবনে, তেমনি মৃদু মন্দ দুলিতেছে; পত্রের আড়ালে থাকিয়া পেচকগুলা থাকিয়া থাকিয়া অশিব চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আজ কুটীর নীরব—নিস্তব্ধ, যেন মন্ত্রমুগ্ধ; আজ আর কুটীরাঙ্গনের সে পরিচ্ছন্নতা নাই; স্থানে স্থানে জঞ্জাল জমা রহিয়াছে, সামান্য সমীরণে ধূলারাশি দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে, বোধ হয় যেন সে অঙ্গন অযত্নরক্ষিত ও পরিত্যক্ত! আর সে প্রাঙ্গনে হরিনাম ফোটে না, সে সুমধুর নাম না শুনিয়া দূরাকাশে তারকারাজিও যেন আর তেমন উজ্জ্বল—স্নিগ্ধ হাসি হাসে না। কুটীরের গায়ে যে একখানি ফুলের বাগান ছিল, কয়েকটী সামান্য গ্রাম্য ফুলের গাছ যাহার সম্বল, চঞ্চলার মুখে হরি নামের গান শুনিয়া যে ফুল ফুটিত—চঞ্চলার গান থামিলে যে ফুলগুলাগণ ঘুমাইত, চঞ্চলার অদর্শনে সে গাছ গুলিতে আর ফুল ফোটেনা। আজ কুটীর শূন্য, জনতা শূন্য, শোভা শূন্য শ্মশান ক্ষেত্র! যেন পঙ্কজ শূন্য সরোবর, তারকা শূন্য নীল নভঃ, আর মাধুর্য্য শূন্য দৃশ্যপট!

সেই কাল নিশার পর এক দুই করিয়া কয়েকদিন কাটিল; কতবার দিনান্তে নিশা আসিল, আবার নিশান্তে দিনমণি উদিল; সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমাবিধৌত মধুরা যামিনীতে কতবার আকাশ ভরিয়া পাপিয়া বিষাদ লহরী ছুটাইল প্রভাতে বিহগকুল নীরবে বন হইতে

বনান্তরে—দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া গেল কুলায়ের অন্বেষণে। করোঞ্চার কুঞ্জকাননে যেন তাহাদের সুখের বাসা ভাঙ্গিয়াছে আশা ভরসা গিয়াছে, প্রলয় প্রভঞ্জনে যেন সমস্ত লণ্ড ভণ্ড হইয়াছে; পশু পাখী তরু লতা যেন হাহাকার করিতেছে! চঞ্চলার বিরহে সকলে মরমে মরা ও আত্মহারা!

আর সেই সংসার ললাম সুষমাময়ী বিন্দু? সেই ব্যাধি-প্রপীড়িতা চঞ্চলা বিরহকাতরা শিবপ্রসাদ কন্যা? আজ বিন্দু ব্যাধি-বিমুক্তা হইলেও রূপহীনা! এই কয় দিনে সে অলোকসম্ভব রূপরাশির এত পরিবর্ত্তন—হেম প্রতিমায় ভস্ম আচ্ছাদন! বসন্তের বনকুসুম যেমন নিদারুণ নিদাঘ তাপে জ্বলিয়া যায়, ললিত লাবণ্যলতা উষ্ণ পবনের দীর্ঘ নিশ্বাসে শুষ্ক হয়, আজ বিন্দুর অবস্থাও তেমনি। নয়নে সে শান্তিময় নির্ম্মল জ্যোতিঃ নাই—নিয়ত অশ্রুধারায় ভাসিয়া গিয়াছে। মুখে আর মধুর হরিনাম নাই—স্বপ্নবৎ কালকুহকে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। রহিয়াছে কেবল কর্ম্মস্মৃতি! জ্বলন্ত চিতানলে ভস্মীভূত ইন্দুনিভ ইন্দুমণির সেই হাসিভরা ম্লান মুখখানি আর মুহূর্ত্ত দৃষ্ট ভগবদ্ভক্ত মহাযোগী পরমহংসের সেই সাম্যমূর্ত্তি! আর উভয়ের মধ্যস্থলে কোলের কাঙালিনী ষষ্ঠ বর্ষীয়া চেলী! হতভাগিনী বিন্দু ধূল্যবলুণ্ঠিতা, মর্ম্মঘাতী বিরহ বেদনায় ম্রিয়মানা—নিঃসন্তান হইয়াও সন্তান শোকাকুলা!

মঙ্গলা ও জয়মালার যত্ন ও সুশ্রূষায় বিন্দুর আর জ্বর বিকার নাই সত্য কিন্তু অন্তর্জ্জালা কমিতেছে না। কেবল "হা চঞ্চল" "কই চঞ্চলা" বই মুখে আর অন্য শব্দ নাই। এ ব্যাধি

শোচনীয় ও দুশ্চিকিৎস্য! ক্ষণে চিত্তের বিকৃতি, ক্ষণে সেই সাম্যমূর্ত্তি! ক্ষণে মর্ম্মভেদী পরিতাপ ক্ষণে বা উন্মত্ত প্রলাপ! ক্ষণে বিষ ভক্ষণে মরিতে সাধ, পরক্ষণেই আবার পুনঃ চঞ্চলা-দর্শনেচ্ছু হইয়া জীবনে অনুরাগ! একদা সন্ধ্যা সমাগমে মঙ্গলা, জয়া ও বিন্দু কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন, উভয়ের নয়নজলে বিন্দুর বসন তিতিতেছিল। মঙ্গলা বিন্দুর গলা ধরিয়া কহিলেন ' বিন্দু এ ভাবে আর কতকাল কাটিবে—সাধন-তৎপর এ ক্ষীণ কলেবরই বা কতদিন টিকিবে ?

জয়া—কেন দিদি, তোমারই মুখে শুনিয়াছি বিপদে ধৈর্য্য ও অভ্যুদয়ে ক্ষমাই মানব মহত্ত্ব, তবে তুমি সামান্যা রমণীর ন্যায় এত আকুল হইতেছ কেন ?

অতি কষ্টে হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া বিন্দু কহিলেন ঃ—ভাই এ দেহ আর সে দেহ নাই, মহাপ্রলয়ে বিচূর্ণ হইয়াছে—হৃদয় ভাঙ্গিল যদি এ পোড়া প্রাণ রহিল কেন ? মঙ্গলে—জীবনে কোন সাধ নাই—হৃদয়ে কোন বাসনা নাই ; একমাত্র কামনা—একমাত্র আশা একবার যেন চঞ্চলাকে চক্ষের দেখা দেখিয়া মরিতে পারি ; জয়ে, দুঃখিনীর আশা কি পূরিবে ?

মঙ্গলা—ভগবান বলিয়াছেন—নিত্য সত্য ধর্ম্মের নামে যাহা রাখা যায়—অসত্য অনিত্য কর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; বাঁচিয়া থাকিলে প্রাণের প্রাণ হৃত ধন পুনঃ কোলে পাইবে কিন্তু এ ভাবে দেহ পাত করিলে সে অপার্থিব ধনের উদ্ধার অসম্ভব! আশাই জীবনের মূল ; সে আশায় প্রাণ বাঁধিয়া সনাতন সত্যকে লক্ষ্য করিয়া

সাধনায় মনঃ সংযোগ কর, হাসিয়া আসিয়া চঞ্চলা দেখা দিবে।

বিন্দু—আবার চঞ্চলা ফিরিয়া আসিবে সে আশা দূরাশা মাত্র! সে রত্ন যে একবার পাইয়াছে প্রাণ থাকিতে সে কি আর তাহা ছাড়িতে পারে? সে যে আঁধারে উজ্জ্বল—উজ্জ্বলে মধুর; সে যে সাগর ছেঁচা ধন—সুখের স্বপন ভাঙ্গিলে আর আসে না! নিশাবসানে নৈরাশ্যের সুতপ্ত নিশ্বাসে জ্বলিয়া যায়! আর তাহা পাওয়া যায় না! এ মর্ম্ম জ্বালা হৃদয়ে পুষিয়া বাঁচিয়া থাকায় লাভের অংশে পদে পদে লাঞ্ছনা মাত্র!

মঙ্গলা—আমার মনে হয় চঞ্চলা যেন এই গৃহকোণে মায়ার আবরণে অদৃশ্যভাবে লুক্কায়িত, হরি প্রেমে উন্মত্ত—আড়ালে থাকিয়া আমাদের কথা শুনিতেছে। যখন সে মোহ ভাঙ্গিবে, মায়াজাল ছিন্ন হবে তখনই আবার ফিরিয়া আসিবে—আবার তোমায় মা বলিয়া ডাকিবে। এও লীলাময় ভগবানের ইচ্ছা; ভক্তের ভক্তির পরীক্ষার জন্যই যেন কৌশলে হরিবলা চঞ্চলাকে আমাদের চোখের আড়াল করিয়াছেন; পরীক্ষান্তে সর্ব্বমঙ্গলার অনুকম্পায় চঞ্চলাকে ফিরিয়া পাইবে।

বিন্দু—না ভাই ও তোমার মনগড়া কথা! পাপীকে লইয়া আবার পাপত্রাশ মধুসূদনের পরীক্ষা কি? এ সব ফাঁকি! চঞ্চলা আর ইহলোকে নাই! চঞ্চলা ফুলের খেলা ভাল বাসিত, বোধ হয় ঐ আকাশ কুসুমদলে

প্রাণে প্রাণে মিশিয়া খেলিতেছে! না না—তা ও নয়—আজ তারকামালার সে উজ্জ্বলতা নাই; এক দুই দশ বিশ শত সহস্র কত তারা ফুটিয়াছে আজ একটিও আমার চক্ষে সুন্দর দেখিতেছি না—একটিও আমার মনে লাগিতেছে না—আকাশের ফুল বুঝি তত সুন্দর হয় না! জয়ে! ঐ যে অন্তরাল হইতে কাণে কাণে কে বলিয়া দিতেছে—অজ্ঞাতে মরমে পশিয়া যেন আশ্বাসবাক্যে বুঝাইতেছে "চঞ্চলা মরে নাই আবার আসিবে!" মঙ্গলে, এ তোমার কথারই প্রতিধ্বনি; সত্য কি মিথ্যা জানি না—ভাল কি মন্দ বুঝি না—পায়ে ধরি, আমাকে বলিয়া দাও, একবার বুঝাইয়া দাও এ রত্ন একবার যে হাতে পায় সেকি আর তাহা ছাড়ে? সে মুখে যে একবার মধুর হরিনাম শোনে সে কি আর তাহা ভুলিতে পারে?

মঙ্গলা—তবে একবার গাও সে মধুর গান—

"বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন।
সৃজন পালন যাঁর যিনি নিত্য নিরঞ্জন!" ইত্যাদি।

বিন্দু—না মঙ্গলে ও গান আর না—ও গানেই যত কু! কোন্ ভক্ত জানি সে সুকোমল কণ্ঠে মধুর হরিনাম শুনিতে মায়া মন্দিরে লুকাইয়া রাখিয়াছে, এত স্নেহে এত মমতায় পোষা-প্রাণপাখীটির মুখে সুমিষ্ট গান শুনিতে স্বর্ণ পিঞ্জরে পূরিয়াছে!

মঙ্গলার কাকাতুয়া দোলায় দুলে দুলে নীরবে এ সকল

কথা শুনিতেছিল ; এখন গানের ধূয়া দেখিয়া সময় বুঝিয়া বলিয়া উঠিল ঃ—দোল্ দোলা দোল্. হয় না যেন ভুল, হরি হরি ব'ল সুমধুর বোল ।”

তচ্ছ্রবণে বিরক্তিভরে অনুচ্চ ক্রুদ্ধস্বরে বিন্দু কহিলেন—

চাই না তোরে কাকাতুয়া চাই না তোর হরিবলা
তোর ছলে হরি ব'লে—হারাইলাম চঞ্চলা।
শিক্লী কেটে পাখা ছেটে উড়ায়ে দিব আকাশ পানে,
বনের পাখী থাক্‌বে বনে ভুলে যাবে দোলনা গানে।”

তদুত্তরে কাকাতুয়া বলিল ঃ—

“ছেড়ে দাও মা মঙ্গলে
উড়ে যাই দূর জঙ্গলে
চঞ্চলাকে আনব ধ'রে দুধ কলা দিও দুনা করে।”

“দূতী হয়ে বনে যাও পাখি উড়ে
চঞ্চলার তরে সদা আঁখি ঝরে
যদি ধরে আন্‌তে পার তায়
দুধ কলা দিব যত প্রাণে চায়।”

বলিয়া মঙ্গলা বিন্দুর মনস্তুষ্টির জন্য এত সাধের পোষা পাখী কাকাতুয়ার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন; “হরি হরি” বলিয়া বনের পাখী উড়িয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ সজল নয়নে মঙ্গলা কাকাতুয়াকে দেখিলেন কাকাতুয়াও সজল দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

প্রতি মুহূর্ত্তেই পুরের জন্য ত্যাগ স্বীকারে মঙ্গলা প্রস্তুত; বিন্দুর জন্য—ততোধিক প্রিয়ধন চঞ্চলার পুনরুদ্ধারের

জন্য মঙ্গলা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিতা নহেন; স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা দূতীপণার জন্য পোষা পাখীকে বন্ধন মুক্ত করিবেন এ আর কোন্ বড় কথা! বনের পাখী বনে যাবে, গাছে গাছে উড়িয়া বনফল খাবে, বন ভ'রে হরিনাম ছড়াবে এতেও মঙ্গলার সুখ বিমল আনন্দ! এতদ্ব্যতীত, কাকাতুয়াকে শৃঙ্খল মুক্ত করার অন্য উদ্দেশ্য আছে কি না তাহা আপাততঃ অজ্ঞাত।

মঙ্গলার কার্য্য দেখিয়া বিন্দু ও জয়মালা অবাক হইয়া রহিল; ক্ষণকালের জন্য সে ক্ষুদ্র কুটীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল, সকলে নীরব—নির্ব্বাক যেন মন্ত্রমুগ্ধ! ক্রমে দিবাবসান হইল; বিহঙ্গমকুল কলরবে কুলায়ে ফিরিতে লাগিল; অশোকের নিবিড় শাখা হইতে পেচক ডাকিয়া ডাকিয়া আকাশ পানে উড়িল; সন্ধ্যা সমাগম জানিয়া মঙ্গলা কহিলেন;—গাও তবে—"বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন"—

তখন তিন জনে সন্ধ্যাসমীরণে কণ্ঠ মিশাইয়া অনুচ্চ পঞ্চমে গাইলেন—

"বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন,
সৃজন পালন যাঁর যিনি নিত্য নিরঞ্জন।" ইত্যাদি।

সে গানে বিন্দুর বিষ-বিদগ্ধ হৃদয়ে একটুকু শান্তির ছায়া পড়িল, বিন্দু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইলে মঙ্গলা ও জয়মালা চলিয়া গেলেন।

এভাবে আরও কিছুকাল কাটিল; মঙ্গলা ও জয়মালা আসিয়া প্রত্যহ বিন্দুর সঙ্গে কত আলাপ করেন কত কল্পনার ছবি গড়েন; গড়িতে গড়িতে একটি ভাঙ্গিয়া অন্যটি গড়েন;

পবিত্র প্রকরণে উজ্জ্বলবরণে সে কাল্পনিক চিত্রে বিচিত্র প্রভা ঢালিয়া দেন, অর্থ বাহ্যিক ব্যাপারে বিন্দুর মলিন মনকে টানিয়া আনা—নিয়ত চঞ্চলার চিন্তা হইতে পূর্ব্ববৎ ভগবচ্চিন্তায় নিয়োগ করা। যতক্ষণ কথা প্রসঙ্গে কাটে—ততক্ষণ বিন্দুর মূর্ত্তি এক স্থির শান্তি ও সাম্যময়ী ভক্তির ছবি; আর একাকিনী অবস্থায় সে মূর্ত্তি চিন্তাকুলা, বিষাদে মলিনা ও আবেগময়ী; প্রাবৃটের ধারায় উদাসে প্রাণ যেন উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, আর আত্মসংযম করিতে পারেন না। একদা নিশাকালে সে আবেগ অনিরুদ্ধ হইল, মানসিক চঞ্চলতা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল—কুটীরে আর মন তিষ্ঠিল না। বিন্দু বেশ পরিবর্ত্তনে ব্যস্ত হইলেন শাড়ীর পরিবর্ত্তে গেরুয়া পরিলেন, সুচিক্কণ চিকুর জালে জটা বাঁধিলেন সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ কাটিয়া "জয় মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনী" বলিয়া ঘরের বাহির হইলেন; গার্হস্থ সামান্য তৈজসপত্র ইতস্ততঃ কক্ষমধ্যে ছড়ান রহিল; রহিল না কেবল গৃহস্বামিনীর সে ক্ষীণ ছায়া! জপমালা অত্যক্ত সঙ্গিনী আদরে তাহা কণ্ঠে উঠিল—বাহুমূলে রুদ্রাক্ষ শোভিল। এ সকল বিন্দুর সাধনার সামগ্রী; বিন্দু আর সঙ্গে লইলেন একটি কাষ্ঠের কৌটা তন্মধ্যে চঞ্চলার দু' একখানা মাত্র আভরণ ছিল; ইহা লইতে গিয়া বিন্দুর চক্ষে জল আসিল। আর লইলেন পরমহংসপ্রদত্ত ইষ্টকবচ; উহা বাহুমূলভ্রষ্ট হইয়া শয্যায় পড়িয়া ছিল তাহাও সে কৌটার মধ্যে ছিল; আর কি লইলেন? একখণ্ড চকমকী পাথর ও একটি লৌহ শলাক! আজ হইতে করোঞ্জার সঙ্গে সম্বন্ধ ফুরাইল বিন্দুর নাম লোপ পাইল!

মঙ্গলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা প্রিয়ম্বদা ও ধর্ম্মাত্মা। মঙ্গলা বিধবা ও নিরাশ্রয়া তাই বিন্দুর সঙ্গে এত প্রণয় এত প্রাণের টান! বিন্দুর গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলার প্রাণে ও প্রলয় বহিল; কিছুদিন পর কল্যাণীর কৃপা ভিখারিণী হইয়া মঙ্গলাও গৃহত্যাগ করিলেন।

এখানে করোঞ্জার যবনিকা পতন হইল!

ষোড়ষ কল্প।

অদৃষ্টবাদীরা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ফলের উপর জীবনের ভাবী ফল ন্যস্ত করিয়া সংসার কার্য্যে অগ্রসর হয়। তাহাদের মতে অদৃষ্টানুযায়ী বুদ্ধি—বুদ্ধ্যানুযায়ী কর্ম্ম—আর কর্ম্মানুযায়ী ফল! সুতরাং ফল অদৃষ্ট সম্ভূত। বুদ্ধি কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালক। বুদ্ধি কৌশলে কর্ম্ম কুশল আবার কর্ম্ম ফলই প্রাক্তনের বিধান সূত্র—সুখ দুঃখের মূল তন্ত্র! আবার এই তন্ত্রই সাধনায় সিদ্ধি লাভের অনন্যোপকরণ!

মোহিতলাল অদৃষ্টবাদী—কর্ম্মফলের একান্ত পক্ষপাতী। তদীয় ধ্রুব বিশ্বাস একদিনে হউক দুদিনে হইক পামর পীণ্ডারী-গণকে পাপ কার্য্যের প্রতিফল অবশ্যই ভুগিতে হবে। নরহিংসা মহাপাপ—এ পাপ ধর্ম্মে সহে না। মোহিতলাল সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠ! তাঁহার চক্ষে এ নৃশংস ব্যাপার অসহ্য; তাই তিনি ঠগীদলনক্ষেত্রে অগ্রণী, ফৌজদলের সঙ্গে তাঁহার এত সহানুভূতি। সাধ করিয়া তিনি সুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ঠগীর অনুসন্ধানে পদে পদে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবনকে শঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। মোহিতলাল নির্ভীক, তাঁহার কর্ম্ম বাসনাশূন্য ও নিঃস্বার্থ! কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট অপ্রসন্ন! সুদীর্ঘ কাল পর্ব্বতকন্দরে—আঁধার প্রান্তরে—বন হইতে বনান্তরে বন্য জন্তুর ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। মোহিতলাল বুঝিয়াছিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ সাহেব এদেশীয়-গণকে বিশ্বাস করিতে না শিখিবেন, নিঃশঙ্কচিত্তে সরল মনে

তাহাদিগকে দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ কার্য্যোদ্ধার অসম্ভব !

দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টাতেও ঠগীর অত্যাচার নিবারণ হইল না ; কর্ত্তৃপক্ষ সেজন্য অসন্তোষকর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সে মন্তব্য পাঠ করিয়া মেজর সাহেবের চৈতন্য হইল ; মোহিতলালের প্রস্তাবে আস্থা হইল ; দেশীয়গণকে অকপটভাবে বিশ্বাস বিশেষতঃ ধর্ম্মভীরু সাধু সন্ন্যাসীগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিতে প্রস্তুত হইলেন। সে আহ্বানের ফলে দলে দলে সাধুগণ ঠগীদলনব্রতে ব্রতী হইলেন, কিন্তু অস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। তাঁহাদের সরল বিশ্বাস যোগবলই পাপীর অধঃপতনের অমোঘ উপকরণ ! ১৮২৬ খৃঃ অব্দে ঠগীদমনের সূত্রপাত আর ১৮৩৪ খৃঃ অব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত সামান্য সংখ্যক ঠগীমাত্র ফৌজদলের হস্তগত হইল ; এই সময়ের মধ্যে দলপতি চিতুসর্দ্দার ও দফাদার আমীর আলীর কোনও খোঁজ হইল না ; বন্দীগণ মরিতে প্রস্তুত কিন্তু দলপতি বা সামান্য ঠগীরও সন্ধান বলিতে অনিচ্ছুক ! সেটী ব্যবসার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ! ইংরাজ ফৌজের ভয়ে ঠগীগণ কাতর নহে, তাহারা পূর্ণমাত্রায় প্রতিযোগীতায় প্রবৃত্ত হইল ; ঠগীর দস্যুবৃত্তি—পীণ্ডারীগণের পাশব প্রকৃতি দু দশটী ইংরাজ ফৌজকে সম্মুখ সমরে নিহত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ইংরাজবলকে উপহাস করিতে লাগিল। এ বিভৎস দৃশ্য মোহিতলালের অসহ্য হইল ; বলক্ষয় জন্য তদীয় প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগিল ; তিনি জানিতেন প্রাণের মায়া করিলে চলিবে না ; ভগবানের শ্রীচরণে আত্মরক্ষার ভার

সমর্পণ করিয়া দেশের মঙ্গল জন্য নবোৎসাহে প্রবল প্রতাপে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আত্মত্যাগী বাসনা-বিরাগী মহাপুরুষগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় সাহায্যকারী সাধু দণ্ডীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মহাপুরুষগণও দেশে শান্তি সংস্থাপন ও সাধনমার্গ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য মহোৎসাহে ও অম্লানচিত্তে ঠগীদমনে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদেরই বাহুবলে ও কার্য্যকৌশলে অল্প সময়ে প্রায় সহস্রাধিক ঠগী বন্দী হইল; বলা বাহুল্য যে কল্যাণ সম্প্রদায়ই এক্ষেত্রে অগ্রণী; আবার সে সূত্রেই কল্যাণের সঙ্গে মোহিতলালের ঘনিষ্ঠতা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। আর সেই ঘনিষ্ঠতা মূলেই লালজী জানিতে পারিয়াছিলেন যে করোঞ্চার অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যা নওয়াগড়ে দলপতি চিতু সর্দ্দারের অন্তঃপুরে কন্যা বাৎসল্যে প্রতিপালিতা হইতেছে। সে ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধন আর ঠগী দমনই ইংরাজ ফৌজের প্রধান কর্ত্তব্য।

একদা মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ্যপর্ব্বতে উদয়গিরি নামে এক রমণীয় উপত্যকায় ব্রিটীশ পতাকা উড্ডীয়মান হইল; স্থানে স্থানে ছাউনী পড়িল, চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী সিপাহীর পাহারা বসিল; আড্ডায় আড্ডায় সেনা-নিবাস সংস্থাপিত হইল। উদ্দেশ্য চিতু-সর্দ্দারের গড় আক্রমণ এবং অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধন। চিতুসর্দ্দার ও দফাদার আমীর আলীকে কারারুদ্ধ না করিতে পারিলে ঠগীদমন অসম্ভব, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সে জন্য যথারীতি গুপ্তানুসন্ধান চলিতে লাগিল। মেজর সাহেব শিবিরে বসিয়া মোহিতলালের সঙ্গে যে মন্ত্রণা করিতে ছিলেন, তাহার

কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখযোগ্য। মেজর সাহেব শ্বেতদ্বীপবাসী রাজপুরুষ আর মোহিতলাল কালা আদমী ; মেজর সাহেব উজ্জ্বল-দেবপ্রকৃতি-জেতা আর মোহিতলাল আঁধারের কীটাণু-জিত। আজ জেতা ও জিতের সমন্বয়-কর্ম্ম ও কর্ম্মীর দক্ষতা ও অভি-জ্ঞতার পরিচয় ! মেজর সাহেব কহিলেন ঃ—

রজনীযোগে সৈন্যগণকে ছাউনীতে রাখাই সঙ্গত। আমাদের শিবির সন্নিবেশের সংবাদ পাইয়া ঠগীগণ দুর্গম নিভৃত গিরি-শঙ্কটে লুক্কাইত হইলে শেষ তাহাদের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হইবে।

মোহিত—সেটী যাহাতে না হয়, তাহার বিধি ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ক্ষিপ্রানদীর কুলে কুলে পার্ব্বত্যপথে নওয়াগড়ের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত দলে দলে উপযুক্ত পাহারা বসান হইয়াছে ; কাহার গড় হইতে বহিরাগমন কি বাহির হইতে গড়ে প্রবেশের অধিকার বন্ধ করা হইয়াছে। কল্যাণীর ইচ্ছায় এবার আমাদের অভিষ্ঠ সিদ্ধ হইবে।

মেজর—কার্য্য সিদ্ধিই এ অভিসারের উদ্দেশ্য, পর্ব্বত বিহার আমাদের উপলক্ষ নহে।

মোহিত—সত্যপ্রণোদিত কর্ম্ম কুশল মহাপুরুষগণ একার্য্যে সর্ব্ব-তোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখা তাঁহাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যে কর্ম্মের মূলে ধর্ম্ম বাসনা—সাধনার পথ নিষ্কণ্টক করা, সে কর্ম্মের অবমাননা তাঁহাদের চক্ষে অসহ্য ! জীবের

কল্যাণ কামনাই তাঁহাদের কর্ম্ম—জীবহন্তার দমন তাঁহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করেন না ; সুতরাং ঠগীদমন কার্য্যে তাঁহাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণ আন্তরিক ও অকৃত্রিম।

মেজর—সাধু সন্ন্যাসীর বীরদর্প তীর্থধামে কিন্তু রণক্ষেত্রে নহে!

মোহিত—কর্ম্মক্ষেত্রে সে পরিচয় পাইতে বাকী নাই ; মহাপুরুষ-গণ ধর্ম্মভীরু বলিয়া কর্ম্মভীরু নহেন। মহাপুরুষগণ যোগাশ্রমে শান্তিপ্রিয় নিরীহ কিন্তু সাধনবিঘ্ন বিনাশন ক্ষেত্রে উগ্রচণ্ড ও ক্ষিপ্রহস্ত! সেদিন গিরিসঙ্কটে শোণিতপিপাসু পামর পীণ্ডারীগণের করাল কবল হইতে রসদ ভার ও রণ সম্ভার তাঁহাদের বাহুবলে সংরক্ষিত না হইলে উদয়গিরিতে আজ এই ব্রিটীশ পতাকা উড়িত কিনা সন্দেহ!

মেজর—সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ বটে কিন্তু সে ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না ; সাধু সন্ন্যাসীগণ নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় ; সুতরাং এহেন অশান্তিময় কষ্টকর কার্য্যোদ্ধারের জন্য সর্ব্বথা তাঁহাদের উপর নির্ভর করা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহারা নিরস্ত্র!

মোহিত—তাঁহারা জীবহত্যাকে ভয় করেন—সেটী করিতেও প্রস্তুত নহেন ; কিন্তু ঠগীগণকে বাহুবলে বা কৌশলে বন্দী করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যেখানে বিশ্বাস, সে ক্ষেত্রে সাধুগণ অগ্রণী ; আর যে ক্ষেত্রে তাহার অভাব সেখানে মহাপুরুষগণ কর্ম্ম কুণ্ঠ ও নিশ্চেষ্ট।

তাঁহারা জীব হিংসার নিবৃত্তি চাহেন—প্রাণী হত্যায় তাহাদের প্রবৃত্তি নাই। রণক্ষেত্রে তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিবেন না।

এবার মেজর সাহেব কিছু লজ্জিত হইলেন এবং সস্মিত বদনে কহিলেন, "কল্যাণ সম্প্রদায়ের কার্য্যকৌশল দৃষ্টে আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এখনও শেষ হয় নাই।"

মোহিত - এখনও অনেক বাকী আছে। অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত হওয়া অসম্ভব।

এতচ্ছ্রবণে মেজর সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন; তদীয় বিশ্বাস সে ব্রাহ্মণকন্যা পামরদের করালকরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে; সে বালিকা জীবিতা আছে শুনিয়া মেজর সাহেব বড় প্রফুল্ল হইলেন এবং কৌতুহলবশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লালজি, সে বালিকা কোথায় কি ভাবে আছে তাহার কোন সন্ধান পেয়েছ কি"?

মেজর সাহেব সংক্ষেপে সম্বোধনার্থ মোহিতলালকে সুধু লালজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দলবল মধ্যে তিনি লালজী নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

লালজী—পেয়েছি—নওয়াগড়ে চিতুর অন্তঃপুরে।

মেজর—তবে নওয়াগড় আক্রমণ ভিন্ন সে কন্যার উদ্ধার সাধন অসম্ভব!

লালজী—উপস্থিত তাহারই বন্দোবস্ত হইতেছে!

মেজর—চিতুসর্দ্দার বন্দী না হইলে গড়াধিকার দুরাশা মাত্র।

লালজী—এ যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্য দুটী ১ম—ঠগী দলপতি চিতু-
সর্দ্দার ও দফাদার আমীর আলীকে বন্দী করা—২য়
সেই অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধন!

এবার মেজর সাহেব হাসিভরা মুখে ধূম্র উদ্‌গীরণ করিতে করিতে কহিলেন—"লালজি মন্ত্রের সাধন হইলে তোমার পদোন্নতি নিশ্চয়"।

মেজর সাহেব চুরুট ফুকিতে ফুকিতে সতৃষ্ণ নয়নে সম্মুখে সুসজ্জিত পানীয় পদার্থের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; সে সাঙ্কেতিক দৃষ্টির অর্থজ্ঞ প্রভুভক্ত ভৃত্য অগোণে সাহেব বাহাদুরের অব্যক্ত বাসনা পূর্ণ করিল; অবসর বুঝিয়া লালজী কহিলেন "সুদীর্ঘ দুর্গম পার্ব্বত্যপথ পর্য্যটনে মহাশয় বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছেন, এখন বিশ্রাম করা আবশ্যক।

মেজর—হাঁ—রাত্রিও অধিক হইয়াছে; ভাল তাই—কার্য্য সিদ্ধি
হইলে বিশ্রামের অবসর যথেষ্ট পাইব।

লালজী আর সে কথার উত্তর না দিয়া যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় হইলেন।

সপ্তদশ কল্প।

ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে ভারতে রেলবর্ত্ত প্রায় অজ্ঞাত ছিল; সেকালে পথিকগণকে দল বাঁধিয়া পথ চলিতে হইত! বনপথে একাকী চলিবার উপায় ছিল না। হিংস্র জন্তু অপেক্ষা ঠগীর ভয়েই লোক অস্থির ছিল। তাহাদের অত্যাচারে গৃহস্থের ঘরের বাহির হওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। লোকের ধন প্রাণ রক্ষার্থ জঙ্গল প্রদেশে স্থানে স্থানে চৌকি বসিল; দিবারাত্রি সশস্ত্র দিগোয়ারগণ পাহারা দিতে লাগিল তথাপি ঠগীর হাতে পথিকের প্রাণ বাঁচান ভার হইল। কে পথিক কে ঠগী চেনা দায়; ঠগীগণ পথিকদলে মিশিয়া পথিক হইত আর সুযোগ পাইলেই স্বকার্য্য সাধন করিত। বেশ পরিবর্ত্তন বা ছদ্মবেশ ধারণ ঠগীগণের অভ্যস্ত বিদ্যা; সুতরাং পাহারাদারদের চক্ষে ধূলি দিয়া যথেচ্ছা চলিয়া যাইত। এতদঞ্চলে এখনও গিরিসঙ্কটে নিবিড় বন প্রদেশে পথিপার্শ্বে চৌকীদারী আড্ডা আছে। চৌকীদার দিগোয়ার নামে অভিহিত। আজ পর্য্যন্তও জমীদারগণকে দিগোয়ারী কর বহন করিতে হয়।

মধ্যভারতবর্ষ ও নাগপুর পর্ব্বত প্রধান প্রদেশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মালা অনুন্নত চূড়ায় চূড়ায় মিশিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। শিখরদেশে শ্যামলতরুরাজি মাথায় মাথায় মিশিয়া গিরিমালার অনুকরণ করিতেছে; কোথাও বা বেগবতী প্রবাহিনী পর্ব্বত ছাড়িয়া সগর্ব্বে সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পথিকের ত্রাশ বৃদ্ধি করিতেছে; প্রত্যুতঃ বর্ষারম্ভে পার্ব্বত্য

প্রবাহের প্রবলতা অতি ভীষণ! আর এই ভীষণ প্রাবৃটধারাই পীণ্ডারীর অভিষ্ট সিদ্ধির প্রশস্ত সময়। পীণ্ডারীগণ পার্ব্বত্য প্রবাহের প্রকৃতি জানিত, সাময়িক উত্থান ও পতন বুঝিতে পারিত; নদীর উত্থান মাত্র ঠগীগণ প্রবাহিনীর উভয় কূলে পথিকের আগমন প্রতীক্ষায় স্থানে স্থানে লুক্কাইত হইত এবং নিরীহ পথিকগণ উপস্থিত হইলে ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদের প্রাণবধ করিয়া সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ এবং মৃত দেহ তীব্র প্রবাহে নিক্ষেপ করিত। সে প্রবল প্রবাহে মৃত দেহ কোথায় ভাসিয়া যাইত তাহার সন্ধান হইত না। এতদ্দেশে চলিতভাষায় ঠগীর নাম "আঙ্গোছামোড়ার দল" ইহার অর্থ এই যে ঠগীগণ পথিকের গলদেশে গামোছা মোড়াইয়া প্রাণান্ত করিত। ক্ষিপ্রা নাম্নী এক বেগবতী নির্ঝরিণী রূপসীর নিবিড় নিতম্বে রজত মেখলার ন্যায়—শত্রুহস্ত হইতে সুরক্ষিত রাজপুরীর পরীখার ন্যায় নওয়াগড়কে বেষ্টন করিয়াছিল; তাই ঠগীদলপতি চিতু-সর্দ্দারের ধ্রুব বিশ্বাস বিদেশী শত্রুর পক্ষে সেই নির্ঝরিণী অতিক্রম করিয়া নওয়াগড় আক্রমণ অসম্ভব। উদয়গিরি পর্য্যন্ত ইংরাজ ফৌজের আগমনবার্ত্তা পাইয়া চিতুসর্দ্দার বিশেষ উদ্বিগ্ন না হইলেও আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সঙ্কেত বর্ত্তের দৃঢ় সংস্কার চলিল, ক্ষিপ্রার তীরে তীরে গিরি গহ্বরে প্রহরী বসিল; দফাদার আমীর আলীর উপর গড় রক্ষার ভার অর্পিত হইল।

ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল; ক্রমে সপ্তম বর্ষীয়া তারা পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম

করিয়া আনন্দময়ী প্রতিমারূপে চিতুসর্দ্দারের শান্তি দায়িনী হইয়া দাঁড়াইল। রমা ও অনুপমার আদরে ও স্নেহাতিশয্যে তারা সকলের দুঃখহরা তারা হইয়া বনদেবীরূপে নওয়াগড় উজ্জল করিল। ফুলকুমারী ও ফুলেশ্বরী সমবয়স্কা বাল্যসখী; কাল-মাহাত্ম্যে ততোধিক সংসর্গগুণে তারা করোঞ্চার বাল্যলীলা সমস্ত ভুলিয়া গেল; ভোলে নাই কেবল সেই শ্রুতিমধুর হৃদয়োন্মত্তকর গান—"হরি আমায় কর কোলে"। ফুলকুমারী ও ফুলেশ্বরী সে গান শিখিল; যখন সখীত্রয় সমস্বরে সে গান ধরিত, রমা ও অনুপমা মনে করিত শ্মশানে স্বর্গের প্রবাহ ছুটিয়াছে। তারা বড় ফুল প্রিয়; রজতকাঞ্চন ফেলিয়া ফুল আভরণে তারার বড় সাধ; ফুলসাজে তারাকে বনবালার ন্যায় দেখাইত; সে মনোমোহিনীরূপ দেখিয়া রমা ও অনুপমা আহ্লাদে গলিয়া যাইত আর সোহাগ করিয়া ডাকিত 'ফুলেলা।'

সখীদ্বয়ের মধ্যে ফুলকুমারী বুদ্ধিমতী ও শান্তপ্রকৃতি; কিন্তু ফুলেশ্বরী চতুরা, চঞ্চলা ও আমোদ প্রিয়া। একদা কথা প্রসঙ্গে তারা জানিতে পারিল পীণ্ডারীগণ নরহিংস্র দস্যু, আর চিতুসর্দ্দার সেই দস্যুদলের নেতা; তাই তিনি বড় একটা গড়ে থাকেন না। এ সংবাদে তারার প্রাণে আঘাত লাগিল, সর্দ্দারের দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তারা আব্দার ধরিল, "সর্দ্দারজী গড়ে না থাকিলে তাহার সুনিদ্রা হয় না; সে স্বপ্নে কত প্রকার বিভীষিকা দেখে ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে" ইত্যাদি। ক্রমে সে কথা চিতুর কাণে উঠিল; তারার মায়ায় ঠেকিয়া সর্দ্দার আর

অভিসারে যাইতে প্রস্তুত নহেন; তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে—বিশেষতঃ ইংরাজ ফৌজের দৃষ্টিপথ হইতে ঠগীগণকে দূরে দূরে রাখিবার জন্য সময় সময় মুণ্ডলশৈলশিখরস্থ গুপ্ত ভবনে বাধ্য হইয়া যাইতে হইত। আপাততঃ অধিকাংশ সময়ই নওয়াগড়ে থাকেন। চিতু সর্দ্দারের অর্থের অনাটন নাই, পৈতৃক সম্পত্তির আয়ও কম নহে; প্রকৃষ্টরূপ সংসারের ব্যয়ভার সঙ্কুলন হইয়াও বৎসরান্তে বিস্তর জমা হইত: সংসার খরচের হিসাবে নৃমুণ্ড-মালিনী অসিতবরণী শ্যামা মায়ের নিত্যসেবা ও অন্নচ্ছত্রে কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থায় প্রচুর ব্যয় করিতেন। এতদ্ভিন্ন গুপ্তভাণ্ডারে অতুল রত্নরাজি সংরক্ষিত; তাহার কপর্দ্দকও সংসার খাতে ব্যয়িত হয় না। চিতুর অর্থ যথেষ্ট আছে কিন্তু অর্থের বিকার নাই; দীন দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে তিনি মুক্তহস্ত। পর্ব্বোপলক্ষে দরিদ্রগণকে আশাতীত দান করিয়া থাকেন, রাজকর ব্যতীত বৎসর বৎসর ভন্সলা রাজকে যথেষ্ট সেলামী দিয়া থাকেন এবং রাজ সরকারের প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন; অর্থবলে সাধারণের নিকট চিতু সর্দ্দারের সমধিক আদর, রাজ দরবারেও সম্মান যথেষ্ট! সুতরাং দেশ মধ্যে চিতু প্রায় নিঃশত্রু। কিন্তু পাপের প্রতিফল অবশ্যম্ভাবী!

চিতুর একান্ত ইচ্ছা বিশিষ্ট উচ্চ বংশে তারার বিবাহ দিয়া সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করেন; সে সঙ্কল্প সাধু হইলেও যেন ভগবান তাহার সহায় হইলেন না। অনেক বড় ঘরে বিবাহের প্রস্তাব হইল কিন্তু কোনটিই যেন রমা বা অনুপমার

মনে ধরিল না। কাহারও জানিতে বাকী ছিল না যে তারা ব্রাহ্মণকন্যা—সর্দ্দারের পালীতা মাত্র; সুতরাং স্বকুলে তারার বিবাহ হয় ভগবানের বোধ হয় তাই ইচ্ছা। সর্দ্দারের ইচ্ছা ভন্‌সলা রাজবংশে তারাকে বিবাহ দেন এবং পাঁচলক্ষ পর্য্যন্ত কুলপণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ভন্‌সলা রাজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না সুতরাং স্বীয় পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে তিনি এক প্রকার স্বীকার করিয়াছিলেন। তবে ইংরাজ-ফৌজের আগমনে সে শুভকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারিল না। নওয়াগড়ের কোষাধ্যক্ষ শান্তশীল সর্দ্দারজীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে তারা ব্রাহ্মণকন্যা, অসবর্ণে বিবাহ হইলে তারা জাতিতে পতীতা হইবে; অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুর কুলাচার বিরুদ্ধ; সে বিবাহে তারার কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণেরই আশঙ্কা! এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া চিতু সর্দ্দার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন; রমা ও অনুপমা অসবর্ণ বিবাহে মত করিলেন না। অগত্যা তারার বিবাহ কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল।

বাল্যকাল হইতেই তারার দেব দেবীতে ভক্তি ও ধর্ম্মে আসক্তি ছিল; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রবৃত্তিও বলবতী হইতে লাগিল। নওয়াগড়ে নবপ্রতিষ্ঠিতা নৃমুণ্ডমালিনীর নিত্যসেবার ভার তারার উপর পড়িল; এতদ্ভিন্ন ভবানীপুরে ভবানীর প্রসাদ ও কল্যাণে কল্যাণীর নির্ম্মাল্য লাভ প্রায় নিত্য-কর্ম্ম! কল্যাণ-সম্প্রদায় সংসারত্যাগী যোগী ব্রহ্মচারী আর পরিচারীকাগণ ভৈরবী বেশে সাক্ষাৎ শান্তি! তাই স্থান-মাহাত্ম্যে তারা বসন ভুষণ প্রিয়া ছিল না; আনিতম্ব বিলম্বিত

নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তলদাম মৃদু মন্দ সমীরণে খেলিয়া বেড়াইত ; গৈরিক বসনে আর কুসুম ভূষণে ভৈরবী বেশে তারাকে বড় সুন্দর দেখাইত ; তারা ফুল প্রিয় বলিয়া ফুলাভরণে তাহার বড় সাধ ; তারার সে বেশ দেখিয়া রমা ও অনুপমার মনে হইত তারা প্রকৃতই শাপভ্রষ্টা দেবী !

একদা সন্ধ্যাসমাগমে তারা ফুলকুমারী ও ফুলেশ্বরীকে লইয়া মঞ্জুকুঞ্জে কুসুম চয়ন করিতে করিতে গাইতেছিল ঃ—

"হরি আমায় কর কোলে—
আমি কোলের কাঙ্গালিনী ডাকি হরি হরি ব'লে।"

ইত্যাদি।

সে গান থামিলে অদূরবর্ত্তী শিরীষতরুর অনুচ্চ শাখে বসিয়া একটী পাখী গাইল—

"হরি আমায় কর কোলে—
আমি সুখ জানি না দুখ বুঝিনা হরি নামে সব যাই ভুলে।"

পাখীর মুখে সে প্রিয় গানটী শুনিয়া তারা চমকিয়া উঠিল ;— সখীদ্বয় ততোধিক বিস্মিতা হইল ; তারা সোৎসুকে পাখীর প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া অঙ্গুলী সঙ্কেতে ডাকিল ঃ—

"আও পাখি হেথা—ত্যজি বনকোল,
দিব তোরে সোণার দোলা—শিখাইব হরি বোল।

তদুত্তরে পাখী আবার গাইল ঃ—

দোল্ দোলা দোল্ হয় না যেন ভুল,
হরি হরি ব'ল—সুমধুর বোল !

তারা আবার ডাকিল ঃ—

আয় পাখী আয় উড়ে, পুষ্‌ব তোরে যতন করে' ;
খেতে দিব দুধ কলা—শিখাইব হরি বলা !

শ্রীহরির কি ইচ্ছা ! বনের পাখী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উড়িয়া আসিয়া তারার বামবাহুতে বসিল ; আর চঞ্চুপুটে তারার করাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া যেন সস্নেহে স্বাগত জানাইল। এবার তারার অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, দেখিয়াই চিনিতে পারিল এ যে বাল্যকালের খেলার দোসর সাধের সে কাকাতুয়া। কাকাতুয়া কোথায় ছিল, কে তারে হরিনাম শিখাইল, এখানেই বা কেমনে আসিল ইত্যাদি বিষয়ক পূর্ব্ব স্মৃতি সম্যক ফিরিয়া আসিল না কিন্তু মনে একটা বিষম খট্‌কা বাজিল ; তারা অতৃপ্ত লোচনে কাকাতুয়াকে দেখিতে ও আদরে পাখীর সর্ব্বাঙ্গে হস্ত মার্জ্জনা করিতে লাগিল। বহুকাল পর বাল্যসখী সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার সোহাগ পাইয়া কাকাতুয়া আহ্লাদে গাইল ঃ—

"দোল্ দোলা দোল,—হয় না যেন ভুল—
হরি হরি ব'ল সুমধুর বোল"।

তারা কহিল গাও সবে "হরি আমায় কর কোলে"। তখন সান্ধ্য সমীরণে কণ্ঠ মিলাইয়া তিন জনে গাইল ঃ—

"হরি আমায় কর কোলে ;
আমি কোলের কাঙ্গালিনী ডাকি হরি হরি বলে'।"
ইত্যাদি

তাহাদের সঙ্গে কাকাতুয়াও গাইল—

"হরি আমায় কর কোলে"

এতকাল পর শিশুবেলার সাধের কাকাতুয়া আবার তারার সঙ্গিনী হইল; তদ্দৃষ্টে ফুলকুমারী ও ফুলেশ্বরী ভাবিল তারা প্রকৃতই বনদেবী,—বনের পাখীও তাহার সহচরী।

সন্ধ্যান্তে তারা সখিদ্বয়সহ গড়ে প্রত্যাগত হইয়া সর্ব্বাগ্রে রমা ও অনুপমার কক্ষে প্রবেশ করিল: কাকাতুয়া তারার বামকরে বসিয়া ইতস্ততঃ কি খুঁজিতেছিল: সম্ভবত আগন্তুকদ্বয়কে মঙ্গলা ও বিন্দুজ্ঞানে কাকাতুয়া বলিয়া উঠিল—

"দোল্ দোলা দোল, হয়না যেন ভুল
হরি হরি বল—সুমধুর বোল।"

তারার মুখে "হরি আমায় কর কোলে" গান শুনিয়া রমার প্রাণে হরিভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল;—রমা মনে মনে শ্রীহরিকে ডাকিলে তাহার শোক-সন্তপ্ত প্রাণে কি এক অননুভূত-পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত। সন্তান-শোকাতুর কাতর হৃদয়ে কি এক অচিন্ত্য প্রাণ-জুড়ান প্রেমছায়া পড়িত; সহসা পাখীর মুখে হরিনাম শুনিয়া রমার আজ চোখ ফুটিল; সঙ্গে সঙ্গে যেন একটুকু জ্ঞানের সঞ্চার হইল। অনুপমা একটুকু মুখরা ও রসিকা। সেটা বয়সের ধর্ম্মে। কাকাতুয়ার মুখে হরিনাম শুনিয়া অনুপমার প্রাণে কি এক নূতন ভাবের উদয় হইল; আহ্লাদ করিয়া ফুলেশ্বরীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন:—

বনের পাখী বলে হরি—
কি বলিস্ তুই ফুলেশ্বরি!

ফুলেশ্বরী তেমনই সরসভাবে উত্তর করিল:—

"ফুলেশ্বরী তোলে ফুল—তারা চায় হরির কোল;

বনের পাখী বলে হরি— কে বুঝিবে এ চাতুরী”
বুঝি পাখী তারার চেলা—সব যেন মায়ার খেলা।

ফুলকুমারী ----আমি মনে ভাবি আন—পাখী নয়—দূত জ্ঞান ;
লইতে তারার খোঁজ—পাঠাইলেন চতুর্ভুজ।
নিশার স্বপন প্রায় -বুঝি মায়া কেটে যায় ;
সকলি তারার খেলা—পাখী শিখেছে হরিবলা।

একদিন তারার মুখে রমা যে পাখীর কথা শুনিয়াছিল, যে পাখীকে তারা হরিনাম শিখাইয়াছিল, এই পাখীর মুখে হরিনাম শুনিয়া রমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে এই সেই হরিবলা বনপাখী কাকাতুয়া। রমা আরও ভাবিল ফুলকুমারীর অনুমান সত্য, হয় ত দূতী হ'য়ে তারার খোঁজে এখানে আসিয়াছে। এও কল্যাণীর ইচ্ছা। সাবধানে মনোভাব গোপন করিয়া রমা কহিলেন—

এ চতুরের চতুরালী—কে বোঝে বিনে বনমালী !
ফুরাইবে আশা—সন্তানের খেলা—ভেঙ্গে যাবে মোহ
জীবনের মেলা।

ইত্যবসরে কাকাতুয়া আবার বলিয়া উঠিল—

“দোল্ দোলা দোল্—হয়না যেন ভুল—
হরি হরি বল—সুমধুর বোল।”

কাকাতুয়ার মুখে হরিনাম শুনিয়া ধীরে ধীরে যেন তারার মনে লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে লাগিল ; একখানি ক্ষুদ্র কুটির আর সেই কুটীরাঙ্গনে বাল্যকালের সাধের খেলা—মায়ের কোলে হরিবলা ইত্যাদি কথা যেন একটী একটী করিয়া তারার হৃদয়ে অস্পষ্টভাবে জাগিতে লাগিল।

অষ্টাদশ কল্প।

বিন্দু সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীযোগে করোঙ্গার ক্ষুদ্র কুটীর পরিত্যাগ করিয়া পাগলিনীর ন্যায় একাকিনী ভীষণ বনপথে চলিতে লাগিলেন। দিক্‌শূন্য লক্ষ্যবিহীন হইয়া অনবরত গোদাবরীর তীরে তীরে পার্ব্বত্যপথে চলিতে লাগিলেন। স্বামীজী গোসাঞীকে বলিয়াছিলেন—"পুনঃ সাক্ষাতের সম্ভাবনা কল্যাণে কল্যাণীর মন্দিরে।" বিন্দু সেই আদেশবাণী সম্বল করিয়া জীবের কল্যাণকারিণী কল্যাণীর পদকমলে আত্মসমর্পণ করিয়া অকুল পাথারে ঝাঁপ দিলেন।

সেই গৃহত্যাগের পর অর্দ্ধযুগ গত হইল তথাপি বিন্দুর গন্তব্য পথ ফুরাইল না। দিন দিন পীণ্ডারীর অত্যাচার যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বনপথে পথিকের যাতায়াত বিরল হইল। হিংস্র বন্যজন্তুতে বিন্দুর ভয় নাই কিন্তু বিন্দুর ভয় পীণ্ডারীর হস্তে। যামিনীযোগে পীণ্ডারীর অভিসার তখন তত প্রবল ছিল না জানিয়া দিবাভাগে বিন্দু পর্ব্বতকন্দরে অথবা অসূর্য্যম্পশ্য নিবিড় প্রান্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া নিশাকালে পথ চলিতেন। পর্ব্বত-প্রবাহে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, আকাশচ্যুত লক্ষ্যভ্রষ্ট তারকার ন্যায় কোথায় চলিয়াছেন অনিশ্চিত। এক এক করিয়া প্রায় ষষ্ঠবর্ষ বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে কাটিল, কিন্তু বিন্দুর অদৃষ্টে কল্যাণলাভ হইল না।

ঠগীদমন উপলক্ষে পার্ব্বত্যপথের স্থানে স্থানে পাহারা বসিয়াছে। সাধুসন্ন্যাসীপ্রমুখ ইংরাজ ফৌজদল বিভিন্ন দলে

বিভক্ত হইয়া বিভিন্নপথে গিরিসঙ্কটে বন হইতে বনান্তরে যমকিঙ্করের ন্যায় নিয়ত ফিরিতেছে। সময়ে সময়ে ইংরাজ-ফৌজের সঙ্গে ঠগীগণের খণ্ডপ্রলয় ঘটিতেছে। পীণ্ডারীগণ দুর্দ্দম্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও দুঃসাহসী ; উভয় পক্ষের সংঘর্ষণে উভয় পক্ষকেই নিপীড়িত হইতে হইল। আত্মরক্ষণাক্ষম পীণ্ডারীগণ ফৌজের হস্তে বাধা পড়িতে লাগিল। একদা এহেন সম্মুখ সমরে সামান্য সংখ্যক ইংরাজ ফৌজকে একদল বলিষ্ঠ ঠগীর হস্তে বড়ই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইতে হইল। এই ফৌজদলের অগ্রণী কল্যাণ সম্প্রদায়ের শিরোমণি স্বয়ং স্বামীজী। স্বামীজীর উপর পীণ্ডারীগণের জাতক্রোধ ; তাঁহারই প্ররোচনায় কল্যাণ সম্প্রদায় ইংরাজফৌজের পৃষ্ঠপোষক, পীণ্ডারীকুলের সর্ব্বনাশে উদ্যত। পামরগণ প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া এ সংগ্রামে মাহীআঘাতে স্বামীজীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া গোদাবরীর প্রবল প্রবাহোদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। সৌভাগ্যবশতঃ সে বিক্ষত দেহ নদীগর্ভস্থ হইল না। তীরতরুতে বাধা পাইয়া সৈকতভূমে পতিত হইল। পলায়ন-তৎপর দলবর্ত্তীগণ তৎপূর্ব্বেই পৃষ্টভঙ্গ দিয়াছিল। কেহই মহাপুরুষের তাদৃশী লাঞ্ছনার বিষয় জানিতে পারিল না।

সূর্য্যাস্তের পর নিবিড় নীরব বনপ্রদেশে অন্ধকার এত দুর্ভেদ্য যে হস্ত প্রসারণ করিলে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না ; সে হেন সঙ্কটময় সময়ে ঘোর অন্ধকারে জনৈকা যোগিনী সে বনপথে চলিতে ছিলেন ; চলিতে চলিতে এক উপলখণ্ডে আঘাত পাইয়া পড়িয়া গেলেন। সুদৃঢ়

প্রস্তরোপরি পতিত হইলে হয় ত যোগিনীর অস্থিপঞ্জর বিচূর্ণ হইয়া যাইত, যোগলীলা সেখানেই শেষ হইত; কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ তাহা হইল না। যোগিনী এক অকঠিন পদার্থের উপর পতিতা হওয়াতেই তাঁহার আঘাত গুরুতর হয় নাই। রমণী সে পদার্থ পরীক্ষা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বুঝিতে পারিলেন সেটী মৃত দেহ; তৎক্ষণাৎ মৃত দেহ হইতে একটু দূরে সরিয়া বসিলেন; ক্ষণকাল পর অতি ক্ষীণকণ্ঠে কাতরোক্তি ও দীর্ঘশ্বাস উপলব্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইলেন; কিন্তু ভীতা হইলেন না। যোগিনী সাবধানে চক্‌মকিতে লৌহ শলাকা ঠুকিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিলে সে সৈকতভূমি আলোকিত হইল। সে আলোকে লজ্জা পাইয়া আঁধার যেন গোদাবরীর গর্ভে প্রস্থান করিল। যোগিনী আগ্রহসহকারে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও জীবন্ত জীবের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত মৃতদেহের নিকটে গেলেন; তদীয় মুখাকৃতি ও অর্দ্ধোন্মুক্ত কাতর দৃষ্টি বলিয়া দিল এ মৃত নহে, মৃতকল্প সাধুপুরুষ। রমণীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইহা নৃশংস ঠগীর কার্য্য। সে দৃশ্যে যোগিনীর প্রাণে আঘাত লাগিল; সংসারে যাহার কেহ নাই, পরের জন্য কাঁদিয়াও তাহার সুখ; আপন বলিতে যাহার কেহ নাই, সে বনের পশু পক্ষীকে আপন বলিয়া কোল দিতে চায়। সংসারের সুখে বঞ্চিতা হইয়া আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যে গৃহত্যাগী, পরের সুখ খুঁজিয়া—আর্ত্তের সেবা করিয়া তাহার আনন্দ হয়। যোগিনী সে সাধুপুরুষকে তদবস্থ দেখিয়া কায়মনোবাক্যে—অতি আগ্রহ-

সহকারে তদীয় সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে মঙ্গলময় কর সংস্পর্শে ও শুশ্রূষা কৌশলে—শুষ্ককণ্ঠে জলদানে সে জীবহীন দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল; লুপ্তসংজ্ঞা জাগিয়া উঠিল; সজ্ঞানে সরল দৃষ্টিতে পার্শ্ববর্ত্তীনীর দিকে চাহিয়া অতি কষ্টে কহিলেন;—'জল'। রমণী আবার জল দিলেন; সে জল পানে শরীরের গ্লানি অনেক কমিয়া গেল; দেহে একটু বল আসিল; সাধুপুরুষ আবার রমণীর দিকে তাকাইলেন, সে দৃষ্টি কৌতুহলময়ী; মনে মনে ভাবিলেন এহেন নিভৃত স্থানে এ সময়ে এহেন সুহৃদ সমাগমও কল্যাণীর ইচ্ছা-মায়াময়ীর মায়ার খেলা। আহত ব্যক্তি সাবধানে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া কটীবন্ধ হইতে একটী ঔষধ লইয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপন ও কিঞ্চিৎ সেবন করিলেন। কিন্তু তখনও ভাল করিয়া কথা বলিবার শক্তি হয় নাই। এভাবে কিছুকাল কাটিল। উভয়ে নীরব, সৈকত দেশ ঘোর নিস্তব্ধ। যোগিনী সুকোমল করে আহতের হস্ত পদে হস্তমার্জ্জনা করিতেছেন, কখন বা ক্ষতমুখে বিগলিত শোণিতধারা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া দিতেছেন। আঘাত গুরুতর—দেহ ক্ষতবিক্ষত; সহজে রক্ত থামিতেছে না। আহত ব্যক্তি আবার ক্ষতস্থানে ঔষধ মর্দ্দন করাতে শোণিতস্রাব বন্ধ হইল। ঔষধ সেবনজন্য জল চাহিলেন, যোগিনী জলপূর্ণ কমণ্ডলু তদীয় সম্মুখে রাখিলেন; সাধুপুরুষ কি একটি ঔষধ জলের সঙ্গে মিশাইয়া সে জল পান করিলেন। সে সৈকতভূমির অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী হইতে যোগিনী কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া আবার জল আনিলেন। এবারও আহত ব্যক্তি এক নিশ্বাসে

কমণ্ডলু শূন্য করিলেন। রমণী আবারও জল আনিতে গেলেন; যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সে আহত পুরুষ উঠিয়া বসিয়াছেন। সাধুপুরুষের প্রশান্তমূর্ত্তি, আবক্ষ চুম্বিত দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুজাল ও চন্দন চর্চ্চিত সুদৃঢ় দেহ দৃষ্টে যোগিনী ধ্রুব বুঝিতে পারিলেন এ কোন মহাপুরুষ হইবেন। দৈহিক অবস্থা দেখিয়া বয়সের অনুমান করা রমণীর পক্ষে সহজ হইল না। শুষ্ক শাল তরুর ন্যায় সে দেহ শীর্ণ; মস্তকের কেশ জটামণ্ডিত; অক্ষিদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট কিন্তু দৃষ্টি সতেজ ও সরল; দেখিলেই মনে হয় সে দেহে জীবাত্মার প্রবল প্রতাপ তখনও রহিয়াছে।

সৈকতভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সাধুপুরুষ মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন—"সত্য বল মা, তুমি কে? ভৈরবীবেশে তুমি মানবী না এই বনের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী?

ভৈরবী—আমার আত্মপরিচয় দেওয়ার কিছু নাই। আমি দানবী নহি—সামান্যা মানবী মাত্র। সৃষ্টির নিকৃষ্ট প্রাণী — আঁধারের কীটানু—আঁধারই আমার সম্বল!

সাধু—বুঝিলাম তুমি যোগিনী, আমার মা; মা,—মা কি সন্তানকে ত্যাগ করে?

ভৈরবী—মা সন্তানকে ত্যাগ করে কি না জানি না কিন্তু সন্তান মাকে ত্যাগ করে দেখিয়াছি।

একথা বলিতে বলিতে ভৈরবীর চক্ষে জল আসিল; সাধু পুরুষ তাহা দেখিলেন; মনে মনে ভাবিলেন যোগিনী সন্তান-বিরহিনী; প্রকাশ্যে কহিলেন—মা, সন্তান কু, অকৃতজ্ঞ ও নির্ম্মম হয়; মা ত স্নেহময়ী, সন্তান-বৎসলা। কিন্তু আমার মা যে

সন্তানের দুঃখ বুঝেন না। মা মা বলিয়া এত যে ডাকি, এত যে কাঁদি, কই মা ত দেখা দেন না!

যোগিনী বুঝিলেন এ কোন্ মায়ের কথা।

উত্তরে কহিলেন—সন্তান ত্যজিয়া মায়ের কৈলাসেও শান্তি নাই! বাসনাশূন্য হইয়া কায়মনোবাক্যে ডাকিতে পারিলে মা অবশ্যই আসিবেন। ভক্তের হৃদয়মন্দিরে মায়ের প্রাণ বাঁধা।

সাধু—কে বলে মা তুমি আঁধারের কীট? তুমি আলোকময়ী সাক্ষাৎ শক্তি—জ্ঞানস্বরূপিনী—ভগবতী! মা সত্য বল তোমার এ বয়সে এ শিক্ষা কোথায় হইল!

ভৈরবী—আমি শক্তি নহি—ভগবতীও নহি; পতিতা সামান্যা রমণী। আমি উন্মাদিনী, আমাকে ঐ বলিয়াই ডাকিবেন। আপনি কে—এ অবস্থা কেন?—জানিতে বাসনা।

সাধু—এ নিরাপদ স্থান নহে—আমার ন্যায় তোমার অনেক সন্তান আছে; হয়ত তাহারা আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পাষণ্ড পীণ্ডারীর হস্তে আমার এ লাঞ্ছনা!

ভৈরবী—ঠগীগণ ধনলোলুপ দস্যু। সাধুপুরুষকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য বোধ হয় গুরুতর!

এত কথা বলিয়া সাধুপুরুষ ক্লান্ত ও শুষ্ককণ্ঠ হইলেন; আবার জল চাহিলেন; ইতিপূর্ব্বে সংগৃহীত জলপূর্ণ কমণ্ডলু ভৈরবী সম্মুখে রাখিলেন। সাধুপুরুষ পুনরায় জলযোগে ঔষধ

সেবন করিলেন ও সর্ব্বাঙ্গে লাগাইলেন। ২৷৩ বার ঔষধ প্রয়োগে ক্ষত জনিত গ্লানি দূর হইল; শরীর সুস্থ ও সবল হইল; প্রাণে শান্তি পাইয়া সাধুপুরুষ কহিলেন—ঠগী দমনার্থ ইংরাজের ফৌজ সর্ব্বত্র ফিরিতেছে; এ কার্য্যে আমাদেরও সহানুভূতি আছে। ঠগীকুল নির্ম্মূল না হইলে সাধক সম্প্রদায়ের সাধনার পথ নিষ্কণ্টক নহে। ঠগীর অত্যাচারে দেশ যায় যায় হইয়াছে। অনেক যোগী সন্ন্যাসীকে যোগাশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনঃ সংসারী হইতে হইয়াছে!

ভৈরবী—ইংরাজের ফৌজ কোথায় থাকে?

সাধু—উদয়গিরি—ছাউনীতে।

ভৈরবী—আর আপনাদের সাধনাশ্রম?

সাধু—কল্যাণে কল্যাণীর মন্দিরে; আমরা মায়ের সাধক—মায়ের সাধনাই আমাদের আনন্দ!

ভৈরবী—সাধক সম্প্রদায় কত?

সাধু—সংখ্যা বলিবার আদেশ নাই; সাধক ও সাধিকা মাত্রই সে সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারেন।

ভৈরবী—উদয়গিরি হইতে কল্যাণ কতদূর?

সাধু—প্রচলিত পথে অনেকদূর কিন্তু সাঙ্কেতিক পার্ব্বত্য পথে পঞ্চক্রোশ মাত্র।

ভৈরবী—শেষোক্ত পথ ফৌজগণ অবগত আছেন?

সাধু—আমরাই সে পথ দেখাইয়াছি—কল্যাণের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতেছে।

ভৈরবী—আমিও উদয়গিরি যাইব।

সাধু পুরুষ সবিস্ময়ে কহিলেন কেন ?

ভৈরবী—ফৌজদলভুক্ত হইব।

সাধু—সে কি মা—তুমি যে যৌবনে যোগিনী !

ভৈরবী—এ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দণ্ডীবেশ ধরিব।

সাধু—পারিবে ?

ভৈরবী—মায়ের ইচ্ছায় কিনা হয় !

তাহা শুনিয়া সাধুপুরুষ নীরব রহিলেন। কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন—"তুমি মাকে দেখিবে" ?

ভৈরবী—আমি প্রথমে কল্যাণে যাইব, মায়ের নির্ম্মাল্য লইব। কার্ত্তিকী অমাবস্যায় নাকি সেখানে মায়ের মন্দিরে মেলা বসে ?

সাধু—এ কথা মা তোমাকে কে বলিল ?

ভৈরবী—স্বামীজীর মুখে শুনিয়াছি।

এ কথা শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন ; কৌতুহল পরবশ হইয়া কহিলেন "স্বামীজীর সাক্ষাৎ কোথায় পাইলে" ?

ভৈরবী—করোঞ্চায় গোসাঞী প্রেমানন্দের কুটীরে।

সাধুপুরুষ স্মিতবদনে কহিলেন, "মেলা বসিবে সত্য, কিন্তু সে মেলায় যোগদানের অধিকার সাধারণের থাকিবে না"।

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল সহসা সে পথে লোকাগমনের শব্দ শ্রুত হইল ; সাধুপুরুষ রমণীকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিলেন ; ক্ষীণালোক নির্ব্বাণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অভিনিবেশ সহকারে সে পদ শব্দ লক্ষ্য

করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল, ক্রমে অশ্বক্ষুরশব্দ শ্রুত হইল; আগতগণ পীণ্ডারী নহে জানিয়া সাধু পুরুষ সঙ্কেতধ্বনি করিলেন; আগন্তুকগণও তেমনি সাঙ্কেতিক উত্তর করিলে সাধু পুরুষ আনন্দধ্বনি করিলেন "কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে"। অভ্যাগতগণ সে স্বরে চিনিতে পারিলেন সঙ্কেতকারী স্বয়ং স্বামীজী। তাহারা এতক্ষণ তাঁহারই অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এ দলের অগ্রণী অশ্বারোহণে স্বয়ং মোহিত-লাল। স্বামীজী পুরবর্ত্তী হইয়া কহিলেন—"লালজি আনন্দ রহো"।

উঃ—ভবদীয় আশীর্ব্বাদে এ দাসের সদানন্দ।

"সেও মায়ের ইচ্ছা" বলিয়া স্বামীজী লালজীকে একটু সরিয়া আসিতে সঙ্কেত করিলেন। লালজী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্বামীজীর নিকটবর্ত্তী হইলে স্বামীজী ঠগীর হস্তে কঠোর লাঞ্ছনা, সৈকতভূমে পতন, আগন্তুক ভৈরবীর সহসা তত্রাগমন ও শুশ্রূষা প্রভৃতি আদ্যন্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। সে কথা শুনিয়া লালজীর প্রাণে বিষম বাজিল, ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল; বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন—"উঃ পীণ্ডারীর আস্পর্দ্ধা যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। স্বামীজীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত—যোগবীর সাধু পুরুষের রক্তপাত! এ দৃশ্য নিতান্তই অসহ্য! সমধিক শোণিতক্ষয়ে দেহ দুর্ব্বল হওয়ারই আশঙ্কা! অশ্বারোহণে মহাশয় অগ্রসর হউন।"

স্বামীজী—না—সেজন্য চিন্তা করিতে হবে না। এ দেহে বল এখনও যথেষ্ট আছে। ভৈরবী কল্যাণে যাইবেন;

তাঁহাকে সাবধানে নিয়ে যেতে হবে—কারণ এ
পার্ব্বত্য পথ বড় বন্ধুর।

লালজী বংশীধ্বনি করিলেন; সে শব্দে ফৌজদল উদয়গিরি অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। স্বামীজী ও ভৈরবী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সর্ব্ব পশ্চাতে লালজী অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া চলিলেন। নিয়ত দূরপথ পর্য্যটনে অশ্বটী নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল।

নিশাবসানের পূর্ব্বেই সকলে উদয়গিরিতে পৌঁছিলেন। বন্দী ঠগীগণ সহ মোহিতলাল শিবিরের দিকে ও স্বামীজী সাধক সম্প্রদায়সহ কল্যাণাভিমুখে চলিলেন। ভৈরবী ও স্বামীজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উদয়গিরি হইতে কিয়দ্দূর গেলে এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যপথ—চলিতে চলিতে সে পথও ফুরাইল; এ পথের স্থানীয় নাম ঘাট; ঘাট পার হইয়া দ্বিতীয় সঙ্কীর্ণ এক গিরিসঙ্কট নিবিড় তরুরাজি সমাচ্ছন্ন। সে পথ অতি দুর্গম ও দুরারোহ! তখনও তপনকর সে পথে পৌঁছিতে পারে নাই। সেই আঁধার পথে অতি সন্তর্পণে ভৈরবী স্বামীজীর অনুগমন করিতেছিলেন; পদে পদে ভৈরবীর পদস্খলন হইতে লাগিল; শেষ আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। সহসা এক গভীর গহ্বরে পতিতা হইলেন। স্বামীজী ভৈরবীর নিকটে ছিলেন, কিন্তু অন্যান্যেরা অনেকটা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল; সে পতনশব্দে অগ্রগামীগণ প্রশ্ন করিলেন "স্বামীজি কিসের শব্দ"?

উত্তর হইল—সর্ব্বনাশ! ভৈরবী গুহায় পড়িয়াছেন। তাহা শুনিয়া অগ্রগামীগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অতি সাবধানে গুহায় অবতরণ পূর্ব্বক ভৈরবীকে উদ্ধার করিলেন।

পতনজনিত আঘাত গুরুতর হইয়াছিল। উদ্ধারকারী সাধুগণ দেখিলেন ভৈরবী নিঃসংজ্ঞ, মৃতকল্প, কেবল ক্ষীণশ্বাস জীবনের প্রমাণ দিতেছিল। সন্তানকল্প কল্যাণ সম্প্রদায় ভৈরবীকে অতি যত্নে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। অনতিদূরে কল্যাণের পদবিধৌতা তাপ্তী তীব্রবেগে প্রবাহিতা। সকলে নদী সৈকতে পৌঁছিয়া সঙ্কেত করা মাত্র অপর পার হইতে একখানি নৌকা আসিয়া উপনীত হইল। কল্যাণ সম্প্রদায় তদারোহণে নদী পার হইয়া অজ্ঞাতকুলশীলা সংজ্ঞাবিরহিতা ভৈরবীসহ মায়ের মন্দিরে পৌঁছিলেন। ভৈরবীর শুশ্রূষার ভার জয়ার হস্তে ন্যস্ত হইল ; অন্যান্য সাধুগণ চলিয়া গেলেন, কেবল স্বামীজী মাত্র সেখানে রহিলেন ; গোসাঞী গৃহান্তরে ছিলেন, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। সে জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ মুখকান্তি তদুপরি ভৈরবী বেশ দেখিয়া গোসাঞী কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জয়া দৃষ্টিমাত্রেই চিনিতে পারিলেন, ভৈরবী কে। জয়া কহিল—"গোসাঞি এ ভৈরবী কে" ?

গোসাঞী—এখনও স্পষ্ট চিনিতে পারিতেছি না।

জয়া আর কোন কথা বলিলেন না ; স্বামীজী যথাযোগ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন ; জয়া ভৈরবীর শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন। গোসাঞীর মনে ঘোর সন্দেহ হইল, জয়াকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস হইল না ; সন্দিগ্ধচিত্তে গোসাঞীও নিজ কক্ষে চলিয়া গেলেন।

নাগপুর প্রদেশে কল্যাণ ঐতিহাসিক স্থান। এক সময় কল্যাণীর ইচ্ছায় কল্যাণ ভনুসলা রাজের রাজধানী ছিল।

ঊনবিংশ কল্প।

এ পীণ্ডারী বিভ্রাটের সময় ভন্‌সলা রাজের রাজধানী দেবঘরে ছিল। মহারাষ্ট্র কুলগর্ব্ব হুলকার সে সময়ে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক এবং ইংরাজরাজ তদীয় আসন্ন পক্ষ! আর বরদাধিপতিও রাজ্যের কল্যাণার্থে ঠগী দমন কল্পে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতে-ছিলেন। প্রকৃত এই তিন প্রদেশেই ঠগীগণ অতি দুর্দ্দান্ত ও দুর্ন্নিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রজাপুঞ্জের ধন প্রাণ পদে পদে বিপন্ন ততোধিক স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ গৃহবাস অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ঠগী দলপতি চিতুসর্দ্দার একজন ধনশালী জায়গীরদার। চিতুসর্দ্দারের অর্থের অনটন নাই; কিন্তু সে সময়ে ভন্‌সলা রাজের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না; প্রায়ই চিতুসর্দ্দারকে সে অভাব দূর করিতে হইত। প্রচুর পরিমাণে অর্থসাহায্য লাভ হয় বলিয়া রঘুজি ভন্‌সলা প্রকাশ্যে চিতুসর্দ্দারের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে প্রস্তুত নহেন। এ সংবাদ পাইয়া ভারতেশ্বর লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুর ভন্‌সলা রাজকে শাসাইতে-ছেন। চিতুসর্দ্দার ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ না করিলে এবং ঠগীগণের সন্ধান বলিয়া না দিলে ভন্‌সলা রাজ্যের নিস্তার নাই; রঘুজী-রাজের কল্যাণাকাঙ্ক্ষীগণ চিতুসর্দ্দারকে আত্মসমর্পণ করিতে উপদেশ দিলেন কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে চিতুসর্দ্দার সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। চিতুসর্দ্দার উত্তরে জানাইলেন— "ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিব সেও স্বীকার কিন্তু পীণ্ডারীর ধ্বংস আমা

হইতে হইবে না। ঠগীগণ মায়ের সন্তান, আত্মপ্রকাশ মায়ের নিষেধ।” অনন্যোপায় হইয়া রঘুজীকে ইংরাজের পক্ষ হইতে হইল; আর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া চিতুসর্দ্দারও আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শরতের অন্তে হেমন্তের আগমন; বঙ্গে বসন্তের ন্যায় এতদ্দেশে হেমন্তের শোভা অতি মনোহর। হেমন্তে শ্যামল দূর্ব্বাদল গজিয়া উঠে; শৈলশিরে নানাজাতীয় তরুরাজী নিবিড় পল্লবদামে বিভূষিত হয়; নয়নরঞ্জন বিবিধ বর্ণের কুসুমাভরণে বনস্থলী যোগীজনমনলোভা সুষমা ধারণ করে; যে সুখ-বসন্তসময়ে বঙ্গের বনলতা কুসুমিতা হয়, সে কালে এদেশে বনফুল ঝড়িয়া পড়ে; যে বসন্তাগমে বঙ্গের তরুরাজী কিশলয়-দলে মঞ্জুরিত হয়, গোচারণের মাঠে সরস শ্যামল শষ্পদল সজীবতা লাভ করে, সে কালে নাগপুরে বিটপীকুল নিষ্পল্লব হয়, শষ্পদল প্রখর তপন তাপে জ্বলিয়া যায়। বসন্তের প্রিয় পাখী কোকিল যখন সুমধুর কুহুরবে বঙ্গের বনবিতান বিলোড়িত করে, সে সময় মধ্যপ্রদেশে বায়সের কর্কশ স্বরও শ্রুতিগোচর হয় না। এদেশে সে সময়ে প্রত্যূষে তপনদেব অনল বর্ষণ করেন, প্রস্তরবর্ত্ম সমস্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ উত্তপ্ত হয়, এতদ্দেশে হৈমন্তিক শোভা বঙ্গের বসন্তকালের ন্যায় মনোহর। সে সুখ সময়ে কল্যাণে হৈমন্তিক পূজার ধুম পড়িয়া গেল। কার্ত্তিকী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে কল্যাণে কল্যাণীর পূজায় বিশেষ ঘটা হয়; সপ্তাহ পর্য্যন্ত মেলা থাকে; বিবিধ দ্রব্য সম্ভারসহ অসংখ্য বিপণী বসে। সে সময়ে সমস্ত রাটদেশে হুলস্থুল পড়িয়া যায়; মায়ের

পূজার্থ দলে দলে যাত্রীগণ সমাগত হয়; এবার আর ততটা জনতা হইল না; উদয়গিরিতে ছাউনীর ভয়ে কল্যাণে আসিতে অনেকেরই সাহস হইল না। অন্যান্য বৎসর সম্ভ্রান্ত রাটসর্দ্দারগণ সপরিবারে সমাগত হইয়া মায়ের পূজা দিয়া চরিতার্থ হইতেন, এবার আর সে সৌভাগ্য ঘটিল না। কিন্তু অনুশীলার ভক্তদল ও নওয়াগড় হইতে চিতুর পরিবারবর্গের কল্যাণে আসার কোন বাধা রহিল না। সাধক সম্প্রদায়ের অনুরোধে শ্রীমান মোহিতলালের অনুগ্রহে বিশিষ্ট ভক্তগণের উপস্থিতির জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

সর্ব্বসাধারণের বহুল জনতা মেজর সাহেবের নিষেধ। সুতরাং এবার দেওয়ালীতে কল্যাণে জাঁক সামান্য হইল; সামান্য সংখ্যক দীপমালা জ্বলিল; কিন্তু কাঙ্গাল সেবার ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ হইল। এবার সাধারণ যাত্রীদের সংখ্যা সমধিক না হইলেও সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা বিস্তর হইয়াছিল। উদ্দেশ্য—ঠগীদমনে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন। তখনও ঠগীকরে সাধুগণ আহত ও লাঞ্ছিত হইতেছিল।

ইংরাজের সমরোপকরণ ও রসদভার যখন গোদাবরীর তীরে তীরে উদয়গিরির দিকে আসিতেছিল, সে সমস্ত লুণ্ঠন মানসে ঠগীগণ রক্ষীগণকে আক্রমণ করিলে ৪ জন গোলন্দাজ ও দফাদার গুলী চালাইল। এতদ্ব্যতীত পদাতিকগণ রসদ রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিল। ক্ষিপ্র ও অব্যর্থ সন্ধানে অনেক ঠগী হত ও আহত হইল বটে কিন্তু ঠগীর সংখ্যা বহুতর বলিয়া সহজে তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিল না। একেবারে "কালীমায়ী কি জয়"

বলিয়া রসদভার ও গোলবারুদের বস্তাগুলি আত্মসাৎ করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করিল। তখন অনন্যোপায় ফৌজগণ আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল; ঠগীর মাহীর আঘাতে কেহ কেহ ধরাশায়ী হইল। বেগতিক বুঝিয়া দফাদার অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল, একজন বলিষ্ঠ ঠগী দফাদারের অনুসরণ করিল। কিছুকাল রক্ষীগণ অতিকষ্টে রসদভার রক্ষা করিল; ইত্যবসরে সাধুগণ প্রমুখ একদল ফৌজ আসিয়া সহসা ঠগীগণকে আক্রমণ করিল। ঠগীগণও সাধুগণের উপর অস্ত্র চালাইল। স্বামীজীর উপর প্রলয় বহিল। উভয় পক্ষে কিছু কাল তুমুল মল্ল যুদ্ধ হইল। সে সময় সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, বনদেশ ঘোর আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে; স্বামীজীর বাহুবলে বহু সংখ্যক ঠগী বন্দী হইল; ঠগীগণ রসদ ও রণউপকরণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন তৎপর হইলে স্বামীজী উহাদের অনুসরণ করিলেন—উদ্দেশ্য ঠগীদফাদার আমীর আলীকে বন্দী করা কিন্তু কার্য্যতঃ ফল বিপরীত হইল। আমীরআলী প্রমুখ ঠগীগণ স্বামীকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিল। স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল গোলন্দাজগণ অবশ্যই তাঁহার অনুগমন করিয়াছে; সাধু পুরুষগণ রসদ রক্ষণ ও ধৃত ঠগীগণের বন্ধন ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল, সুতরাং সে আঁধারে কেহই স্বামীজীর সে উদ্যম লক্ষ্য করিতে পারে নাই। নিরুপায় হইয়া স্বামীজী যতক্ষণ পারিলেন আত্মরক্ষা করিলেন, কিন্তু শেষ আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না। পামর পীণ্ডারীগণ জিঘাংসা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নির্দ্দয়ভাবে মহাপুরুষকে মাহী

আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া একেবারে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। সৌভাগ্যবশতঃ নিবিড় বিটপীকাণ্ডে বাধা পাইয়া সে দেহ নদীগর্ভস্থ না হইয়া সৈকতভূমে পতিত হইয়াছিল।

রসদভার ও গোলাবারুদ সহ রক্ষকগণ নিরাপদস্থানে পৌঁছার পর অন্যান্য সাধুগণের চৈতন্য হইল স্বামীজী হয়ত ঠগীগণের হস্তে ধৃত বা হত হইয়াছেন। সে সংবাদে মোহিত-লালের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—ঠগী দমনের আশা ফুরাইল। দফাদার ইতিপূর্ব্বেই সে স্থানে পৌঁছিয়া সংবাদ দিয়াছিল; রসদ রক্ষার্থ একদল ফৌজসহ স্বয়ং মোহিতলাল অশ্বারোহণে সেদিকেই আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে রসদ রক্ষীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তখন রসদ ও রণসম্ভার সম্পূর্ণ নিরাপদ জানিয়া যে স্থানে উভয় পক্ষে সংঘর্ষণ হইয়াছিল লালজী সেদিকে চলিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বেই তাহা উক্ত হইয়াছে। এই ঘটনার পরই ঠগীদলন চেষ্টা সাধুগণের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে দাঁড়াইল। দিন দিন সাধুগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশের কল্যাণে, গৃহস্থের ধন মান রক্ষণে ও সাধু সন্ন্যাসীগণের সাধন পথকে নিষ্কণ্টক করার মানসে সকলে বদ্ধ পরিকর হইল। জীবহিংসা মহাপাপ, সেটী না করিতে হয়, সেজন্য নিরস্ত্র সাধুগণ কেবল বাহুবলে ও কৌশলে পীণ্ডারীকুল নির্ম্মূল করিতে ফৌজদলভুক্ত হইলেন। কতিপয় সাধু ঠগীর করে নিহত হইল কিন্তু কোন সাধুই ঠগীর শোণিতে স্বীয় কর কলুষিত করিলেন না।

স্বামীজী কল্যাণে যে অজ্ঞাতকুলশীলা ভৈরবীকে আনিয়াছিলেন, তাহার পীড়া সাংঘাতিক—অবস্থা শোচনীয়। পতন জনিত আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মিয়াছে ; সময়ে চৈতন্য হয়—সময়ে লোপ পায়। চিকিৎসা, যত্ন বা শুশ্রূষার অভাব নাই ; অজ্ঞাতকুলশীলা অনাথিনী বলিয়া চেষ্টার ত্রুটী কিছুই নাই। রোগীর শুশ্রূষায় জয়ার আনন্দ, বিশেষতঃ এই ভৈরবীর জন্য জয়া আত্মকার্য্য ত্যাগ করিয়া মায়ের সেবা ছাড়িয়া অহোরাত্র আর্ত্তার সেবায় নিযুক্ত! স্বামীজীর নির্দ্দেশ ক্রমে জয়া যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য দেন, প্রদাহকালে ব্যজন করেন ; আর মধুসূদনের নাম করিয়া কাঁদেন। ভৈরবীর আগমনাবধিই জয়ার আহার নিদ্রা ত্যাগ —সাধনে বিরাগ—মায়ের পূজায়ও পূর্ব্ববৎ অনুরাগ নাই ; জয়া যে রোগীর শুশ্রূষায় আজ আত্মহারা সে কে? অন্তরীক্ষ হইতে কে যেন বলিয়া দিল—ভৈরবী জয়ার প্রিয় সখী—করোঞ্জার সেই মন্দভাগিনী বিন্দুবাসিনী। সুদীর্ঘকালপর ভৈরবীবেশে মৃতকল্পা সাধনার সঙ্গিনী বিন্দুকে পাইয়া হর্ষে বিষাদ! যে বিন্দুর ভগ্ন হৃদয়কে হরিপ্রেমসুধাসিক্ত করার জন্য এত কষ্ট করিয়াছেন, ক্ষণভঙ্গুর জীবনে শান্তির ছায়া ঢালিয়া যে ক্ষুদ্র প্রাণটাকে ভগবানের দিকে টানিয়া আনিতে এত চেষ্টা করিয়াছেন, যে বিন্দুর অদর্শন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইলেন, সহসা সে প্রিয় সখীর দর্শন লাভে যেমন আহ্লাদ,—বিন্দুর তাদৃশী সাংঘাতিক অবস্থা দৃষ্টে ততোধিক বিষাদ! জয়া কে? করোঞ্জার সেই

মঙ্গলাই কল্যাণে জয়া বা জয়মালা বলিয়া পরিচিতা। অতঃপরও মঙ্গলা জয়া বলিয়াই উল্লিখিত হইবেন। জয়া ভৈরবীকে স্বীয় কক্ষেই রাখিয়াছিলেন।

চিতুসর্দ্দারের পত্নীদ্বয় রমা ও অনুপমার সঙ্গে জয়ার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতেছে; জয়ার চিত্তশুদ্ধি, মায়ের পূজায় অনুরক্তি, পর সেবায় আসক্তি দেখিয়া রমা ও অনুপমা মনে করিয়াছিলেন জয়া মানবী বেশে দেবী; জয়ার অলোকসামান্য অমায়িকতা, সদাশয়তা ততোধিক তদীয় অকপট নিষ্কাম বাসনা ও যোগ সাধনা কল্যাণে সর্ব্বসাধারণের প্রীতিকর হইয়াছিল; কল্যাণে আসিয়া যে জয়ার মুখে দুটী হিতোপদেশ না শুনিল, তাহার দেবব্রত অসম্পূর্ণ রহিল। কাতর হৃদয়ে কল্যাণে আসিয়া যে জয়ার মুখে মধুর হাসি না দেখিল তাহার পথকষ্ট রহিয়া গেল,—মায়ের চরণামৃতেও সে ক্লান্তি দূর হইল না। জয়ার স্বভাব—একদিকে কর্ত্তব্য পালন—অন্যদিকে আত্মনির্ব্বিশেষে অতিথি-গণের সাদর সম্ভাষণ; এক করে ক্ষুৎ পিপাসাতুরকে অন্নজল বিতরণ—অপর করে সর্ব্বমঙ্গলার ন্যায় রোগ ও শোকের অপনয়ন; জয়ার এসকল গুণে কল্যাণ বিমুগ্ধ! সকলের বিশ্বাস কল্যাণ শান্তি নিকেতন—আর কল্যাণীর প্রসাদ দিয়া জয়া করেন শান্তি বিতরণ। রমা এবং অনুপমাও জয়ার সেই বিশ্বজনীন প্রেমে বিমুগ্ধ।

কার্ত্তিকী অমাবস্যা কল্যাণীর পূজার সুপ্রশস্ত দিন। সেদিন যে মায়ের পূজা দিতে না পারিল, সম্বৎসরে আর তাহার পূজার সাধ মিটিল না, মনের কালিমা দূর হইল না; মঙ্গল

পবিত্র প্রসাদে যেন মলিন হৃদয় নির্ম্মল হইল না। রমা ও অনুপমা কল্যাণীর ভক্ত সাধিকা; সুতরাং মায়ের পূজার্থ যথা-সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি মায়ের শ্রীপদকমলে রক্তোৎপলে অঞ্জলি প্রদান করিয়াও যেন চরিতার্থ হইতে পারিলেন না; মনে হইল সে পূজা যেন অসম্পূর্ণ, দেবদর্শন আবেশ-শূন্য—মাতৃ পূজায় যেন কি অভাব রহিয়া গেল; যেন আরও কি দেখিতে বাকী রহিল। মন্দিরে আসিয়া অবধি জয়ার দর্শন না পাইয়া রমা ও অনুপমা বিস্মিতা হইলেন: কল্যাণে আসার সাধ যেন মিটিল না। পূজান্তে মন্দির স্বামিনীর অনুমতি লইয়া জয়ার কুটীরে উপস্থিত হইলেন।

মন্দিরের পশ্চাতে নীরব নিভৃত প্রাঙ্গনে যোগিনীদের অবস্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গৃহ আছে। প্রত্যেক গৃহে ৪।৫টী করিয়া প্রকোষ্ঠ ও এক একটী প্রকোষ্ঠ এক এক যোগিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; মন্দিরে সাধিকাগণের ভৈরবীবেশ—সেজন্য তাহারা সাধারণতঃ যোগিনী বলিয়াই পরিচিতা: মায়ের সেবা আর যোগসাধনই তাঁহাদের জীবনব্রত। এ ব্রতে যাহারা ব্রতী, তাহারা সকলেই অসংসারী—বাসনা বিরাগী সর্ব্বত্যাগী। মন্দির স্বামী বা স্বামিনীর বিনানুমতিতে কাহার সে প্রাঙ্গনে পদক্ষেপ করার অধিকার নাই। সে অঙ্গনের দক্ষিণ দিকে একটী অপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ জয়ার গৃহ। সে কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া অনুপমা ডাকিল "জয়দি"? সে স্বর চিনিয়া জয়া উত্তর করিল "আজ জয় অনিশ্চয়—সব যেন স্বপ্নময়—আসিতে আজ্ঞা হয়" রমা ও অনুপমা বয়োকনিষ্ঠা বলিয়া জয়াকে দিদি

বলিয়া ডাকিত। রমণীদ্বয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া জয়াকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। "কুরুমা কল্যাণি কল্যাণ জীবে" বলিয়া জয়া সে অভিবাদনের উত্তর দিলেন। তদনন্তর রমা ও অনুপমা ভৈরবীর তাদৃশী শোচনীয় অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসু হইলে জয়া নদী সৈকতে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, পথে আসিতে আসিতে পদস্খলিত হইয়া গুহায় পতন ও অচেতনাবস্থায় মন্দিরে আনয়ন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। সে কথা শুনিতে শুনিতে রমা ও অনুপমা মৃতকল্পা ভৈরবীর আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন। দর্শন মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন, একদিন সে দেহে রূপলাবণ্যের অভাব ছিল না; এখনও সে শুষ্ক শীর্ণ বদনে পূর্ব্ব সুষমার আভাস পাওয়া যায়। সে দৃশ্যে রমা ও অনুপমার প্রাণে বিষম বাজিল; ততোধিক জয়ার নিঃস্বার্থ সেবা শুশ্রূষার কথা ভাবিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং প্রকাশ্যে কহিলেন—জয়াদিদি—সকল কার্য্যেই তুমি সিদ্ধহস্ত! অজ্ঞাত-কুলশীলা ভৈরবীর জন্য তুমি যাহা করিতেছ, মায়ের জন্যও সন্তান ততটা করে কি না সন্দেহ!

জয়া—অনাথা অনাশ্রিতা বলিয়াই দায়ীত্ব অধিক। স্বামীজীর অনুগ্রহে গহ্বর হইতে উদ্ধার না হইলে হয় ত আঁধারের কীটের ন্যায় সে গভীর আঁধারেই জীবলীলা সাঙ্গ হইত। সৌভাগ্যবলে তাহা যে হয় নাই ইহা মায়েরই ইচ্ছা!

সে কথা বলিতে বলিতে জয়ার চক্ষে জল আসিল; জয়ার চক্ষে জল দেখিয়া অনুপমার অশ্রুধারা বহিল; বাষ্পাকুল-লোচনে কাতর বচনে অনুপমা কহিলেন "দিদি, সর্ব্বত্যাগী

যোগী যাঁহার জন্য কাঁদে, সে না জানি কি তপঃসিদ্ধা মহাদেবী ! বল দিদি—এ তোমার কে" ?

জয়া—এ যে আমার কে বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু মনে হয় যেন কেহ ছিল—বলিয়া ভৈরবীর উপর সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন ; সে মুখখানি দেখিতে দেখিতে বলিলেন—কে বলিয়া দিবে—"এ আমার কে" ?

সকলে ক্ষণকাল নীরব ; সে কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভৈরবী বলিয়া উঠিল—"উঃ কি সুন্দর—কি প্রাণ মন মুগ্ধকর গান—সুমধুর হরিনাম ! কে জানি আমার ছিল-সে এখন নাই ! যে আমাকে গান শুনাইত—সে আর এখন গান শুনায় না। হরি ! হরি ! অই যে আকাশে কে গাইল—"হরি আমায় কর কোলে" ঐ যে গান আকাশ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে—এই দিকে আসিতেছে—আহা ! আসিতে আসিতে যেন অর্দ্ধপথে মিশাইয়া গেল—আর আসিল না—আর কেহ শুনিল না—সে মধুর গান। ওঃ—হরিনামে এত লাঞ্ছনা—মঙ্গলে, লও কেড়ে হরিনাম—চলে যাই অশিবধাম" বলিতে বলিতে বিকট হাসি—শুষ্ককণ্ঠে রুক্ষ হাসি ! উঃ—জল—আর যে বাঁচিনে। ত্রস্তহস্তে জয়া আর্ত্তার মুখে জল দিলেন, জল সেবনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইয়া ভৈরবী চক্ষু মুদিল ; বিকারপ্রলাপ থামিল ; তাদৃশী প্রলাপোক্তি শুনিয়া সকলে ভৈরবীর শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতেছিলেন, সে অবসরে কাকাতুয়া হস্তে তারা আসিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইল ; কক্ষস্থ কেহ তাহা লক্ষ্য করিলনা ; কাকাতুয়া আগমনী গাইল :—

"দোল, দোলা দোল—হয় না যেন ভুল
হরি হরি ব'ল—সুমধুর বোল।"

সে গান শুনিয়া জয়া শিহরিয়া উঠিল; তাঁহার হৃদয়ে লুপ্তস্মৃতি সহসা জাগিয়া উঠিল; বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—"কাকাতুয়াহস্তে দ্বারে দাঁড়াইয়া তারা। জয়া তারাকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন—তারা কহিল ঃ—

"পেয়েছি মাসি বনের পাখী, দেখ যেন দেয় না ফাঁকি;
'হরি আমায় কর কোলে,' গায় পাখী মধুর বোলে,
কে শিখাইল এ গান—শুনে তারার জুড়ায় প্রাণ"!

তারার কথা শুনিয়া, সাধের কাকাতুয়ার দূতীপনা ভাবিয়া মুহূর্ত্তেকের জন্য জয়া ভৈরবীর কথা ভুলিয়া গেলেন; কল্যাণীর মায়ার খেলা দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। তাঁহার মনে হইল কল্যাণ বা প্রভাসক্ষেত্র হয়। তারা মিলিল, কাকাতুয়া আসিল; ভৈরবীও দেখা দিল—স্থান-মাহাত্ম্যে ভৈরবী হয় ত মৃত দেহে প্রাণ পাইবে—কল্যাণে করোঞ্চার সকলের মিলন হবে। অমনি দৈববাণী হইল—'জয়ে তোমার অনুমান সত্য—কল্যাণ প্রকৃতই প্রভাসক্ষেত্র; এ যজ্ঞভূমে করোঞ্চার সকলের অপূর্ব্ব মিলন বিধির লিখন"। সে কথায় কাকাতুয়ার কথা মনে হইল—কাকাতুয়া বলিয়াছিল—

"ছেড়ে দাও মা মঙ্গলে—উড়ে যাই ঘোর জঙ্গলে;
চঞ্চলাকে আনব ধ'রে, দুধকলা দিও দ্বিগুণ ক'রে।"

জয়া অনিমিষ লোচনে কাকাতুয়ার দিকে চাহিলেন, সে চাহনির উত্তরে কাকাতুয়া আরক্ত নয়নগোলক বিস্ফারিত

করিয়া প্রীতিভরে ঘন ঘন মঙ্গলার মুখ খানি দেখিতে লাগিল ; মঙ্গলার কৌতুহলময়ী দৃষ্টি বুঝিয়া কাকাতুয়া বলিয়া উঠিল ঃ—

"পাহাড় পর্ব্বত খুঁজে এনেছি মা তোর চঞ্চলা,—অনেক দিন খাই নাই মাগো তোমার হাতে দুধছোলা"। জয়া আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া সাহ্লাদে কাকাতুয়ার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। বহুকাল পর দুধ ছোলা পাইয়া কাকাতুয়া পরম পরিতোষ সহকারে গৃহদ্বারে বসিয়া উদর পূর্ণ করিল।

কাকাতুয়াকাহিনী রমা ও অনুপমার নিকট স্বপ্নময় বোধ হইল ; সে রহস্য ভেদ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইল। তারা সুচতুরা ও বুদ্ধিমতী ; সে বুঝিল জয়া মাসীর আবেগ ও কৌতুহল-ময়ী দৃষ্টি আর কাকাতুয়ার হর্ষোৎফুল্ল চটুল চাহনি পূর্ব্ব পরি-চয়ের আভাস ও দীর্ঘকাল অদর্শনের পর সহসা সম্মিলন-জনিত আনন্দ উচ্ছ্বাসের প্রশস্ত প্রমাণ। কাকাতুয়াকে পাইয়া অবধি তারার পূর্ব্ব কথা, বাল্য-কাহিনী একে একে মনে জাগিতেছে। আজ এ ব্যাপার দেখিয়া তারার মনে হইল, মাসীই পাখীকে হরিনাম—আর আমার প্রাণের গানটী শিখাইত ; কে আর গান গাইত, কে শুনিত ততটা স্মরণ হইল না। স্মৃতির সুধাংশু জাল যেন জলদাবৃত রহিল ; মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে আকাশগাত্রে যেন ক্ষণে ক্ষণে দু'একটী করিয়া তারকা ফুটিতে লাগিল। তারার প্রাণে আজ বিষম খট্‌কা বাধিল। অতি সাবধানে মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া তারা কহিল "মাসী—কাকাতুয়া আজ এখানেই থাকুক, মায়ের প্রসাদে বনপাখীর জনম সফল হউক।"

অনন্তর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভৈরবীকে দেখিবা মাত্র কে যেন তারার কাণে কাণে বলিয়া দিল, দেখিতেছ কি—তোমার জন্যই ভৈরবীর এ দুর্দ্দশা—এত লাঞ্ছনা"! তারার চক্ষে অজ্ঞাতে জল আসিল—সে উষ্ণ অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া জয়ার বাহুমূলে পতিত হইল। জয়াকে উদ্দেশ করিয়া তারা কহিল—"মাসি—রোগীর সেবায় তোমার আনন্দ কিন্তু তুমি একাকিনী কত করিবে? তোমার কার্য্যে সাহায্য করার অবসর আমার যথেষ্ঠ আছে"। বলিয়া রমা ও অনুপমার দিকে চাহিল। সে চাহনির অর্থ কল্যাণে জয়ার কক্ষে থাকিবার অনুমতি। রমা অম্লান চিত্তে কহিলেন, "পীড়িতের সেবায় তোমারও আনন্দ; যাহাতে তোমার আনন্দ—সে কার্য্যে আমাদের অনভিমত করার কারণ নাই। দিদির মত হইলে থাকিতে কোন বাধা নাই। তদুত্তরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে জয়া কহিলেন, যতদূর জানা গিয়াছে মুমূর্ষা ব্রাহ্মণ কন্যা—মাতৃকল্পা; দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ—সেবা শুশ্রূষায় ও বাঁচিবার আশা কম। তারার থাকার প্রয়োজনাভাব।

জয়ার কথার অর্থ রমা ও অনুপমা সরল ভাবে বুঝিল কিন্তু তারার মনে আজ এক নূতন চিন্তা—অভিনব সন্দেহ উপস্থিত হইল। সেই গভীর চিন্তাকুল চিত্তে তারা, রমা ও অনুপমার সঙ্গে নওয়াগড়ে ফিরিয়া আসিল।

বিংশ কল্প।

শিবিকারোহণে রমা ও অনুপমা নওয়াগড়ে ফিরিয়া গেলেন; তারা পদব্রজে চলিতে ভালবাসে; সুতরাং তারা পদব্রজেই চলিল। বাহকগণ শিবিকা লইয়া তদনুসরণ করিল। সকলেই সাঙ্কেতিক পথে চলিল—কারণ রাত্রি তখন প্রহরেক অতীত।

কার্ত্তিকমাস—অমাবস্যা; আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা মেঘ ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। দেওয়ালীর রাত্রিতে অনন্ত দেউটী মালার স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় লজ্জা পাইয়া তারকামালা যেন সেই ভাঙ্গা মেঘের কোলে লুকাইয়াছে। রজনী গভীর—ঘোর তমসাচ্ছন্ন; গিরিসঙ্কট নীরব, দূরপল্লী হইতে অস্ফুট সারমেয়রবমাত্র ক্ষণে ক্ষণে শ্রুতি গোচর হইতেছে—আর নৈশ সমীরণ ক্ষিপ্রার নর্ত্তনশীল তরঙ্গমালার সঙ্গে মিলিয়া একতানে কি এক অপূর্ব্ব সুমধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছে। কোথাও বা অদূর বন হইতে ঝিল্লীরব ছুটিয়া আসিতেছে। সে পার্ব্বত্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হুঃ হুঃ শব্দে বাহকগণ চলিয়াছে। যথাসময়ে শিবিকাদ্বয় ক্ষিপ্রার ঘাটে পৌঁছিল; তারা শিঙ্গা বাজাইল; প্রতিধ্বনি ক্ষিপ্রার অপর পার হইতে স্বাগত জানাইল—আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। প্রথমতঃ রমা ও অনুপমা পার হইলেন; বাহকগণ ও শিবিকাসহ গড়-স্বামিনীদের অনুগমন করিল। কেবল তারা এ পারে থাকিল; তারা বলিয়া দিল নৌকা যেন এখনই ফিরিয়া আসে।

তারা এক উচ্চ শিলাখণ্ডোপরি আরোহণ করিয়া ক্ষিপ্রার বক্ষে প্রতিবিম্বিত দীপমালার শোভা দেখিতে লাগিল। নওয়াগড় আজ অনন্ত দেউটীমালায় মণ্ডিত; ধীর-পবন-প্রকম্পিত দীপমালা নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া নীলাকাশে নক্ষত্রমালার অনুকরণ করিতেছে। তারার দৃষ্টি সহসা এক ধবল পদার্থের উপর পড়িল। সে দৃশ্যে তারা বিস্মিতা হইল কিন্তু ভীতা হইল না। ভয় কি তারা জানে না। ত্রস্ত হস্তে একটী ক্ষীণ দীপ জ্বালিয়া তারা ধীরে ধীরে সেই দৃষ্ট পদার্থের নিকটস্থ হইলে বুঝিতে পারিল, সে ধবল পদার্থ একটী শ্বেত বর্ণের অশ্ব; আর অশ্বের মুখরজ্জু হস্তে জনৈক সশস্ত্র পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান; যেন কোনও অশ্বারোহী পশ্চাদ্বর্ত্তী অনুচরগণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। নিশীথে পার্ব্বত্য পথে একাকিনী পরিক্রমণে তারা অভ্যস্তা; বিপদনাশিনী কল্যাণীর উপর তারার অচল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসবলে সেই ঘোর রজনীতে অপরিচিত বীরপুরুষকে দেখিয়া তারার মনে ভয় হইল না, বরং আগন্তুকের পরিচয় জানিতে কৌতুহল জন্মিল; সুমিষ্ট বিনীত বচনে তারা জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কে'?

উঃ—আমার পরিচয়ে আপনার কি প্রয়োজন? কণ্ঠ-স্বরে বোধ হইতেছে আপনি বালিকা। এ নিশীথ রাত্রিতে এহেন দুর্গম স্থানে আগমনের উদ্দেশ্য?

তারা—দুর্গম পার্ব্বত্য পথে নৈশবিচরণ আমার বাল্যশিক্ষা। পথভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন, অনাশ্রয়কে আশ্রয় দানই নৈশভ্রমণের উদ্দেশ্য!

আগ—আপনার জীবনব্রত অতি মহৎ; আপনি কোন্ কুল ললনা—পিতৃগৃহ কোথায় ?

তারা—ক্ষিপ্রার অপর পারে—নওয়াগড়ে।

আগ—আপনি কে ?

তারা—গড়স্বামী চিতুসর্দ্দারের কন্যা !

আগ—আপনিই কি ঠগীকরে অপহৃতা করোঞ্চার ব্রাহ্মণকন্যা ?

তারা—সেকথা জানি না। শুনিয়াছি আমি সর্দ্দারের ঔরস কন্যা নহি, প্রতিপালিতা মাত্র! আপনার আগমনের উদ্দেশ্য ?

আগ—ঠগীদলন আর অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার সাধন।

তারা—কিরূপে উদ্ধার করিবেন ?

আগ—চিতুসর্দ্দার আত্মসমর্পণ ও ব্রাহ্মণকন্যাকে প্রত্যর্পণ না করিলে যুদ্ধ করিয়া ঠগীগণসহ ঠগীপতিকে বন্দী করিয়া ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধন করিব।

তারা—পীণ্ডারীকুল যুদ্ধকে ভয় করে না; তাহারা বিষাক্ত তীর-ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ও তাহাদের সন্ধান অব্যর্থ। পীণ্ডারী মরিতে জানে কিন্তু আত্ম-সমর্পণ করিতে জানে না। সেটী তাহাদের সিদ্ধিদাত্রী—ইষ্টদেবী কালীমায়ীর নিষেধ।

আগ—চিতু সর্দ্দারের গড়ে ঠগীসংখ্যা কত হইবে ?

তারা—মাপ করিবেন, আমা হইতে তাহার সংবাদ পাইবেন না। সম্ভবতঃ আপনি ইংরাজের গুপ্তচর; দুঃসাহসে বিপদসাগরে ডুবিতেছেন।

আগ—যুদ্ধ আমাদের প্রিয় ব্যবসা; বিপদে রক্ষা মধুসূদনের হাত। মন্ত্রের সাধন না হইলে শরীর পতনেও কষ্ট নাই।

তারা—যুদ্ধ তবে অনিবার্য্য; আপনি সাবধানে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। পীণ্ডারীর বিষাক্ত শাণিত তীর ইংরাজের গোলা হইতেও ভয়ানক ও প্রাণঘাতী—বলিয়া তারা বিদ্যুৎবেগে অন্তর্হিতা হইল; আগন্তুক আর তাহার ছায়াও দেখিতে পাইলেন না। তারা হস্তস্থ ক্ষীণ দীপটী সেই শিলাখণ্ডের উপর রাখিয়া গেল। ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল, মুহূর্ত্তে নৌকা বাহিয়া তারা পরপারে গড়ে পৌঁছিল। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত।

গড়ে পৌঁছিয়া তারা একেবারে অন্তঃপুরে রমার কক্ষে উপস্থিত হইল। চিতুসর্দ্দার যখন পত্নীদ্বয়ের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে থাকেন, তারা তখন সেখানে যায় না। আজ তাহার মনে নূতন চিন্তা—"আমিই কি করোঞ্চার অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যা!" এ চিন্তায় তারা উন্মনা হইয়া অজ্ঞাতভাবে সে কক্ষে উপস্থিত হইল; সম্মুখে সর্দ্দারকে উপবিষ্ট দেখিয়া অপ্রতিভ হইল; লজ্জায় মনের চিন্তা দূর হইল। সরল ভাবে তারা কহিল "এখনও আপনারা জাগিয়া আছেন?"

অনু—আজ আনন্দের রাত্রি—ঘুমাইতে নাই। নয়নতারা ছাড়া থাকিলে নিদ্রাদেবীরও স্থান হয় না!

তাহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে তারা আসিয়া মায়ের পার্শ্বে বসিল। সেদিন অনুপমার কেশ বন্ধন হয় নাই; ত্রস্ত হস্তে তারা সে অবদ্ধ ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলজালে বিনোদ কবরী বাঁধিতে

বসিল। অনুপমা হাসিয়া কহিলেন—"এ শিক্ষা আবার কোথায় হইল ?" তারা স্মিতমুখে চখে চখে উত্তর করিল—"জয়া মাসীর কাছে।"

অনুপমা প্রতিবাদ না করাতে তারা কবরী বন্ধন ব্যপারে মনোনিবেশ করিল।

চিতুসর্দ্দার উভয়ের সে আলাপ শুনিতে ছিলেন—অবসর বুঝিয়া কহিলেন "কল্যাণে থাকিতে তারার বড় সাধ!

রমা—উপস্থিত কল্যাণও নিরাপদ নহে; জয়া দেবীর মুখে করোঞ্চার নাম শুনিয়াছি; আর নবাগতা ভৈরবী হয়ত তাঁহারই কোন ঘনিষ্ঠা কুটুম্বিনী হইবেন—বুঝি বা হৃদয়াকাশের তারা কল্যাণেই খসিয়া পড়ে।

চিতু—ইংরাজ ফৌজ সে কন্যার অনুসন্ধানে আছে। তাহার উদ্ধার সাধনই আপাততঃ যুদ্ধের উদ্দেশ্য। ঠগীগণের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। দলে দলে ঠগীগণ ধৃত হইয়া বন্দী হইতেছে। এ যুদ্ধে আত্মরক্ষা সহজ নহে। ভন্‌সলা রাজ মনে মনে আমাদের পক্ষে হইলেও প্রকাশ্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই আত্ম-সমর্পণ ও হৃত রত্ন প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। পীণ্ডারী কুলের ভবিষ্যৎ ভীষণ অন্ধকার!

অনু—কল্যাণ সম্প্রদায় হইতেই বিশেষ আশঙ্কা। সাধুগণ ঠগীদমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ সন্ধান হয়ত তাঁহারাই দিয়া থাকিবেন।

চিতু—আমার বিশ্বাস স্বামীজী-প্রমুখ কল্যাণ সম্প্রদায় পীণ্ডারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না।

রমা—রক্তপাত করিতে না পারেন—কিন্তু সাধনার পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য ঠগীদমনে ব্রতী হইয়াছেন; উদয়গিরিতে ফৌজের আগমনই তাহার প্রমাণ।

চিতু—সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য। তার পর মায়ের ইচ্ছা। তারা গাও একবার—

"হরি আমায় কর কোলে;"

তারা নিকটে বসিয়া সকল কথা শুনিল; ওতপ্রোতভাবে কয়েকটী ভাবনা আসিয়া তারাকে আকুল করিল; প্রথম চিন্তা—যুদ্ধ অনিবার্য্য—ফল অনিশ্চিত!

২য়—তবে আমিই কি করোঞ্চার ব্রাহ্মণ কন্যা?

৩য়—আমার প্রাণের গানটী হয়ত সেখানেই শিক্ষা।

৪র্থ—ভৈরবী এ গান কোথায় পাইল—কে শিখাইল? গভীর আঁধারে ক্ষীণ আলোক রেখার ন্যায়—আবেশশূন্য দূরাগত বীণাধ্বনির প্রায় শৈশব কাহিনী—সে লুপ্ত স্মৃতিছায়া অস্পষ্টভাবে এক একটী করিয়া তারার হৃদয় কন্দরে জাগিতে লাগিল। চিতুর কথা তারার কর্ণে প্রবেশ করিল না। পূর্ব্বোক্ত চিন্তায় তারা আজ উন্মনা। সর্দ্দারজী আবার বলিল—তারা, জীবন তারা, কেন আজ আত্মহারা?

নিদ্রোত্থিতার ন্যায় তারা কহিল—আপনার অনুমান সত্য—সুখ দুঃখ, ভয় ভাবনা এতকাল তারা জানিত না—আজ

কত অশিব চিন্তা একটীর পর একটী আসিয়া প্রাণ আকুল করিতেছে!

সর্দ্দার—এ বয়সে আমাদের উপর তোমার যে মমতা ও ভালবাসা তাহা রমণী মাত্রেরই আদর্শ। তবে একবার গাও—"হরি আমায় কর কোলে।"

তারা—এ গান আমায় কে শিখাইল?

সর্দ্দার—কে শিখাইল জানি না—কিন্তু ও গানে প্রাণে শান্তি পাই—তাই শুনিতে চাই।

তারা তখন অত্যুচ্চ পঞ্চমে গাইল—

"হরি আমায় কর কোলে, আমি কোলের কাঙ্গালিনী ডাকি হরি হরি ব'লে।" ইত্যাদি—

গাহিতে গাহিতে তারার আবেশ হইল; চক্ষে জল আসিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইল; সে অবস্থায় কে যেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া বলিয়া দিল—তারা তুমিই ঠগী করে অপহৃতা করোঞ্চার সেই ব্রাহ্মণ কন্যা—সাদরে পোষিতা ভৈরবীর আশালতা—এ গান তাঁহারই যত্নে শিক্ষা"!

এ কয়টী কথা পুনঃ পুনঃ কে যেন তারার কর্ণে ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় অন্যের অশ্রুতভাবে বলিয়া দিতেছিল; সে কথায় তারার মন আকুল হইল; আকুলতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হইল। তারার তদবস্থা দৃষ্টে রমা ও অনুপমা ভাবিলেন, ফৌজের ভয়ে তারা আরষ্ট হইতেছে সুতরাং তদালোচনা পরিত্যাগ করিয়া কথান্তরে সাদর সম্ভাষণে তারাকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

অতঃপর তারাও আশ্বস্ত হইয়া রমা ও অনুপমার নিকট বিদায় লইয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত; কক্ষে প্রবেশ করিয়া তারা বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনঃ কল্যাণে চলিল। নৌকারোহণে সঙ্কেত ঘাটে পৌঁছিল; এবং কৌতুহল পরবশ হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট অশ্ব বা অশ্বরোহীর খোঁজ করিল, কিন্তু কাহারও সন্ধান না পাইয়া অনন্যচিত্তে মন্দিরের পথে চলিল ও যথাসময়ে জয়ার কক্ষদ্বারে পৌঁছিল। কক্ষদ্বার রুদ্ধ; আস্তে ব্যস্তে তারা দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল "মাসি"! জয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া তারাকে কোল দিল; আদর করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন কল্যাণীর ইচ্ছায় ভৈরবীর অবস্থার ঈষদ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে যেন একটুকু ভালর দিকে চলিয়াছে। তারা অনিমিষ লোচনে ভৈরবীর মুখখানি দেখিতে লাগিল; যত দেখে ততই যেন দেখিতে ইচ্ছা হয়; সে শীর্ণ মলিন মুখখানি তারার বড়ই প্রিয়দর্শন বোধ হইল, তারার সরল হৃদয়ে যেন কি এক অননুভূত ভাবের বিকাশ পাইল; চক্ষে জল আসিল, আকুল প্রাণে তারা কহিল "মাসি সত্য বল এ তোমার কে?" অপরে দয়া ও নিঃস্বার্থ ভাবে পরসুখ কামনাই তোমার নিত্যব্রত!

জয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, রোগীর সেবায় আমার বড় আনন্দ; ততোধিক আনন্দ হয় তোমার মুখে মধুমাখা সেই প্রাণকাড়া গানটী শুনিয়া; গাও তবে সেই মধুর গান—

"হরি আমায় কর কোলে।"

তারা পঞ্চদশ বর্ষীয়া স্বভাব সরলা বালিকা—গিরিবালা—নিরাভরণা স্নেহপ্রতিমা। নিশা অবসান প্রায়; আকাশ বিরলতারকা; কল্যাণ নিস্তব্ধ; তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মোহন ললিত রাগে বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে তারা গাইল:—

"হরি আমায় কর কোলে;—
আমি কোলের কাঙ্গালিনী ডাকি হরি হরি ব'লে।"

অষ্ট বর্ষাধিক পরে স্মৃতির অতীত-বালকণ্ঠ বিনিসৃত—মন প্রাণ বিমোহন সেই সাধের গান শুনিয়া ভৈরবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; সহসা সে সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুমূর্ষা শিহরিয়া উঠিল; মৃতসঞ্জীবনী সুধাপানে সে মৃত দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল; তদীয় শুষ্ককণ্ঠে বাকশক্তির উদয় হইল; ভৈরবী আগ্রহ সহকারে ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, মঙ্গলে একি স্বপ্ন! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলাম যেন একটী সুরবালা 'হরি আমায় কর কোলে' গাইতে গাইতে আকাশপথে অবতরণ করিয়া তোমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল; আবার সেই গানটী গাইতে গাইতে তোমার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। বালিকা ঘুমাইল কিন্তু সে গান থামিল না, প্রভাতী পবনের সঙ্গে সুর মিশাইয়া সে গান যেন এখনও শূন্যে গীত হইতেছে।"

মঙ্গলা সহর্ষে কহিলেন, যোগিনি—তোমার সফল স্বপ্ন! সে সুরবালা নয়, বনবালা তারা; সত্যই সে গান গাইতে গাইতে ঘুমায়ে পড়েছে।

ভৈরবী—তারা কে?

মঙ্গলা—পীণ্ডারী দলাধিপতি চিতুসর্দ্দারের পালিতা কন্যা—চৌর-করে অপহৃতা করোঞ্চার সেই স্নেহলতা।

ভৈরবী—কে চেলী? সে যে আজও বাঁচিয়া আছে একথা মনেও আসে না! আকাশের তারা দেখিলে মনে হয় উহাদের যেটী সুন্দর ও উজ্জ্বল সেইটী চঞ্চলা।

মঙ্গলা—সেটী স্নেহের ধর্ম্ম; প্রাণাধিক স্নেহের পাত্রকে দীর্ঘকাল না দেখিলে অকল্যাণ চিন্তা সর্ব্বাগ্রে আসে; কিন্তু কল্যাণীর ইচ্ছায় সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পার। এ তারাই তোমার চেলী।

তাহা শুনিয়া ভৈরবী দুর্ব্বল মস্তক ঈষৎ উন্নত করিয়া কাতর দৃষ্টিতে তারার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন "দিদি চঞ্চলাকে আবার দেখিব বলিয়াই বোধ হয় এতদিন আমার মরণ হয় নাই; এখন আর মরিতে কষ্ট নাই" বলিয়া ভৈরবী আবার উপাধানে মস্তক রাখিলেন। ভৈরবীর প্রাণে আনন্দের প্রবাহ ছুটিল; একটী একটী করিয়া কত কাহিনী-- কত লুপ্তস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল; হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করা ভৈরবীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ভৈরবী আবার কি বলিতে উদ্যত হইলে মঙ্গলা বাধা দিয়া কহিলেন, অন্যকথা পরে হবে; এ পরিবর্ত্তনের সময়, দুর্ব্বল দেহে অধিক বাক্যব্যয়ে অনিষ্টেরই আশঙ্কা—এই লও মায়ের চরণামৃত" ভক্তিভরে মায়ের চরণামৃত পান করিয়া ভৈরবী শান্তি পাইলেন ও পুনঃ নিদ্রিতা হইলেন।

এস্থলে সকলের পরিচয় আবশ্যক। জয়া করোঞ্চার

মঙ্গলা, ভৈরবী বিন্দু বা বিন্দুবাসিনী আর তারা—? ঠগীকরে অপহৃতা করোঙ্কার সেই প্রেমানন্দের কন্যা—চেলী বা চঞ্চলা। আর কল্যাণ সম্প্রদায়ের নেতা গোসাঞীজীই করোঙ্কার গোসাঞী বা পাঠক প্রেমানন্দ—চঞ্চলার পিতা। কল্যাণীর ইচ্ছায় কল্যাণ করোঙ্কার প্রভাসক্ষেত্র।

একবিংশ কল্প।

কালের স্রোত ফিরিয়াছে; অনুকূল মলয় পবনে আশাতরী উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে তীরাভিমুখে আসিতেছে। এক এক করিয়া মধুর ডিঙ্গা আসিয়া কূলে লাগিতেছে। তারপর কুলকুণ্ডলিনী কল্যাণীর ইচ্ছা!

যে ঘটনাচক্রে পড়িয়া প্রেমানন্দ গোসাঞী পুনরায় গৃহী হইয়াছিলেন, তদনুরূপ অশুভ ও অপ্রীতিকর ঘটনানুবর্ত্তী হইয়া আজ গুরু শিষ্য ইংরাজ ফৌজের সহচর; ঠগীদলন ও হৃত-কন্যার উদ্ধার সাধনে একান্ত তৎপর। ব্রহ্মমূহূর্ত্তে স্বামীজী ও গোসাঞী অন্যান্য দিনের ন্যায় ভৈরবীকে দেখিতে আসিলেন। জয়া তখনও রোগীর সেবায় ব্যস্ত; মুক্তদ্বারপথে প্রভাতী পবনে সে ক্ষুদ্র কক্ষ প্রফুল্ল; মহাপুরুষদ্বয়কে দ্বারদেশে উপস্থিত দেখিয়া জয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ভৈরবী তখনও নিদ্রিতা। অনুচ্চস্বরে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—ভৈরবী কেমন?

জয়া—কল্যাণীর ইচ্ছায় অনেক ভাল। জ্বর বিরাম হইয়াছে, বিকারও কমিয়াছে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর হইতেই জ্ঞান হইয়াছে। দু'একটী কথাও বলিয়াছে। সে কথার ভাবে বোধ হইল—রোগযাতনারও অনেকটা লাঘব হইয়াছে। অন্য উপসর্গ উপস্থিত না হইলে ক্রমে সুস্থ হইবেন. আশা করা যায়।

স্বামীজী—তারার পরিচয় কিছু পাইয়াছে?

জয়া—সে পরিচয়ও হইয়াছে; কিন্তু তারা এখনও সব কথা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; পূর্ব্বস্মৃতি এখনও সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে নাই।

গোসাঞী—তারাকে আরও কিছুকাল দূরে দূরে রাখাই সঙ্গত; শেষ হর্ষে বিষাদ না হয়। লালজী একাকী নওয়াগড়ে গিয়াছে, এখন নিরাপদে উদয়গিরিতে প্রত্যাগত হইলেই মঙ্গল!

জয়া—এতদূর দুঃসাহসের কার্য্য করা লালজীর পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। ইংরাজ ফৌজ ঠগীর পরম শত্রু—লালজী ফৌজ-দলের অগ্রণী, পামর পীণ্ডারীগণ একথা জানিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা বটে।

"কুরু কল্যাণি কল্যাণ জীবে" বলিয়া স্বামীজী কুটীরাভি-মুখে চলিলেন; গোসাঞীও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

এদিকে মোহিতলাল নওয়াগড়ে প্রবেশ করিয়া বিপন্ন হইলেন। ক্ষিপ্রার ঘাটে যোগিনীর মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে চিতুর গড় অরক্ষিত নহে; ঠগীগণ তীর ব্যবহারে অভ্যস্ত—বিষাক্ত তীর সদ্য প্রাণান্তকর; যোগিনী বয়সে নবীনা হইলেও তাহার ধর্ম্ম বুদ্ধি ও কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রবীণার ও অনুকরণ যোগ্য। যোগিনী প্রস্থান করিলে মোহিত-লাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে কিয়ৎক্ষণ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন; একবার স্বীয় অদৃষ্টের পরিণাম ও ভাবিলেন। সে ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সে পার্ব্বত্য পথের আঁধার যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল; লালজী সাহসী ও কষ্ট-সহিষ্ণু, কিছুতেই

পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার পাত্র নহেন। কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া অশ্বারোহণে অজ্ঞাত পথে লক্ষ্যশূন্য হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নওয়াগড়েও দেওয়ালীর ধূম কম নহে। পীণ্ডারীগণ সে উৎসবে উৎফুল্ল, পান ভোজনে উন্মত্ত। দ্বার রক্ষকগণ বিলাস-বিভোর,—কর্ত্তব্য-বিমুখ,—প্রবেশদ্বার অনর্গল; সেনানিবাসে পীণ্ডারীগণ উচ্ছৃঙ্খল; প্রহরীগণ সুরাদেবীর অনুগ্রহে আত্ম-রক্ষণে অক্ষম। সে সুযোগে মোহিতলাল গড়ে প্রবেশ করিলেন! প্রবেশদ্বারে রক্ষক গতিরোধ করিলে লালজী তাহার কর্ণমূলে কি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন দ্বারবান আর দ্বিরুক্তি করিল না। সেখান হইতে সেনানিবাস—সেনানিবাস পার হইয়া কালীর মন্দিরাঙ্গনে পৌঁছিলেন। পূজকগণকে রজত কাঞ্চনে পরিতুষ্ট করিয়া ভক্তিভরে মায়ের প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন, এবং সেখান হইতে কোষাগারে পৌঁছিলেন। কোষাধ্যক্ষ শান্তশীল সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রমোদোন্মত্ত। মদবিহ্বলা নর্ত্তকীর কণ্ঠে তাললয়শূন্য ভঙ্গ স্বরে সঙ্গীত ছুটিতেছে; কিন্তু কোষাধ্যক্ষের সেদিকে লক্ষ্য নাই; তিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা—সিদ্ধির মাত্রা চড়াইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে—অর্দ্ধ শয়নে আকাশ পাতালের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছিলেন; সুতরাং শত্রুর আগমন উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে অজ্ঞাত-কুলশীল বীরপুরুষকে উপস্থিত দেখিয়া জনৈক সহচর কি বলিল তাহা কোষাধ্যক্ষের কর্ণ গোচর হইল না; তিনি তেমনি অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে—অর্দ্ধস্ফুট বচনে কহিলেন—"হা শুন্‌ছি—বা—বেশ গান—করমেতি গায় ভাল"।

সহচর—তা নয়—গৃহদ্বারে কে এক অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান—
বোধ হয় ছদ্মবেশী ইংরাজচর হইবে।

শাস্ত—(পূর্ব্ববৎ) থাকুক্—দফাদারকে ডাক, দেব্‌লে—কই
দাও—সিদ্ধি—মায়ের ইচ্ছায় সব সিদ্ধি !

কোষাধ্যক্ষের নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া অনুচর দামামা বাজাইল ; তাহা শুনিয়া দফাদার সশব্যস্তে কোষাধ্যক্ষের কক্ষদ্বারে পৌঁছিল। দফাদার আমীরালী—দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দাম্ভিক পুরুষ। আবক্ষ-চুম্বিত সুবিন্যস্ত শ্মশ্রু—মুখকান্তি তেজময়—আরক্ত লোচন—উৎসবে ব্যসনবিহ্বল। কক্ষদ্বারে অজ্ঞাত কুলশীল—তেজঃপুঞ্জ কান্তি যুবাপুরুষকে দেখিয়া আমীরালী চমকিয়া উঠিল—এবং বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিল—"কোন্ হায়" ? কক্ষাগত দীপালোকে আগন্তুক দেখিলেন প্রশ্ন কর্ত্তার দৃষ্টি রুক্ষ, কণ্ঠ স্বর ততোধিক শ্রুতিকটু ও কর্কশ ; পীণ্ডারীগণের প্রকৃতি স্বভাবতই কঠোর ও অপ্রিয় ; কিন্তু এই ব্যক্তির আকৃতি ততোধিক উগ্রচণ্ড ও বীভৎস ; মুখমণ্ডল নানারূপে চিত্রিত—সে চিত্র এমনই অপ্রাকৃতিক যে দৃষ্টি মাত্র আশঙ্কার উদ্রেক হয়। তাদৃশ লোকত্রাস বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া আগন্তুক মনে করিলেন, এহেন অসহায়াবস্থায় পাষণ্ডের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় লাভের অংশে বিপন্ন হওয়া মাত্র। সুতরাং নিঃশঙ্কে ধীর ও বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ, আনন্দের দিনে মায়ের প্রসাদ পাইলে চরিতার্থ হইব"।

দফাদার অহিন্দু—মুসলমান ; ব্রাহ্মণ সেবার মর্ম্ম তাহার চৌদ্দপুরুষে ও জানে না। প্রগল্‌ভ দফাদার তাচ্ছল্যভরে

ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—"তোম্‌রা মাফিক বহুৎ বামুন হাম দেখা—উদেগিরিমে কেত্‌না, বামুন ফৌজ হুয়া,—তোম্‌বি ঐছন কই হোগা"।

মোহিতলাল এবার সমস্যায় পড়িলেন; দফাদার যখন ফৌজভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিতেছে, তখন ব্যাপার গুরুতর—দফাদারকে অন্যরূপ বুঝান অসম্ভব। লালজী বিষম বিকল্পময় সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া; একদিকে আত্মগোপন—অন্যদিকে অক্ষত-ভাবে গড় হইতে নিষ্ক্রমণ। পীণ্ডারী নৃশংস ও নির্দ্দয় তদুপরি মদোন্মত্ত; কৌশলে কার্য্যোদ্ধার ভিন্ন উপায়ান্তর বিরহিত। মোহিতলাল অটল ও সরল ভাবে কহিলেন—"কেমন ব্রাহ্মণ জানি না, তবে অনেক রাট পীণ্ডারী আমার পূর্ব্বপুরুষগণের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন"।

দফা—তা হউক, এ পিণ্ড দানের স্থান নহে। এখানে মন্ত্র তন্ত্র খাটে না—এখানে এমন এক যন্ত্র আছে যে প্রয়োগ মাত্রই পিণ্ডের বিয়োগ!

উভয়ের মধ্যে এরূপ বাক্য বিনিময় হইতেছিল সে অবসরে নর্ত্তকী গণের কণ্ঠে গান থামিয়া গেল; শান্তশীলের একটুকু চৈতন্য হইল; নিমীলিত নেত্রে—কহিলেন দফাদার, পীণ্ডারীর কুশল?

দফা—মায়ীর ইচ্ছায় সব শালতনাৎ হায়। লেকেন দরোয়াজাপর থোরা গরবর মালুম্‌ হোতা।

শান্ত—হুঃ—কোষাধ্যক্ষের সিদ্ধির নেশা তখনও ছুটে নাই।

দফা—হুঃ নহি, কু—দরোয়াজাপর ডাকু—কা হুকুম?

আগ—খাঁ সাহেব—মাপ করিবেন—আমি ডাকু নহি; হিন্দুর দ্বারে অতিথি—অনাদৃত হইলে আপন পথে চলিয়া যাইব। এ বিষয় কোষাধ্যক্ষের হুকুম সাপেক্ষ কি?

দফা—তোম্ বড্ডা লুচ্চা হায়! হামারা হুকুমকা ওয়াস্তে কুচ্ পরোয়া নেহি কর্ত্তে?

যুবক এবার গর্ব্বিতভাবে কহিলেন—"চিতুসর্দ্দারের গৃহদ্বারে আপামর সর্ব্ব সাধারণের জন্য সদাব্রত অবারিত; আজ সার্ব্বভৌমিক উৎসবের দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানের জন্য সে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম! ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্যাঘাত—একি লজ্জার কথা নয়? এ কথা শুনিয়া দফাদারের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল—রক্তিম লোচনদ্বয় রক্তজবাবৎ উজ্জ্বল হইল; উপযুক্ত দণ্ডবিধান জন্য—যুবকের হস্তাকর্ষণ করিল; যুবক নিশ্চল শিলাখণ্ডবৎ নিথর। তদুত্তরে যুবক দফাদারকে সরাইবার জন্য একটুকু ধাক্কা মারিলেন; সে ধাক্কায় দফাদার শুষ্ক শালপত্রবৎ অদূরে উড়িয়া গেল। এবার বিষধর ফণা উর্দ্ধ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল; সঙ্কেত সূচক তূর্য্যধ্বনি করামাত্র একদল পাঁওারী আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। মন্দিরপ্রাঙ্গনে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এবার কোষাধ্যক্ষের হুস হইল—বুঝিলেন কি এক বিভ্রাট উপস্থিত। ত্রস্তে কক্ষের বাহিরে আসিয়া আগন্তকের পরিচয় লইলেন। যুবক ব্রাহ্মণ সন্তান জানিয়া দফাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ব্রাহ্মণ কুমার—ইহার সম্বন্ধে কি করা চাই?

দফা—সরবৎ!

এটী ঠগীগণের সাঙ্কেতিক উক্তি—অর্থ 'হত্যা'—

কোষা—সর্ব্বনাশ—তাও কি হয়! খাঁ সাহেব—তুমি মায়ের আদেশ ভুলিতেছ; বিশেষতঃ আজ দেওয়ালীর রাত্রিতে নরহিংসা আচার বিরুদ্ধ। সর্দ্দারের আদেশ —কোনরূপে অতিথির অনাদর না হয়।

দফা—সৈন্যাধ্যক্ষ অপমানিত হইলেও কি উৎসবের দিনে তাহার প্রতিকার নাই?

কোষা—আছে বৈকি? হাজত! অবশিষ্ট রাত্রির জন্য ইহার উপরও সে আদেশ।

দীপালোকে শান্তশীল যুবকের উজ্জ্বল দৃষ্টি, নয়নাভিরাম মুখশ্রী, সগর্ব্ব বীরকান্তি—সর্ব্বোপরি যুবকের নির্ভীকতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন; মনে যেন কি খট্‌কা বাজিল। দফাদার নিরস্ত হইলে কোষাধ্যক্ষ যুবককে কহিলেন, "দেখিয়া বোধ হয় আপনি কোনও বিশিষ্ট কুলসম্ভব উদ্যমশীল যুবাপুরুষ! কিন্তু কালধর্ম্মে নানা প্রকার অশিব আশঙ্কা আসিতেছে। আপনার প্রকৃত পরিচয় পাইলে সুখী হইব"।

আগ—আপনার অনুমান সত্য;—কিন্তু সন্দেহস্থলে প্রকৃত পরিচয় দিলেও হয়ত বিশ্বাস যোগ্য হবে না। এমতাবস্থায় পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা কম। যদি অতঃপর কখনও সাক্ষাৎ হয়, নিজ পরিচয় দিতে বাধা থাকিবে না।

মোহিত লাল সত্যনিষ্ঠ ও সাহসী পুরুষ। মিথ্যা পরিচয় দিয়া আত্মগোপন করা তদীয় স্বভাব বিরুদ্ধ। এদিকে প্রকৃত পরিচয় দিলে সমূহ বিপদাশঙ্কা; সুতরাং যুবক পরিচয় প্রদানে

কুণ্ঠিত হইলেন। পরিচয় প্রদানে ইতস্ততঃ ও সঙ্কোচ করাতে সকলের মনে সন্দেহের বৃদ্ধি পাইল; শান্তশীল ঠগী, সাহসী ও সূক্ষ্মদর্শী--সহজে ভুলিবার নহেন। তিনি আবার কহিলেন—"বুঝিলাম আপনি পুনঃ সাক্ষাৎ প্রার্থী, সে কথা ভবিষ্যতের গর্ভে; কিন্তু আপাততঃ আপনি অতিথিরূপে গণ্য, পরিচয় না পাইলে অতিথিসেবায় প্রতিবন্ধক জন্মিবে; সেটী কালীমায়ীর ইচ্ছা নহে।

আগ—আমিও মায়ের সন্তান বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি; অনুমতি হয় ত এখনই পার্ব্বত্যপথে ভবানীপুরের দিকে চলিয়া যাই!

শান্ত—আপনি মহাভ্রমে পতিত হইতেছেন; আপনার তেজঃপুঞ্জ দেহ সমুজ্জ্বল মুখকান্তি দেখিয়া যেমন দয়ার উদ্রেক হইতেছে, আপনার কপট ব্যবহারে তেমনই সন্দেহ জন্মিতেছে। আপনি ইচ্ছা করিয়া আত্মগোপন করিতেছেন; সুতরাং আপনি ইংরাজের গুপ্তচর ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্ত করা যায় না।

আগ—আর যদি তাই হয়, তবে আপনার আদেশ কি?

শান্ত—আপনি বন্দী; স্থানান্তরে হইলে এতক্ষণে আপনার মস্তক কণ্ঠচ্যুত হইত; কিন্তু আজ আনন্দের দিনে মায়ের মঙ্গলময় উৎসবে, মায়ের পবিত্র মন্দিরাঙ্গনে নরহিংসা নিষিদ্ধ!

আগ—সেটী আজ না হয় কাল হবে, ব্রাহ্মণসন্তান মৃত্যুকে ভয় করে না; স্থান মাহাত্ম্যে মহাশয়ও বোধ হয় সে কথা ভুলিতেছেন। ভাল,—আমি বন্দী কা'র আদেশে?

শান্ত—আপাততঃ আমারই আদেশে—নিশান্তে সর্দারের আদেশ জানিতে পারিবেন।

আগ—ভবদীয় আদেশ শিরোধার্য্য, এখন কোথায় যেতে হ'বে?

শান্ত—'বন্দীশালায়' আদেশ পাইয়া দফাদার আমীরআলী সে সুযোগে বন্দীকে লৌহনিগড়ে বন্ধন করিবার উপক্রম করিলে আগন্তুক কহিলেন, "খাঁ সাহেব মাপ করিবেন, বন্দী পলাইতে জানে না; লৌহ শৃঙ্খলের ব্যবস্থা দস্যু তস্করের জন্য—অতিথির জন্য নহে।"

তাহা শুনিয়া কোষাধ্যক্ষ কহিলেন, দফাদার! অদ্যকার জন্য নিগড় ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ বন্দী অপরাধী নহে। দফাদার আর সে জন্য জিদ করিল না; অম্লানচিত্তে আগন্তুক রক্ষকগণের অনুসরণ করিলেন। কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আগন্তুক কহিলেন. "মিছিরজি, আপনাকে দু একটা কথা বলিবার ছিল, এবং সে জন্যই আপাততঃ এখানে আগমন।" শান্তশীল ঠগী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও জাতীয়ধর্ম্ম একেবারে ভোলেন নাই; তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে আগন্তুককে কহিলেন "আপনি সচ্ছন্দে বলিতে পারেন।" আগন্তুক একপার্শ্বে সরিয়া আসিলেন; কোষাধ্যক্ষের সঙ্কেত মতে রক্ষীগণ কিঞ্চিৎ দূরে অপেক্ষা করিল। আগন্তুক ধীরে ধীরে অন্যের অশ্রুতস্বরে কহিলেন, আপাততঃ কল্যাণ হইতে আসিতেছি; সম্প্রতি মন্দিরে এক ভৈরবী আসিয়াছেন, তাঁহার অবস্থা শোচনীয়; জীবনের আশা কম! জয়া নাম্নী যে যোগিনী রোগীর সেবায় ব্যস্ত, তিনি বলিয়াছেন মুমূর্ষা শান্তিপুরের ৺শিব প্রসাদের

কন্যা। একবার আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী; জয়া আপনার মঙ্গলাভিলাষিণী। তিনি আরও বলিয়াছেন "ইংরাজের ফৌজ অচিরেই সর্দ্দারের গড় আক্রমণ করিবে, উদ্দেশ্য করোঞ্চার অপহৃতা ব্রাহ্মণকণ্যার উদ্ধার সাধন আর ঠগীকুল দলন।" সেকথা শুনিয়া কোষাধ্যক্ষ বিস্মিত ততোধিক স্তম্ভিত হইলেন। সহসা লুপ্তস্মৃতি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল; তাঁহার আপাদ-মস্তক কাঁপিতে লাগিল; পরিতাপানলে চিত্ত দগ্ধ হইল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীয় কক্ষে চলিয়া গেলেন। আর বন্দী মায়ের মন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহে নিরুদ্ধ হইলেন। বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া রক্ষীগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

ক্ষিপ্রার তীরে এক অত্যুচ্চ শাখীশিরে আরোহণ করিয়া বন্দীর অশ্বরক্ষক এ সমস্ত দেখিতেছিল। লালজী বন্দীশালায় অবরুদ্ধ হইলে অশ্বরক্ষক উর্দ্ধশ্বাসে গিয়া উদয়গিরিতে সংবাদ দিল; উদয়-গিরি হইতে সে সংবাদ কল্যাণে পৌঁছিল, অশ্ববর নদীসৈকতে তদারোহীর অপেক্ষায় বৃক্ষমূলে পূর্ব্ববৎ রক্ষিত থাকিল।

তারা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াই জানিতে পারিল কোন এক প্রগল্ভ যুবক গুপ্তচর জ্ঞানে বন্দী হইয়াছে। সেকথা শুনিয়া তারার বুঝিতে বাকী রহিল না যে 'এ যুবক কে?' "এ আনন্দের দিনে কাহাকেও নিরানন্দ করিতে নাই" ভাবিয়া তারা এক বৃদ্ধা পরিচারিকার সঙ্গে বন্দীশালায় উপস্থিত হইলেন। দ্বার অর্গলিত; অঞ্চল হইতে একগোছা চাবি বাহির করিয়া তৎসহযোগে অর্গল খুলিলে তারার নিদেশক্রমে বৃদ্ধা পরিচারিকা একটী অনুজ্জ্বল তৈলপ্রদীপ

কক্ষ মধ্যে যথাস্থানে রক্ষা করিল। বন্দী বিস্মিত ও লজ্জিত-ভাবে কহিলেন—'এ দীপের প্রয়োজন? বন্দীর পক্ষে আঁধারই শ্রেয়ঃ—আলোক লজ্জার কারণ মাত্র!

পরিচা—প্রয়োজনের কথা জানি না,—ভর্ত্তৃনিদেশ পালন করিতে বাধ্য।

বন্দী—অন্য আদেশ কিছু আছে?

পরিচা—এ ক্ষুদ্র গৃহ আপনার যোগ্য নহে—বোধ হয় আপনাকে কক্ষান্তরে যাইতে হইবে।

বন্দী ততোধিক বিস্মিতভাবে কহিলেন—বন্দীর আবার মান মর্য্যাদার বিচার কি?

"সে কথা জানি না—আমার কর্ত্তব্য এখানেই শেষ" বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল; বন্দী চিন্তাকুলচিত্তে ও উন্মনস্কভাবে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে চারিজন খোজা-শান্ত্রীসহ সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া কহিল—"আপনি বাহিরে আসুন—আপনাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে"। বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দী আদেশ পালন করিলেন। একখণ্ড কৃষ্ণ বস্ত্রে বন্দীর চক্ষুদ্বয় আবৃত হইল। সে ব্যাপারে বন্দীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; কৌতুহলের সঙ্গে সঙ্গে শিব—অশিব বিবিধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল—কিন্তু বন্দী ভীত বা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না; অন্ধের ন্যায় রক্ষীগণের অনুসরণ করিলেন। তাহার নিদেশক্রমে পরিচারিকা অগ্রে অগ্রে চলিল। নিঃশব্দে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সঙ্কেত পথে সকলে গিরিসঙ্কটে পৌঁছিল। পরিচারিকা বন্দীকে কহিল—

"আপাততঃ এ স্থান বন্দীর জন্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে"। তখনও বন্দীর নয়নদ্বয় কৃষ্ণবসনে বাঁধা; কোন্ পথে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন বন্দী কিছুই জানিতে বা দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং বন্দী নির্ব্বাক্। পরিচারিকা আবার কহিল—ভর্ত্তৃকন্যার দ্বিতীয় আদেশ—"আপনি এ আনন্দের দিনে অতিথি কিন্তু আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই; তৎচিহ্নস্বরূপ এই একটী উপহার পাঠাইয়াছেন"—বলিয়া বন্দীর হস্তে একটী কৌটা প্রদান করিল। এবার বন্দীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না—একটুকু কৌতুহলও জন্মিল। তিনি কহিলেন—"এ স্থানান্তরও বোধ হয় তোমার ভর্ত্তৃকন্যারই আদেশে"। উপস্থিত আমি বন্দী ও অবরুদ্ধদৃষ্টি। ভর্ত্তৃকন্যার উপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

পরিচা—উপহারটী ক্ষুদ্র হইলেও অসাধারণ—এই কৌটার ভিতরে হীরকাভ উজ্জ্বল মণিমণ্ডিত তাড়িৎ কবচ আছে, উহা বিষপ্রতিষেধক। পীণ্ডারী সমাজে এ কবচ দুর্লভ। ক্ষত স্থানে এই কবচ ঘর্ষণ মাত্র বিষের শক্তি নষ্ট হয়। এ অঙ্গুরীয় হস্ত ছাড়া করিবেন না।

বন্দী—"এ বহুমূল্য উপহার বন্দীর উপযুক্ত নহে" বলিয়া পরিচারিকাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ম হস্ত প্রসারণ করিলেন।

"এ উপহার বন্দীকে দেওয়ার আদেশ, ফিরিয়া লইবার হুকুম নাই। আর এ মুহূর্ত্তেই আপনার বন্দীত্ব মুক্ত হইল" বলিয়া পরিচারিকা বন্দীর চক্ষের বন্ধন মোচন করিল। বন্দী

মুক্তনয়নে সম্মুখের দিকে চাহিলেন—দেখিলেন ঘোর অন্ধকার আর বিস্তৃত পর্ব্বতমালা! সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন পরিচারিকা কি শাস্ত্রীগণের চিহ্নও নাই। এহেন অচিন্তিত ব্যবহারে লালজী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চল—নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিকে বিটপীরাজি মস্তকে করিয়া বিশাল শৈলশ্রেণী—শৈলাঙ্গ ভেদ করিয়া অপ্রশস্ত পার্ব্বত্যপথ। যুবক কৌতূহলপরবশ হইয়া ডাকিলেন—"পরিচারিকে" নেপথ্যে উত্তর হইল—"আপনি মুক্তি লাভ করিলেন—যথেচ্ছ যাইতে পারেন"।

প্রঃ—এ যে অজ্ঞাত তমসাবৃত স্থান—কোন্ পথে কোথায় যাইব কে বলিয়া দিবে?

উঃ—সম্মুখেই পথ—এ পথে কিয়দ্দূর গমন করিলেই নদীসৈকতে পৌঁছিতে পারিবেন। সেখানে শিরীষ বৃক্ষমূলে আপনার অশ্ব রক্ষিত আছে। নদীসৈকত পার হইয়া আরো কিয়দ্দূর গেলে বামদিকে দ্বিতীয় এক পার্ব্বত্যপথ মিলিবে; তাহা ধরিয়া কিছুদূর গেলেই দক্ষিণে উদয়-গিরির পথ পাইবেন।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার পশ্চাতে গিরি-সঙ্কটের দ্বার অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু তজ্জনিত অন্ধকার গাঢ় না হইয়া সে পার্ব্বত্যপথ আলোকিত হইল। লালজী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—কে একটী মশাল রাখিয়া গেল, আর সে মশালের আলোকে বনস্থলী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এ মায়াজাল দেখিয়া লালজীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ করিলেন আর কহিলেন—"এ মুক্তি

অসম্ভাবিত ও অপ্রত্যাশিত। ইহাও কল্যাণীর ইচ্ছা"। সে মশালালোকে তাড়িৎ কবচটী কৌটা হইতে উন্মুক্ত করিলেন; তদালোকে সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিমার ন্যায় সম্মুখস্থ পার্ব্বত্যপথ যেন রজত-বিধৌত হইল। তদ্দৃষ্টে লালজী স্তম্ভিত হইলেন—ভাবিলেন—"বন্দীর উপর সর্দ্দারকন্যার এত অনুগ্রহ কেন? যোগিনী বলিয়াছেন—ঠগীগণ বিষপ্রহরণে অভ্যস্ত—আর সে বিষাক্ততীর সদ্য প্রাণঘাতক! পাছে বিষাক্তপ্রহরণে এ দেহের পতন হয়—সে জন্যই বিষপ্রতিষেধক বহুমূল্য এ তাড়িৎ কবচ বা রত্নাঙ্গুরীয় দান। ইহাও ভগবানের ইচ্ছা"—যেখানে মুস্কিল সেখানেই আসান। মোহিতলাল আর কাল বিলম্ব না করিয়া সে তাড়িতালোকে পূর্ব্বোক্ত পথে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই উদয়গিরিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর তারা? বন্দীকে কারামুক্ত করিয়া "হরি আমায় কর কোলে" গাহিতে গাহিতে কল্যাণের দিকে চলিলেন।

দ্বাবিংশ কল্প।

আগন্তুকের মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে শান্তশীলের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল; এক এক করিয়া অতীত কাহিনী স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। "মুমূর্ষা ভৈরবী ৺শিবপ্রসাদের কন্যা" একথাটী মর্ম্মের স্তরে স্তরে পুনঃ পুনঃ প্রতিঘাত হইতে লাগিল। কোষাধ্যক্ষ বুঝিতে পারিলেন, এ স্বকৃত পাপের পরিণাম; ইচ্ছাকৃত ব্যাধির বিষময় ফল! সংসার সুষমা—সরলা ললনার এহেন ভীষণ পরিণাম তাঁহারই দুষ্প্রবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী প্রত্যক্ষ ফল। শোকে দুঃখে, অসহ্য বিরহ বিরাগে, মনের আবেগে কুলকামিনী গৃহত্যাগিনী, পথের কাঙ্গালিনী; শেষ নৈরাশ্যের নির্ম্মম শাসনে দারুণ পথ কষ্টে—অনশনে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু মুখে চলিয়াছে! শান্তশীলের জ্ঞানচক্ষু ফুটিল; দাবানলের ন্যায় পরিতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এক একটী করিয়া কত চিন্তা মনে আসিল, আবার লয় পাইল—কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার লাঘব হইল না। উচ্ছ্বসিত চিত্তবেগ সম্বরণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন:—

(১ম)—আমি মহাপাপী—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

বিবেক বলিয়া দিল—"একটী বার চোখের দেখা"।

(২য়)—আমি ঘোর অবিশ্বাসী—পত্নিহন্তা, সে কি আমায় দেখা দিবে?

সহসা উভয়ের সন্দর্শনে বরং বিপদেরই আশঙ্কা!

বিবেক আবার বলিয়া দিল—"ভৈরবী স্বামী সন্দর্শনা-

কাঙ্ক্ষিণী হইয়াই বাঁচিয়া আছে! স্বামীর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণই তাহার জীবন ব্রত।”

৩য়—চিন্তা—উঃ আত্মত্যাগ—আশা-বৈতরণী!

পীণ্ডারীগণ শক্তি উপাসক; সে জন্যই হউক অথবা কল্যাণ ভন্‌সলা রাজের রাজ্যাধীন বলিয়াই হউক—কল্যাণীর মন্দিরের সঙ্গে নওয়াগড়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সূত্রে শান্তশীল ও কল্যাণে পরিচিত ছিলেন। কল্যাণীর উপর তাহার ভক্তি অচলা—মায়ের পূজায় তিনি মুক্তহস্ত। উপার্জ্জিত অর্থের অনেকাংশ সময় সময় মিছিরজী কল্যাণে কাঙাল সেবায় ব্যয় করিতেন। পর্ব্বোপলক্ষেও শান্তশীলের অর্থের সদ্ব্যয় হইত। যৌবনপ্রারম্ভে কুসংসর্গে পড়িয়া একদিন শান্তশীলের অর্থাভাব ছিল; দুষ্প্রবৃত্তির বশে প্রিয়ম্বদা সুশীলা পত্নীর অঙ্গাভরণ পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ আর সে অর্থানটন নাই; আর সেই ধর্ম্মপত্নী সতীলক্ষ্মী অনাদরে অনাহারে ততোধিক পাপ পতির ব্যভিচারে ব্যথিত হইয়া উন্মাদিনী বেশে ছুটিয়া আসিয়াছে। এ মর্ম্মঘাতী চিন্তায় শান্তশীলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; পাষাণে পীযুষ-প্রবাহ ছুটিল—একবার চোখের দেখার জন্য প্রাণ অস্থির হইল। মনের বেগ সম্বরণ করা অসম্ভব হইল; তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া বেগবান প্রবাহের ন্যায় কল্যাণাভিমুখে ছুটিলেন। কক্ষমধ্যে তৈজস পত্র সমস্ত অযত্নরক্ষিত—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিল; সে দিকে ভ্রুক্ষেপ ও করিলেন না।

এদিকে মোহিতলাল উদয়গিরিতে পৌঁছিয়া দেখিলেন,

বিষম বিভ্রাট! নওয়াগড়ে যে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন, সে সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে; মেজর সাহেব অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সৈন্যগণ গমনোদ্যত—স্বয়ং মেজর সাহেব সমরসাজে সজ্জিত হইয়া শিবিরদ্বারে অশ্বের অপেক্ষা করিতেছেন। ইত্যবসরে মোহিতলাল ছাউনীতে পৌঁছিলেন; তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে সশরীরে প্রত্যাগত দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। মেজর সাহেব আনন্দে সাদরে লালজীর কর ধারণ করিয়া স্বাগত জানাইলে লালজী যথোচিত অভিবাদনপূর্ব্বক গড় প্রবেশাবধি সাঙ্কেতিক পথে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। কেবল ক্ষিপ্রাসৈকতে যোগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচারিকা প্রদত্ত বহুমূল্য তাড়িদঙ্গুরীয়ের কথা অপ্রকাশিত রহিল। মোহিতলাল ইহাও জানাইলেন যে নওয়াগড় সুরক্ষিত; পীণ্ডারীগণ তীর ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। সে তীর বিষাক্ত ও তাহাদের সন্ধান অব্যর্থ! পর্ব্বত কন্দরে উচ্চ শিলাখণ্ডের অন্তরালে থাকিয়া ঠগীগণ তীরক্ষেপ করে—প্রচুর বলবিক্ষিপ্ত সে তীর গোলন্দাজের গোলায় ব্যর্থ হওয়ার আশা বিরল। সুতরাং এ পীণ্ডারী যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। তাহা শুনিয়া মেজর সাহেব উদ্বিগ্ন হইলেন; মনে মনে কি চিন্তা করিলেন—চিন্তাকুল হৃদয়ে কহিলেন—লালজি, গোলা গুলি ই আমাদের সম্বল—এখন উপায়?

লাল—উপায় কল্যাণ সম্প্রদায়। তীর ব্যর্থকর—বিষ-প্রতিষেধক মন্ত্র সম্ভবতঃ তাঁহারা জানেন; "তবে এখনি সে ব্যবস্থায়

কল্যাণে গমন করুন; উপযুক্ত প্রহরণ ব্যতীত যুদ্ধা-য়োজন আত্মনাশের কারণ মাত্র”—বলিয়া মেজর সাহেব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন; তাহার অর্থ ‘দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রহিল’। আদেশ পাইয়া লালজী কল্যাণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অন্যদিকে শান্তশীল নৌকাযোগে নির্ঝরিণী পার হইয়া পার্ব্বত্যপথে কল্যাণে পৌঁছিলেন। তখন নিশা অবসানপ্রায়; মন্দিরদ্বারে নহবতে ললিতরাগে প্রভাতী বাদ্য বাজিয়া উঠিল; সাধকগণ ব্রহ্ম মূহুর্ত্তে মায়ের স্তোত্র পাঠে ব্যস্ত হইলেন। সেবাইতগণ প্রভাতী আরতির আয়োজনে ব্যস্ত হইল। তরুণ তপনকর—মন্দিরের অত্যুচ্চ সৌধচূড়ায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আরতি আরম্ভ হওয়া আবশ্যক—এটী বৈদিক প্রথা। সুতরাং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আরতি আরম্ভ হইল। কৃষ্ণা-জীনাসীন মন্দিরস্বামী স্তোত্র পাঠান্তে অবসর হইলে শান্তশীল অগ্রসর হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মন্দিরস্বামী প্রণতকে “কুরু কল্যাণি কল্যাণ জীবে” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—“কে মিছিরজি—কুশল ত?” শান্তশীল চিন্তাকুলমনে কাতর বচনে কহিলেন, “কুশল অকুশল সকলই কল্যাণীর ইচ্ছা।”

তখন সূর্য্যালোক মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে। মন্দিরস্বামী বৃদ্ধ-যোগসিদ্ধ ব্রাহ্মণ; দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতা ততটা হয় নাই; সে নবীন তপন করে তিনি

দেখিলেন—মিছির জীর সুপ্রসন্ন মুখকান্তি বিষাদে মলিন, কপোল কুঞ্চিত, নয়নের দৃষ্টি আকুলিত ও কৌতুহলাক্রান্ত—যেন কি খুঁজিতেছেন। সে হেন অশান্তির ভাব ও ব্যাকুলতা দৃষ্টে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন—সম্প্রতি কোন ঘোর বিপদাশঙ্কায় মিছিরজীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ ফৌজের আগমনই হয় ত এ ব্যাকুলতার কারণ। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গুরুজী কহিলেন—"ঠগী দলন আর অপহৃত ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার সাধনই ইংরাজের প্রধান উদ্দেশ্য। এ অতি সাধু সঙ্কল্প; পাষণ্ড পীণ্ডারী যোগী সন্ন্যাসীর সাধন পথে বিষম কণ্টক"। মন্দিরস্বামী কল্যাণে গুরুজী বলিয়া অভিহিত।

শান্তশীল পূর্ব্ববৎ কাতরকণ্ঠে কহিলেন—গুরুজি, ইংরাজ ফৌজের ভয়ে এ দাস কাতর নহে—কিন্তু——" শান্তশীলের আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। মর্ম্মজ্বালায় কণ্ঠরোধ হইল, মনের কথা আর মুখে ফুটিল না। এবার গুরুজী বুঝিলেন মিছিরজীর চিত্তদাহের কারণ গুরুতর; মৃদুলমলয়সমীরে সাগর উদ্বেলিত হয় না, বজ্রশূন্য জীমূত হুঙ্কারে বিশাল বিটপী বিদীর্ণ হয় না! গুরুজী অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, মিছিরজি, মনের কথা প্রকাশ না করিলে হৃদয়ের ভার লঘু হয় না; এখানে ভয় বা লজ্জা করিতে নাই। অকুতোভয়ে ও অম্লানচিত্তে প্রাণের ব্যথা সর্ব্বমঙ্গলার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই শান্তি পাওয়া যায়"।

শান্ত—গুরুজি—লোক ও ধর্ম্ম ভয় অনেক কাল ক্ষিপ্রার তীব্র প্রবাহে বিসর্জ্জন করিয়াছি; যেদিন স্বদেশ-স্বজন

পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলধর্ম্ম ভুলিয়া পামর পীণ্ডারীর দলভুক্ত হইয়াছি, সেদিন হইতেই প্রাণের মায়া ততোধিক প্রিয় জাতীয় গৌরব গোদাবরীর অতল জলে ডুবিয়াছে—জানি না—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বলিয়া ইতিপূর্ব্বে শ্রুত নবাগতা ভৈরবী বিষয়ক ঘটনা সরলভাবে বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া গুরুজী একান্ত বিস্মিত হইলেন, ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক একবার মিছিরজীর মুখপানে তাকাইয়া বুঝিতে পারিলেন, সে বদনমণ্ডলে কি ভীষণ প্রলয় বহিতেছে; শালতরুবৎ বিশাল বলিষ্ঠদেহ—থরথর কাঁপিতেছে, ইচ্ছাকৃত পাপের ভীষণ পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া পরিতাপে দগ্ধ হইতেছে। গুরুজী বিশদরূপে বুঝিতে পারিলেন—এ পরিবর্ত্তনজনিত অকপট চিত্তবিকার, দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি জনিত আত্মগ্লানির হাহাকার! এ সময়ে প্রতিকূলাচরণ কিম্বা উদ্যম ভঙ্গ করিলে বিপরীত ফলেরই আশঙ্কা! কল্যাণীর ইচ্ছায় পাপীর হৃদয়ে অনুতাপ পবন বহিলে তৎপ্রতিরোধ অসঙ্গত। সুতরাং গুরুজী মধুর আশ্বাসবাক্যে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "পীড়িতা ভৈরবী বোধ হয় আপনারই পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী; কল্যাণীর ইচ্ছায় এখন আর জীবনের আশঙ্কা নাই; রোগের প্রকোপ কমিয়াছে, এখন ক্রমে প্রকৃতিস্থা হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। অস্মার একমাত্র কার্য্য রোগীর সেবা শুশ্রূষা, তাহার পরম যত্নে রুগ্না প্রফুল্লই আছেন।

শান্ত—গুরুদেব—এ পাপাধম কি জয়ার কার্য্যে সহায়তা করার যোগ্য নহে?

গুরু—প্রকৃতপক্ষে ভৈরবী আপনার পত্নী হইলে এ কার্য্যে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার; কিন্তু ইহাতে দুটী বাধা:—

১ম—যোগিনী মহলে সাধু সন্ন্যাসীদেরও প্রবেশ নিষেধ।

২য়—এখন রোগের পরিবর্ত্তনের সময়; সহসা উভয়ের পরিচয়ে ও সন্দর্শনে হর্ষে বিষাদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

শান্ত—আশা বৈতরিণী! বুঝিলাম পাপ পরিপ্লুত হৃদয়ের এ দুরাকাঙ্ক্ষা, ভগবৎবৎসলা সরলাদর্শনাশা দুরাশা মাত্র; কিন্তু উন্মত্ত মন যে মানিতেছে না! সুদীর্ঘ-কালের বিচ্ছেদ জনিত উভয়ের দৈহিক পরিবর্ত্তন সম্ভবতঃ এত অধিক যে অজ্ঞাত দর্শনে একে অন্যকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে না। এ আত্ম পরিচয়ের সময় নহে, পরিচয় দিবারও ইচ্ছা নাই; একবার দূর হইতে সে মুখখানি দেখিবমাত্র, এ পাপমুখ দেখাইবার সাধ আর নাই!

প্রাবৃটের ধারা যেমন সহজে থামেনা, সাগরগামিনী পর্ব্বত-প্রবাহিনী যেমন বাধা বিঘ্ন মানে না, মিছিরজীর মনের বাসনা—দর্শনেচ্ছা—অতি প্রবলা, কৌশলে বা বাক্‌চাতুর্য্যে সে উদ্‌ভ্রান্ত বাসনার বিরতি হবে না। গুরুজী ভাবিলেন উচ্ছ্বসিত অভিলাষ পূর্ণ হওয়াই সঙ্গত। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, মিছিরজি, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া কল্যাণীর ইচ্ছা" বলিয়া মিছিরজীকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত

করিলেন। মিছিরজী কম্পিতকলেবরে গুরুজীর অনুগমন করিলেন; উভয়ে জয়ার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলে গুরুজী ডাকিলেন—জয়ে! সহসা গুরুজীর স্বর শুনিয়া সত্রস্তে জয়া বাহিরে আসিয়া সসম্ভ্রমে গুরুজীকে অভিবাদন করিলে—গুরুজী সঙ্গীকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইনি নওয়াগড়ের কোষাধ্যক্ষ; ইহার মাতৃভক্তি ও মাতৃপূজায় মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই। ইনি বলিতেছেন—নবাগতা পীড়িতা ভৈরবী সম্ভবতঃ ৺শিবপ্রসাদের কন্যা ও ইহার পরিণীতা পত্নী—একবার ভৈরবীকে দেখিতে চাহেন; মিছিরজীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে বোধ হয় কোন বাধা নাই" বলিয়া গুরুজী জয়ার মুখপানে চাহিলেন। জয়া বিনয় বচনে কহিলেন, মিছিরজী যাহা বলিতেছেন—তাহার সত্যতানুসন্ধানের সময় এখন নহে; ভবদীয় আদেশে ভৈরবীকে দেখিবার কোন বাধা নাই—কিন্তু রোগী এখন ঘুমাইতেছেন, নিদ্রাই রোগের শান্তি—সে সুখ শান্তি ভঙ্গ করার ফল বিপরীত হইতে পারে। "দূর হইতে একবার দেখিলে বোধ হয় নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না" বলিয়া গুরুজী মন্দিরে চলিয়া গেলেন। জয়ার সঙ্কেতমতে মিছিরজী নিঃশব্দে অতি সাবধানে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগীর রোগ-শোক-শীর্ণ জড়াজীর্ণ বিশুষ্ক মুখখানি দেখিয়া অশ্রুজল সম্বরণ অসম্ভব হইল। ক্ষণকাল রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া রোগশয্যা সিক্ত করিলেন, আর মনে মনে কহিলেন—হায়! হায়! সেই সংসার সুষমা—স্বর্ণ-প্রতিমার কি এই পরিণাম"?

নিশা অবসান হইয়াছে,- পাখীগণের কলরবে উপবন বিলোড়িত হইতেছে। গন্ধ বহিয়া মন্দ পবন চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। আজ কুলগ্যাণে মাহেন্দ্রক্ষণ—আজ ভৈরবীর সাধনা সফল! ভৈরবী আজ প্রাণে শান্তি পাইয়া তখনও ঘুমাতেছিলেন। সুতরাং আগন্তুকের আগমন জানিতে পারিলেন না। ভৈরবীকে দেখিয়া মিছিরজীর চিত্ত প্রসন্ন না হইয়া পরিতাপ ও আত্মগ্লানি বরং বৃদ্ধি পাইল; আর সে দৃশ্য সহ্য হইল না,—আর সে মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না,—আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাহার হৃদয়কন্দরে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল; সে পাপানলের উত্তাপে পাছে সে পবিত্র প্রতিমা মলিন হয়—এই ভয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। জয়া পূর্ব্বেই জানিতেন, গোসাঞীর মুখে শুনিয়াছেন মিছিরজী কে। সুতরাং একবার তাহার মুখে পরিচয় পাইবার জন্য জয়ার কৌতুহল বাড়িল; তিনিও বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে কহিলেন—"আজ ভৈরবীকে দেখার সাধ কেন হইল,—এ আপনার কে?

মর্ম্মস্পর্শী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া শান্তশীল কহিলেন,—দেবি, আমি নিতান্ত অমানুষ—পাষণ্ড; আত্ম পরিচয় দেওয়া অথবা ভৈরবী আমার পরিচিতা আত্মীয়া একথা বলিবার উপযুক্ত আমি নহি। মুখ খানি দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারিলাম—ভৈরবী সত্য সত্যই শান্তিপুর নিবাসী ৺শিবপ্রসাদের কন্যা—নাম বিন্দুবাসিনী।

জয়া—বিন্দু কি বিসর্গ জানি না—তবে নামটী ঐ ধরণেরই বটে।

শান্ত—পিতৃকুল সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?

জয়া—সে কথা জানি না ; তবে ভৈরবী একদিন বলিয়াছিলেন তাঁহার পিতৃদেব একজন সুব্রাহ্মণ ও উচ্চ দরের পণ্ডিত ছিলেন। একজন অশিক্ষিত ও অসচ্চরিত্র কুলীন ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে ভৈরবীর বিবাহ হইয়াছিল। কুক্রিয়াসক্ত প্রগল্‌ভ যুবক অর্থাভাবে পীণ্ডারী দলভুক্ত হইয়াছে ; তাহার নাম জয়নন্দন মিশ্র—সে নামে কোন পামর পীণ্ডারীদলে আছেন কি ?

একথা শুনিয়া শান্তশীলের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিল—তাহার হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত হইল ; অতি কাতর ভাবে মর্ম্মপীড়িত স্বরে কহিলেন,—"আপনি ভৈরবীর প্রাণদাত্রী ; আপনার অসীম যত্নে ও অধ্যবসায়ে অচিরেই রুগ্না সুস্থ ও সবল হইবেন। আপনার কার্য্য অমানুষিক—আপনি মানবী বেশে দেবী ; আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিব না। গোপন করিলে লাভের অংশে অন্তর্জ্বালা—গাত্রদাহ! "নওয়াগড়ের কোষাধ্যক্ষ শান্তশীলই সেই পামর জয়নন্দন মিশ্র—আর ভৈরবী বেশে সতী সিমন্তিনীর পাষণ্ড স্বামী" বলিতে বলিতে শান্তশীলের কণ্ঠরোধ হইল ; বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলশায়ী হইল। জয়া দেখিলেন—সে দেহ নিস্পন্দ! নিঃসঞ্জ! সেই অজ্ঞানাবস্থায় শান্তশীল বলিয়া উঠিলেন—"মায়ের ইচ্ছা চক্ষের দেখা মাত্র—বিন্দু ভৈরবী—বিন্দু দেবী—দেবদেবীর দর্শন লাভেই মুক্তি"! আবার কহিলেন "উঃ—স্বর্ণদেহে ভস্মাচ্ছাদন—বিন্দু আমার সেবা চায় না—আমি তাহার কে? আমি বিন্দুর চক্ষে মহাপাপী—আমি

তাহার কেহ নহি ; কিন্তু সে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ! আঁধার-হৃদয়ে আলোকের রেখা—তাহার যোগবল আমার শেষ সম্বল”।

জয়ার যত্নে অনতিবিলম্বেই শান্তশীলের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল ; ক্ষণকাল উভয়ে নীরব ; সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শান্তশীল আবার কহিলেন “যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে শেষ প্রমাণ স্বরূপ এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন” বলিয়া অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরী উন্মুক্ত করিয়া জয়ার হস্তে দিলেন ; জয়া সাবধানে অঙ্গুরীয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উহাতে বিন্দুর নাম লেখা রহিয়াছে। তদ্দর্শনে জয়ার আহ্লাদের সীমা রহিল না, কৌশলে হৃদয়োচ্ছ্বাস গোপন করিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, “অঙ্গুরীয়কের বিষয় আপনার পত্নী কিছু অবগত আছেন কি ?

শান্ত—বিলক্ষণ জানেন ইহাতে তাহার নাম লেখা আছে ; এই অঙ্গুরীয় আমাকে দিয়া বলিয়াছিল—“এই আমার শেষ আভরণ”। সে কথা এ দগ্ধ হৃদয়ে এখনও জাগিতেছে।

জয়া—এ নিদর্শনে ভৈরবীর প্রতীতি না জন্মিলে এ অঙ্গুরীয় পুনঃ আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শান্ত—প্রতিশ্রুত হইলাম, তাই হবে। আর তন্মুহূর্ত্তেই উহা তবে ক্ষিপ্রার তীব্র তরঙ্গে নিক্ষেপ করিব।

সুচতুরা জয়া সহজে ছাড়িবার নহেন ; তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রকৃত পরিচয় কল্যাণে কেহ জানেন কি ?

শান্ত—গোসাঞীজী সম্ভবতঃ জানেন।

জয়া—গোসাঞী কে ?

এবার শান্তশীলের লজ্জা আসিল ; হৃদয়ের ভারও যেন একটু কমিল। তিনি কাতর বচনে কহিলেন, "কল্যাণীর ইচ্ছায় আজ দিব্য চক্ষু পাইয়াছি ; অতীত স্মৃতি একে একে যেন হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে ; অন্তরের অন্তরতম স্থান হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে—"গোসাঞী করোঞ্চার প্রেমানন্দ ভট্ট, ৺শিব প্রসাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দুমণির স্বামী !

জয়া—তারা কে ?

শান্ত—অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যা—সর্দ্দারজীর প্রতিপালিতা বনবালা !

জয়া—বিনাযুদ্ধে -বিনারক্তপাতে কি তারার উদ্ধার সম্ভবপর নহে ?

শান্ত—সম্পূর্ণ অসম্ভব ! তারা নওয়াগড়ের সর্ব্বস্ব, জীবনের ধ্রুবতারা ! সর্দ্দারজী নির্ভীক ও অভিমানী ; দেহে প্রাণ থাকিতে শত্রুর হস্তে তারা সমর্পণ করিবেন না। যতক্ষণ নওয়াগড়ের অস্তিত্ব থাকিবে, ততক্ষণ তারাকে হস্তগত করা সুকঠিন। তারার গতিবিধি অনিশ্চিত—তাহার কার্য্য অমানুষিক। শৈলশিখরে ভ্রমণ ও বনে বনে বিচরণ ; আর্ত্তের সেবায় ব্যস্ত, বিপন্নের বিপদ নিবারণে মুক্ত হস্ত ! এ সকল তারার নিত্যকার্য্য ! তারা বয়সে বালিকা কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধহস্তা অম্বিকা !

জয়া—গত রাত্রিতে নওয়াগড়ে যিনি বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহার কি দণ্ডাদেশ হইয়াছে জানেন ?

শান্ত—কোষাধ্যক্ষের আদেশে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন—বোধ হয় এতক্ষণে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন ?

জয়া—বন্দীকে মুক্তি দেয় কার সাধ্য ?

শান্ত—তারার অনুগ্রহে নওয়াগড়ে বন্দীর স্থান নাই! তারার সকল কার্য্যই মায়ার খেলা!

জয়া—তারা শত্রুকে এত অনুগ্রহ কেন করিবে ?

শান্ত—শত্রু মিত্র—আপন পর ভেদ জ্ঞান তারার নাই। তারা জানে মানুষ মাত্রই একই রক্তমাংসে গঠিত—সকলেই মায়ের সন্তান! সুখ দুঃখ—কষ্ট বেদনা জ্ঞান সকলেরই সমান!

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল সে সময়ে প্রফুল্লচিত্তে গোসাঞী পুনঃ জয়ার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অন্য দিন সহসা গোসাঞীকে দেখিয়া শান্তশীল যেমন সঙ্কুচিত ও অপ্রতিভ হইতেন, আত্মগোপনের জন্য ব্যস্ত হইতেন, আজ আর তাহার সে ভাব নাই,—সে লজ্জা নাই;—আজ শান্তশীল কল্যাণীর সেবক সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে এবং অবশিষ্ট জীবন দেবব্রতে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত; সে আশায় পাপীর হৃদয়ে বল আসিল; শান্তশীল নিঃশঙ্কে ও শিষ্টভাবে গোসাঞীর পদধূলি লইলেন। গোসাঞী বিস্মিত, ততোধিক কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া কহিলেন "মিছিরজি—অসময়ে এখানে কেন?"

তদুত্তরে জয়া স্বামীজীর আদেশ ও ভৈরবী দর্শনের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া গোসাঞী আহ্লাদ সহকারে কহিলেন "সকলই কল্যাণীর ইচ্ছা; কুরু কল্যাণি কল্যাণ জীবে"।

জয়া—লালজীর সংবাদ কি ?

গোসাঞী—সে কথাই বলিতে আসিয়াছি; এইমাত্র সংবাদ

পাইলাম, লালজী স্বচ্ছন্দে ছাউনীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেও বোধ হয় মিছিরজীরই অনুগ্রহে।

মিছিরজী লজ্জিত হইয়া কহিলেন, বন্দীত্বই আমার কার্য্য কিন্তু মুক্তিদান আমার সাধ্যাতীত; সে কার্য্যে তারার হাত।

গোসাঞী—ঠগীদমন আর অপহৃত ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার সাধনই ইংরাজ ফৌজের উদ্দেশ্য; পামর ঠগীগণের দৌরাত্ম্যে যোগী সন্ন্যাসীর যোগ সাধনেও শান্তি নাই।

শান্ত—সে পথ সর্ব্বাগ্রে নিষ্কণ্টক হওয়া আবশ্যক; যুদ্ধ অনিবার্য্য কিন্তু ফল অনিশ্চিত। স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও অবশ্যম্ভাবী।

গোসাঞী—প্রায়শ্চিত্ত কি ?

শান্ত—মৃত্যু !

গোসাঞী বুঝিতে পারিলেন, শান্তশীল মরিতে প্রস্তুত। তারা কক্ষাভ্যন্তরে থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, অবসর বুঝিয়া তিনিও আসিয়া জয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন; স্বভাবসুলভ সরল ও মধুর বাক্যে কহিলেন "মাসি—মিছিরজী তোমাদের কে? নওয়াগড়ের ইষ্টানিষ্ট ইহাঁরই হাতে"। শান্তশীল আর অপেক্ষা না করিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে বিদায় হইলেন। অতঃপর গোসাঞী জয়াকে জনান্তিকে কহিলেন—পীড়িতার পক্ষে এ সংবাদ তত শুভকর হইবে না—সুতরাং এখন তাহাকে কিছু না বলাই সঙ্গত। তদনন্তর তারাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—তারা সত্যইকি বন্দীকে তুমি মুক্তিদান করিয়াছ? তারা ঈষৎ লজ্জিত—ঈষৎ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আনন্দের

দিনে কাহাকেও নিরানন্দ করা মায়ের ইচ্ছা নহে; বন্দী সম্ভবতঃ গুপ্তচর—পীণ্ডারীর শত্রু”।

গোসাঞী—তোমার অনুমান সত্য—সে যুবাপুরুষ বীরবর ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ! তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে তারার ইষ্টানিষ্ট সংসৃষ্ট!

তারা হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরজি—তারার ইষ্টানিষ্টও তারার হাতে! ইচ্ছা করিয়া ধরা না দিলে তারাকে ধরে কার সাধ্য!

একথা শুনিয়া গোসাঞী একটুকু স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্য হইলেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, সে কি তারা! তোমার উদ্ধার সাধনই বর্ত্তমান যুদ্ধায়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য!

তারা—পীণ্ডারীর তীর বিষাক্ত, আর তাহাদের সন্ধানও অব্যর্থ! যুদ্ধে পীণ্ডারীর পরাজয় হইলে আমাদের অদৃষ্টে যে কি আছে কল্যাণীই জানেন!

এতদুত্তরে জয়া কহিলেন—“কল্যাণীর ইচ্ছায় তোমার অকল্যাণের আশঙ্কা নাই; মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল করিবেন।

তারা—মঙ্গল কি হবে বুঝিনা; নওয়াগড় ইংরাজাধিকৃত হইলে আমি কোথায় যাব, আমাকে কে আশ্রয় দিবে?

জয়া—কেন, তুমি আমার কাছে থাকিবে—আমি তোমার পিতার সন্ধান বলিয়া দিব; তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা, সুব্রাহ্মণের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব।

লজ্জায় তারার মুখে আর কথা ফুটিল না। কথায় কথায় বেলা বাড়িতেছিল ; ততক্ষণে ভৈরবীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্ষীণ দুর্ব্বল স্বরে ভৈরবী ডাকিলেন—"জয়ে"? তাড়াতাড়ি জয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোসাঞী আপন কুটীরে চলিয়া গেলেন এবং তারা নওয়াগড়ে ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রয়োবিংশ কল্প।

কার্ত্তিকী কৃষ্ণা অমাবস্যার নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই উদয়গিরিতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; মেজর সাহেবের শিবিরে মন্ত্রণা সভা বসিল; কল্যাণসম্প্রদায় সাদরে সে সভায় আহূত হইলেন। বহুক্ষণ আন্দোলনের পর স্থিরীকৃত হইল—ভ্ সলা-রাজ পীণ্ডারীর পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা যায় না। প্রত্যুতঃ তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হওয়া আবশ্যক; ভন্‌সলারাজ বিপক্ষতাচরণ করিলে ঠগীদমন দুরূহ হইবে; দেওঘর আক্রমণের সংবাদ পাইলে ভন্‌সলারাজকে সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে হইবে, আর চিতু সর্দ্দারকে সাহায্য করিবার অবকাশ পাইবেন না। সুতরাং চিতুসর্দ্দারকে আত্মবলের উপর ই নির্ভর করিতে হইবে। সে অবস্থায় ঠগীদমন অনেক সহজ হইবে। অতএব স্থির হইল যে যুগপৎ দেওঘর ও নওয়াগড় আক্রমণ করাই সঙ্গত। এক দল সৈন্যসহ স্বয়ং মেজর সাহেব দেওঘরে যাইবেন, অন্য এক দল সহ শ্রীমান মোহিতলাল নওয়াগড় আক্রমণ করিবেন। কল্যাণ-সম্প্রদায় শেষোক্ত দলের পৃষ্ঠপোষক হইবেন। প্রত্যেক দলে সাতটী করিয়া তোপ থাকিবে। গিরিসঙ্কটে তোপের কার্য্য-কারিতা যথেষ্ট।

রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণও সমরসাজে সজ্জিত হইল। কটীতটে অসিকোষে অসি নাচিয়া উঠিল; একদিকে স্বয়ং মেজর সাহেব অন্যদিকে মোহিতলাল দুন্দুভি বাজাইলেন;

সঙ্কেত বাদ্য শ্রবণে সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিকে দাঁড়াইল। কল্যাণসম্প্রদায়ের উপদেশ মত মাহেন্দ্রক্ষণে উভয় দল যাত্রা করিলেন। মেজর সাহেব একদলের অগ্রণী হইয়া দেওঘরের দিকে, মোহিতলাল প্রমুখ অন্যদল নওয়াগড়াভিমুখে চলিলেন। যাত্রাকালে কল্যাণসম্প্রদায় সমস্বরে জয়ধ্বনি করিলেন—"কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে"। তারার উদ্ধারার্থ গোসাঞীজী মোহিতলালের দলে যোগ দিলেন। যথাসময়ে উভয়দল যাত্রা করিল। মোহিতলাল নওয়াগড়ের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তড়িৎবেগে একটী যোগিনী আসিয়া গোসাঞীর কাণে কাণে বলিয়া দিলেন—"ঠাকুরজি! দেখিবেন এ যুদ্ধে শান্তশীলের যেন কোনরূপ অমঙ্গল না হয়; সম্ভবতঃ তিনি মুক্তহস্তে অসি চালাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না"। মোহিতলাল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সহসা সে যোগিনীর আবির্ভাব ও গোসাঞীর সঙ্গে জনান্তিকে মন্ত্রণা করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে ভাবনা দূর হইল; তিনি দেখিয়া চিনিলেন যোগিনী স্বয়ং জয়া। গোসাঞী ও অগ্রবর্ত্তী হইয়া লালজীকে জয়ার অনুরোধ জানাইলেন। মেজর সাহেব সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন বলিয়া যোগিনীকে দেখিতে পান নাই।

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উভয় সৈন্যদল কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক দুরারোহ শৈল সঙ্কটে পৌঁছিল; অতি সাবধানে সে শৈলশ্রেণী পার হইয়া এক উপত্যকা ছাড়াইয়া দ্বিতীয় এক

গিরিসঙ্কটে পৌঁছিল; সেখানে শৈলমালা দ্বিবাহিনী, দুই দিকে দুইটি সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথ; সেই দুই পথে দুই দল নির্দ্দিষ্ট স্থানোদ্দেশে চলিল। বেলাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মেজর সাহেবপ্রমুখ সৈন্যদল দেওঘরের রমণীয় উপত্যকায় পৌঁছিল; চতুর্দ্দিকে শৈলমালা বিকম্পিত করিয়া তোপ ছুটিল; তুমুল রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; প্রতিধ্বনি রাজনিকেতনে ভীম আঘাত করিল, সে আঘাতে মন্ত্রণাগৃহে রঘুজী ভন্‌সলার আসন টলিল। সত্রস্তে সভয়ে রঘুজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাণীর শরণাগত হইলেন। রাণী যশোদা বাই সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমতী। রাজ্যের শুভাশুভের উপর দৃষ্টি রাখিয়া রাণী কহিলেন—"মহারাজ, ঠগীদলনই ইংরাজরাজের মূখ্য উদ্দেশ্য। ঠগীর দৌরাত্ম্যে সর্ব্বত্র উচ্ছৃঙ্খল; লোকের ধন প্রাণ বাঁচান ভার। দেশ ছারখার হওয়ার উপক্রম। এতদবস্থায় ইংরাজের সাহায্য করাই সঙ্গত; বিশেষতঃ ইংরাজ ক্রমে ক্রমে ভারতে একছত্র রাজা হইতে চলিয়াছেন; আজ ঠগীর পক্ষাবলম্বন করিলে কালই যুদ্ধ বাধিবে। ঠগী ঘোর পামর, হিংস্রক বন্যজন্তু অপেক্ষাও ভীষণতর; তাহারা ক্ষমার পাত্র নহে। পাপিষ্ঠেরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকন্যা হরণ করিয়া হিন্দুর প্রাণে ব্যথা দিয়াছে; দুরাত্মাদের হাতে গৃহত্যাগী যতী তপস্বীরও নিস্তার নাই; ধর্ম্মভীরু হিন্দুর প্রাণে এ দৃশ্য অসহ্য। সুতরাং যত শীঘ্র ঠগীকুল নির্ম্মূল হয়, ততই মঙ্গল"।

রঘুজী—চিতু ভন্‌সলা রাজ্যে জনৈক সর্দ্দার প্রধান; ঠগীদলপতি হইলেও রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী; তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ

রাজ্যের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং চিতু সর্দ্দারের বিরুদ্ধাচরণ কি ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয় ?

রাণী—চিতু সর্দ্দার সাধ করিয়াই এ বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে ; ইংরাজের হস্তে আত্ম সমর্পণ ও ব্রাহ্মণকন্যাকে প্রত্যর্পণ করিলেই সকল দিক রক্ষা পাইত। পীণ্ডারীর পাপে রাট রাজ্য টলমল্।

রঘুজী—সত্য বটে—কিন্তু যুদ্ধবিমুখ হইলেই যে ভন্‌সলা রাজ্যের মঙ্গল হইবে—কে জানে ?

রাণী—রীতিমত যুদ্ধ করা বোধ হয় ইংরাজের ইচ্ছা নহে ; পাছে দেওঘর হইতে চিতুর সাহায্যার্থ সৈন্যবল প্রেরিত হয়, সেই আশঙ্কায় মেজর সাহেবের দেওঘরে আগমন। এক্ষেত্রে সাদরে মেজর সাহেবকে সম্মান করাই সঙ্গত। বন্ধুত্ব স্থাপনে ইংরাজ বুঝিবেন—ভন্‌সলা রাজ ঠগীর পৃষ্ঠপোষক নহেন—পক্ষান্তরে এ ব্যবহারে ঠগীসর্দ্দারেরও সুবিধা হইতে পারে। একদল সৈন্য দেওঘরে থাকিলে অন্য দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তত কঠোর হইবে না।

এ কথায় রঘুজীর চক্ষু ফুটিল ; রাণীর মন্ত্রণা সঙ্গত বলিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মেজর সাহেবের অভ্যর্থনার্থ একদল সৈন্য শিবিরে প্রেরণ করিলেন ও আতিথ্যগ্রহণ জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে মেজর সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন, "ভন্‌সলা রাজের সৌজন্যতায় সুখী হইলাম। ইংরাজ তাঁহাকে মিত্র রাজ বলিয়াই জানেন এবং সে মিত্রতা সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ রাখাই সঙ্গত"।

রাণীর সুমন্ত্রণা সিদ্ধ হইল। মেজর সাহেবের সাধু উক্তি শুনিয়া রঘুজীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অগৌণে প্রচুর পরিমাণে রসদ প্রেরিত হইল। অপ্রত্যাশিত চব্য-চুষ্য লেহ্য পেয় পাইয়া পরিশ্রান্ত সৈনিকগণের পথক্লান্তি দূর হইল; সকলে হাঁপ ছাড়িয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার অবসর পাইল। নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে তিন দিন দৃশ্যপট সদৃশ দেওঘরের রম্য উপত্যকায় প্রবাস করিয়া চতুর্থ দিবসে দলবলসহ মেজর সাহেব উদয়গিরিতে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর মোহিতলাল? স্বীয় সৈন্যগণসহ নওয়াগড়ের অনতি-দূরে শৈলমূলে ক্ষিপ্রাকূলে এক সমতল ক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সন্ধ্যাগমে সে পার্ব্বত্যপথ ঘোর তিমিরাবৃত ও দুরারোহ হইল। লালজী আদেশ করিলেন—"এ রাত্রিতে এখানেই বিশ্রাম করিব—এ পার্ব্বত্য প্রদেশ নিরাপদ নহে; সকলেই যেন সশস্ত্র থাকে; প্রত্যুষেই গড় আক্রমণ করিতে হইবে"।

এই বলিয়া মোহিতলাল সূর্য্যাস্তশোভা সন্দর্শনার্থ এক উচ্চ শৈলশিখরে আরোহণ করিলেন। সন্ধ্যাগমে সে শৈলশোভা অতি মনোহর। তপনদেব যেন তিমিরবসনা সন্ধ্যাসুন্দরীর অঞ্চলাবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ক্ষিপ্রার স্বচ্ছ সলিলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন; রবির চরণস্পর্শে ক্ষিপ্রার তরঙ্গমালা রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সহসা যেন শৈলশিখর হইতে শোণিতপ্রবাহ ছুটিয়া আসিয়া নির্ঝরিণীর জলে মিশিয়া গেল। প্রদোষ-অম্বরে

সদ্য বিকশিত নক্ষত্রমালা লোহিততরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হইয়া উজ্জ্বলে মধুর রূপ ধারণ করিল। তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গাকুলা তারার মালা দেখিয়া লালজীর মনে পড়িল, নওয়াগড়ের তারা—করোঞ্জার সেই ব্রাহ্মণ কন্যা! সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—যোগিনী বেশে সেই শরদিন্দুনিভ সুন্দর মুখখানি—আর সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ আকর্ণ-লম্বিত চক্ষের সরল চাহনি! মনে ভাবিলেন—সে বেশে সে রূপ এ তরঙ্গ শোভা হইতে ও উজ্জ্বলে মধুর! সে মোহন মধুর মূর্ত্তি আবার দেখিতে পাইব কি?

মোহিতলাল এক বৃহৎ শিলাখণ্ডোপরি বক্ষ স্থাপন করিয়া আনতবদনে অতৃপ্তলোচনে নির্ঝরিণীর তরঙ্গ শোভা দেখিতে-ছিলেন, সহসা কে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। মোহিতলাল শিহরিয়া উঠিলেন; পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ততোধিক বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন—এক অলৌকিক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টি অস্পন্দ ও কৌতুহলময়ী; নিকটে একটী মশাল সহসা জ্বলিয়া উঠিল; সে আলোকে মোহিতলাল অভিনিবেশ সহকারে অতৃপ্ত লোচনে সে মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন; ভৈরবী বেশে সে মূর্ত্তি এত সুন্দর—এত মনোহর যে বনদেবী বলিয়া ভ্রম জন্মে। ভৈরবীর এক হস্তে ধনুক, অন্য হস্তে যোগযষ্ঠি—ত্রিশূল; ধনুক দেখিয়া লালজীর মনে একটুকু সন্দেহ হইল, কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না। বিবেক যেন বলিয়া দিল—এমন অমানুষিক লীলা—শৈলশিখরে একাকিনী নৈশবিহার তারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। লালজী ত্রস্তহস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ভৈরবীর

বামকর ধারণ করিয়া কহিলেন—"সত্য বলুন্ আপনি কে" ? ভৈরবী অবীরোচিত ব্যবহার দেখিয়া একটুকু হাসিলেন, একবার সরল দৃষ্টিতে লালজীর মুখপানে তাকাইলেন ; একটুকু বলও প্রকাশ করিলেন, কিন্তু হাত ছাড়াইতে পারিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া কহিলেন, মহাশয় ছাড়ুন—ছাড়ুন্—আমি ভৈরবী, বীরের প্রতিযোগীতার উপযুক্তা নহি।

সে কথা শুনিয়া লালজী ভৈরবীর কর ত্যাগ করিলেন—একটুকু লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"নিশাকালে এহেন দুর্গম পথে ভৈরবীর আগমন কেন" ?

উঃ—আমি উদয়গিরিতে যাইব, এই তাহার উত্তম পথ।

প্রঃ—প্রয়োজন ?

উঃ—একজন বন্দীর সন্ধানে।

প্রঃ—বন্দী কে—তাহার নাম কি ?

উঃ—নামটী ভালরূপ মনে হইতেছে না ; লাল কি কাল—লোহিৎ কি তড়িৎ।

প্রঃ—উদ্দেশ্য ?

উঃ—তাহার দ্বারা সন্ধির প্রার্থনা।

প্রঃ—কিসের সন্ধি ?

উঃ—গোদাবরী আর ক্ষিপ্রার সন্ধি ! দিবা আর নিশার সন্ধি ! লালার আর কুন্তেলার সন্ধি বা বিসন্ধি !

এই শেষোক্ত কথা কয়টী ভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হইল। এ স্বর পূর্ব্বশ্রুত ; সে স্বর চিনিয়া মোহিতলাল কহিলেন—"কে সর্দ্দার কন্যা—আজ এ বেশ কেন" ?

উঃ—ইংরাজ শিবিরে এবেশের সম্মান আছে জানিয়া। যুদ্ধ কি নিশ্চয় ?

লালজী—নিশ্চয়—নিশাবসানেই গড় আক্রান্ত হইবে।

প্রঃ—ফলাফল ?

উঃ—অনিশ্চিত ! কল্যাণীর কি ইচ্ছা কে জানে ?

এবার ভৈরবী মুক্তকণ্ঠে কহিলেন—"সে যাহা হউক, যাহা বলিতে আসিয়াছি শুনুন্। ঐ শিলাখণ্ডে স্থির হইয়া বসুন।" মোহিতলাল কৌতুহল পরবশ হইয়া ভৈরবীর নির্দ্দেশানুসারে শিলাখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইলে ভৈরবী অন্য শিলাখণ্ডে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। ভৈরবী ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিতে করিতে আকাশ পানে চাহিলেন। আবার পরক্ষণেই সে দৃষ্টি যুবকের উপর ন্যস্ত হইল। এবারও দৃষ্টি উজ্জ্বল, সরল ও স্নিগ্ধময়ী। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভৈরবী কহিলেন—"বুঝিলাম যুদ্ধ অনিবার্য্য! পীণ্ডারী বলিষ্ঠ, সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ; তাহারা বীরের ন্যায় মরিতে জানে; তাহাদের তোপ নাই সত্য, কিন্তু অসির ব্যবহারে ও তীরক্ষেপে পীণ্ডারীগণ সিদ্ধহস্ত! তাহাদের সন্ধান অব্যর্থ। পীণ্ডারীরমণীগণ ও তীরের ব্যবহার জানে। তীরফলকগুলি বিষাক্ত; দেহমধ্যে বিদ্ধ হওয়া মাত্র আহতকে অবসন্ন করিয়া অগৌণে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে। এই বিষাক্ত তীরই এ যুদ্ধে ঠগীর মহা অস্ত্র। ব্যাধি যেখানে ঔষধের ব্যবস্থাও সেখানে। আপনাকে যে তাড়িদঙ্গুরীয়টী দেওয়া হইয়াছে, উহা বিষ-প্রতিষেধক। তীরবিদ্ধ স্থানে—ক্ষতমুখে

ঐ অঙ্গুরী পুনঃপুনঃ কোমলভাবে ঘর্ষণ করিলে বিষের শক্তি নষ্ট হয়। আর যতক্ষণ ঐ অঙ্গুরী অঙ্গুলীতে থাকিবে, ততক্ষণ দেহে বিষের ক্রিয়া হইতে পারে না। তাই সাবধান—ঐ অঙ্গুরী যেন অঙ্গুলীভ্রষ্ট না হয়।"

তাহা শুনিয়া মোহিতলাল সাতিশয় বিস্মিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন। ঠগীগৃহে প্রতিপালিতা অপরিণতবয়স্কা বালিকার তাদৃশী সৌজন্যতা, পরকষ্ট নিবারণার্থ দূরদর্শিতা ও মঙ্গল কামনা হিন্দুগর্ব্ব উন্নত পরিবারেও বিরল। মোহিতলাল সর্দ্দার কন্যার সাধু ব্যবহারে গলিয়া গেলেন; উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইল—কি বলিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে প্রীতিপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে মোহিতলাল কহিলেন—"ভৈরবি!

আমি আপনার কে? আমি বরং আপনার গৃহশত্রু; তবে আমার উপর এত দয়া কেন?

প্রঃ—অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধারসাধনজন্য আপনি আত্মত্যাগী কেন?

উঃ—কেন জানি না; কিন্তু ঠগীদলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধন জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে দাঁড়াইয়াছে! মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন!"

প্রঃ—সে কি—ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার সাধন না হইলে কি আপনি আত্মঘাতী হবেন?

উঃ—কেন—ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার সাধন কি সম্ভবপর নয়?

ভৈরবী—যুদ্ধাবসানে তাহার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব—তাহাকে ধৃত করা ফৌজের সাধ্যায়ত্ত নহে।

মোহিত—তবে কি ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার সাধন হবে না?

ভৈরবী—কল্যাণীর ইচ্ছায় কিছুই অসম্ভব নহে; তাঁহার অনুগ্রহে অসম্ভব ও সম্ভব হয়! শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আপনি কিছু করিবেন না—আপনার জীবন মূল্যবান।

মোহিত—এ জীবনের মূল্য অতি সামান্য—কাল স্রোতের একটী বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র! আবার আপনার সাক্ষাৎ পাইব কি?

উঃ—সেও কল্যাণীর ইচ্ছা—কিন্তু আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি মরিবেন না।

মোহিত—আপনার কথায় আশ্বস্ত হইলাম; পুনঃ সাঁক্ষাৎ কোথায় পাইব?

প্রঃ—কল্যাণে জয়া নামে যে ভৈরবী আছেন, তাঁহাকে জানেন?

মোহিত—জয়া? জয়া সর্ব্বমঙ্গলা। দয়ার প্রতিকৃতি—মানবী বেশে দেবী। তাঁহাকে না চিনিলে কল্যাণীর প্রসাদ লাভ হয় না।

উঃ—যুদ্ধান্তে তাঁহারই কুটীরে সাক্ষাৎ হইবে। সেখানে দেখা না হইলে আর দেখা হবে না।

সহসা আকাশ হইতে একটা তারকা ঠিক সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। সেই আলোকে গিরিশঙ্কট ঝলসিয়া গেল এবং মোহিতলালের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। ইত্যবসরে

ভৈরবী অদৃশ্য হইলেন। মোহিতলাল দৃষ্টি ফিরাইয়া আর সে মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। তিনি সত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ইতস্ততঃ খুঁজিলেন, কিন্তু সে শান্তিপ্রতিমা আর দৃষ্টিগোচর হইল না। মুহূর্ত্তে যেন সে মূর্ত্তি নৈশ সমীরণে মিলাইয়া গেল। পরক্ষণেই শুনিতে পাইলেন—অনতিদূরে ক্ষিপ্রার বক্ষে কে গাহিতেছে,—

"বল সে কেমন, যে হৃদয়ের ধন!
সৃজন পালন যাঁর, যিনি নিত্য নিরঞ্জন॥" ইত্যাদি

মোহিতলাল শিলাখণ্ডোপরি বক্ষ স্থাপন করিয়া অবনত বদনে দেখিলেন—কে নির্ঝরিণীর তরঙ্গময় প্রবাহে নৌকা বাহিয়া সেই গান গাহিতে গাহিতে গড়ের দিকে চলিয়া গেল। "আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত মরিবেন না" এ কথা পুনঃপুনঃ মোহিতলালের কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে প্রতিধ্বনি সম্বল করিয়া লালজী উদ্ভ্রান্তহৃদয়ে শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। প্রজ্বলিত মশাল যথাস্থানে রক্ষিত ছিল, সুতরাং পথ চলিতে লালজীর কোন কষ্ট হইল না।

চতুর্ব্বিংশ কল্প।

তারা যখন নওয়াগড়ে প্রত্যাগত হইলেন, তখন রাত্রি গভীরা না হইলেও গড় গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়াছে; রক্ষীগণের সারা শব্দ নাই; সেনানিবাসে জন প্রাণীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভূত হয় না; মায়ের মন্দিরে বেদপাঠ থামিয়া গিয়াছে—বাহিরে দু'একটী মাত্র ফানস মিটি মিটি জ্বলিতেছে; তোষাখানায় প্রহরীগণ অর্দ্ধচেতনাবস্থায় ঝুঁকিতেছে। দেওয়ালীর রাত্রিজাগরণে—আমোদ প্রমোদের ফলে সকলে যেন অবসন্ন। অন্যদিন তারা মায়ের মন্দিরে না গিয়া কখনও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন না; কিন্তু আজ আর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না। বাহির হইতে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া একেবারে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নিশীথ সময়ে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে একাকিনী পর্ব্বত বিহারে তারার ভয় হয় না—কিন্তু তাহার যত ভয় শয়নকক্ষে। তারা একাকিনী শুইতে পারেন না, সখিদ্বয় তারার নিদ্রার ও সঙ্গিনী; সময় সময় রমা বা অনুপমার মধ্যে কেহ সে কক্ষে শয়ন করিতেন। তারা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রমা শুইয়া কিন্তু সুষুপ্তা। পীণ্ডারী সম্প্রদায়ের পামর বৃত্তি দেখিয়া তাহাদের জন্য তারার বিশেষ সহানুভূতি না থাকিলেও তাহাদের অমঙ্গল ভাবিতে তারার কষ্ট হইত; তাই তারার মন আজ বড় চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন। তারা বার বার সেই নিদ্রিত স্নেহমাখা মুখখানি দেখিতে লাগিলেন, সে মুখ যত

দেখেন, ততই যেন দেখিতে ইচ্ছা হয়। দেখিতে দেখিতে মনে হইল—"বুঝি আর অধিক দিন এ মুখ দেখিব না।" নিদ্রিতাবস্থায় রমণীর বদন শোভা যেন বিশদরূপে ফুটিয়া উঠে। পতিপাশে লজ্জাশীলা শিথিলকবরী সুষুপ্তা যুবতীর মুখশশী যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, সে মুখ কত সুন্দর—কত মনোহর! তারা মনের আবেগে সে সৌন্দর্য্যের উপর লক্ষ্য না করিয়া ব্যস্তভাবে ডাকিলেন, মা! রমা সুনিদ্রিতা—সে ডাকে নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কিঞ্চিদূর্দ্ধস্বরে তারা আবার ডাকিলেন—মা—মা!!

এবার রমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; সাদরে ফুলেলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন—"কি মা—ভয় কি— এই যে আমি"।

রমার বিশ্বাস অন্য দিনের ন্যায় ফুলেলা ঘুমের ঘোরে মা মা বলিয়া ডাকিতেছে। ফুলের ন্যায় সুন্দর, শারদ চন্দ্রিমার ন্যায় স্নিগ্ধময়ী হাসি মাখা মুখখানি বলিয়া রমা ও অনুপমা সোহাগ করিয়া তারাকে ডাকিতেন 'ফুলেলা'। ফুলেলা মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, বুঝি আমার মা বলা এই শেষ"।

ফুলেলার আজ এই প্রথম রোদন। তদ্দৃষ্টে রমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সবিস্ময়ে প্রেমপূর্ণ বচনে কহিলেন—"কেন বাছা কি হইয়াছে? তুমি কি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে"?

ফুলেলা। না মা তোমাদিগকে এক দণ্ডের জন্যও ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না—কিন্তু—

রমা—কিন্তু কি? তুমি কি কোন কুস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছ? আমি সব সইতে পারি—কিন্তু তোমার চক্ষের জল আমার অসহ্য।

ফুলেলা—না মা—স্বপ্ন নহে—কল্যাণীর কি ইচ্ছা কে জানে? ক্ষিপ্রাসৈকতে শৈলমূলে ইংরাজফৌজের ছাউনি পড়িয়াছে, নিশাবসানেই গড় আক্রমণ করিবে।

রমা—তোমাকে এ সংবাদ কে দিল?

ফুলেলা—ফৌজের ছাউনি আমি দেখিয়া আসিতেছি; আরও শুনিলাম, একদল দেওঘরের দিকে গিয়াছে---সুতরাং সেখান হইতে কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই।

রমা—সর্দ্দারকে এ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে?

ফুলেলা—আমার মাথা ঘুরিতেছে—শরীর কাঁপিতেছে, আর একপা ও চলিবার শক্তি নাই!

"আমি এখনই সর্দ্দারকে এ সংবাদ দিতেছি" বলিয়া সসব্যস্তে রমা কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কক্ষান্তরে সর্দ্দার ঘুমাইতেছিলেন। ব্যস্তভাবে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া ফৌজের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া চিতুসর্দ্দার ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত, আত্মহারা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন—কিন্তু উদ্যমহীন হইলেন না। অত্যল্প সময়েই হৃদয়ের বল ফিরিয়া আসিল, অসীম সাহস জাগিয়া উঠিল; ঠগীগণের রক্ষণার্থ মনে মনে প্রস্তুত হইয়া কহিলেন—"রমে! তারাকে এখানে ডাকিয়া আন।"

দ্রুতপদে রমা তারাকে ডাকিয়া আনিলেন; সে

অবসরে অনুপমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহাকে সস্নেহে শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া সর্দ্দারজী কহিলেন—"ফুলেলা! ইংরাজ ফৌজের সংখ্যা কত?

ফুলেলা—বোধ হয় সহস্রাধিক!

সর্দ্দার—তোপ কতগুলি আছে?

ফুলেলা—সাতটী। একদল নওয়াগড় আক্রমণ করিবে; দ্বিতীয় দল দেওঘর আক্রমণার্থ গিয়াছে।

সর্দ্দার—সর্ব্বনাশ! তা'হ'লে আর দেওঘর হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই! তা হউক—যুদ্ধ অনিবার্য্য! ঠগী সম্প্রদায়ের ধ্বংসও অপরিহার্য্য! ঠগী মরিতে জানে—মারিতেও জানে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিতে জানে না।

ফুলেলা—নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই গড় আক্রমণ করিবে। সমস্ত গড় নিশ্চেষ্ট—নিস্তব্ধ—রক্ষীগণ নিদ্রিত—সেনা নিবাসে কেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। আত্মরক্ষার কোন বন্দোবস্ত দেখিতেছি না।

"এখনই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছি" বলিয়া চিতু সর্দ্দার দ্রুতপদে সেনানিবাসের দিকে ছুটিলেন। কেবল স্ত্রীদ্বয়কে বলিয়া গেলেন—"নিশান্তে যেন ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা হয়।"

শান্তশীল ভগ্নহৃদয়ে কল্যাণ হইতে ফিরিয়া অবধি শয্যাগত; অসুস্থতার ভাণ করিয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়াছেন। উপাধানে মস্তক রাখিয়া কেবল ভৈরবীর কথা ভাবিতেন—

অস্থিচর্ম্মসার—সে শীর্ণ দেহে শুষ্ক মুখখানি যতই তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে—ততই পরিতাপ বাড়িতেছে—ততই অশ্রুবারি উপাধান সিক্ত করিতেছে। অন্যান্য দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্ঝরিণীর ঘাটে বসিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী দিনমণির উদ্দেশে স্তব পাঠ করিতেন, যথারীতি স্বায়ংকৃত্য সমাপন করিতেন; কিন্তু আজ কখন প্রহরের পর প্রহর গত হইল—কখন সন্ধ্যা আসিল, সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল, সে রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল, শান্তশীল কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি তখনও শয্যাগত—কক্ষদ্বার রুদ্ধ। যে চিন্তানল আজ তাহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে—অন্যচিন্তা দূরের কথা, চিতানল ও আজ সে হৃদয়ে স্থান পায় কিনা সন্দেহ। শান্তশীল চিতুসর্দ্দারের দক্ষিণ হস্ত—রণে বল, কৌশলে বল, সম্পদে বল, বিপদে বল, তিনি সর্ব্বত্র অগ্রণী ও সর্দ্দারের শুভাকাঙ্ক্ষী! তাই চিতুসর্দ্দার সর্ব্বাগ্রে কোষাধ্যক্ষের কক্ষদ্বারে পৌঁছিলেন। দ্বারে সজোরে আঘাত করাতে অভ্যন্তর হইতে প্রশ্ন হইল 'কে'?

উঃ—কে ফতেয়া? মিছিরজীকে ডাকিয়া দে।

ফতেয়া শান্তশীলের বিশ্বস্ত ভৃত্য। রাত্রিকালে প্রভুর রক্ষী স্বরূপ ঐ কক্ষমধ্যে থাকে। সর্দ্দারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফতেয়া সত্রস্তে সভয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করিল ও প্রভুকে সংবাদ জানাইল। কোষাধ্যক্ষ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন এবং সর্দ্দারজীর আগমন জানিয়া বিস্মিত হইলেন কিন্তু ভীত হইলেন না। শয্যা ত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে সর্দ্দারজীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"কি আদেশ?"

সর্দ্দার—বিপদ উপস্থিত! শত্রু গৃহদ্বারে আগত প্রায়। ইংরাজফৌজ নদীসৈকতে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে—প্রভাতেই গড় আক্রমণ করিবে। অবিলম্বে আত্মরক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক।

শান্ত—সর্ব্বাগ্রে তীরন্দাজ পীণ্ডারী সংগ্রহ করা চাই, এ যুদ্ধে তাহারাই প্রধান সহায়।

সর্দ্দার—ইংরাজের তোপে সকলে উড়িয়া যাইবে।

শান্ত—তোপের ভয় করিলে আত্মরক্ষা অসম্ভব, অন্তরাল হইতে তীর ছুঁড়িতে হইবে। পীণ্ডারীর সন্ধান অব্যর্থ—সদ্য প্রাণঘাতী।

সংবাদ পাইয়া দফাদার আমীর আলী আসিয়া মন্ত্রণায় যোগ দিল। তখনই সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দুইজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দেওঘরে প্রেরিত হইল। অতঃপর স্থির হইল, সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ দ্বার সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করিতে হইবে। আর সঙ্কেত পথের মুখ বৃহৎ শিলাখণ্ডে বন্ধ করিতে হইবে। ইংরাজ-ফৌজ সুড়ঙ্গপথেই নওয়াগড়ে প্রবেশ করিবে। সেই পথের দুই পার্শ্বে উন্নত শিখরোপরি তীরন্দাজ লুকাইত থাকিবে। সুড়ঙ্গের মুখ ও বহির্দ্বারের মধ্যস্থলে এক দল ঠগীসহ আমীর আলী শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিবে। উন্নত ফটকোপরি একদল তীরন্দাজ থাকিবে ও ফটকের পশ্চাতে শান্তশীল এক-দল সৈন্যসহ অপেক্ষা করিবেন। তৃতীয় ঠগীদলসহ স্বয়ং চিন্তু সর্দ্দার সেনা-নিবাসের বিস্তৃত অঙ্গনে থাকিবেন। ইহাও স্থির হইল, প্রাণভয়ে কেহ যেন পলায়ন না করে। আমীর

আলী সেনানিবাসে প্রবেশ করিয়া শিঙ্গা বাজাইল ; মুহূর্ত্ত মধ্যে সপ্রহরণ ঠগী সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। তীরন্দাজগণ বিকটরূপে সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। দলপতির আদেশানুযায়ী সকলে মায়ের চরণে প্রণত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "শত্রু না মারিয়া মরিব না"। নিশাবসানের পূর্ব্বেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্ হইল। এ যুদ্ধে আমীর আলী সর্ব্বাগ্রণী।

এ দিকে অন্তঃপুরেও রণসজ্জা হইতেছিল। রমা মায়ের পূজার ভার লইলেন ; আর অনুপমা অন্তঃপুর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। তীর ব্যবহারে তাঁহার অভ্যাস ছিল ; তারা ও অনুপমার সঙ্গে যোগ দিলেন। বলা বাহুল্য যে বিষাক্ত তীরই তাঁহাদের সম্বল।

নৈরাশ হৃদয়ে মোহিতলাল শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া সেনাদলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে প্রভাতেই গড় আক্রমণ করিতে হইবে। এই সমতল ক্ষেত্র পার হইলেই গিরি-সঙ্কটের সুড়ঙ্গ পথ—সে পথেই গড়ে প্রবেশ করিতে হয়। পীণ্ডারীগণের তীরই প্রধান প্রহরণ। সকলকেই কঠিন অঙ্গত্রাণ ধারণ করা সঙ্গত। সৈন্যগণ তদনুরূপ প্রস্তুত রহিল। পীণ্ডারীর তীর যে বিষাক্ত ও সন্থ প্রাণহর সে কথা সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় ইচ্ছা করিয়াই অজ্ঞাত রাখিলেন। অনন্তর তিনি আপন শিবিরে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার প্রাণে নূতন চিন্তা—অভিনব প্রলয় বহিতেছিল। যুগপৎ কয়েকটী চিন্তা-প্রবাহে মোহিতলালের হৃদয় উদ্বেলিত হইল :—

১ম চিন্তা—"ব্রাহ্মণ কন্যাকে ধৃত করা ফৌজের সাধ্যায়ত্ত নহে।"
২য় চিন্তা—"পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি মরিবেন না।"
৩য় চিন্তা—তারা কে? এ ভৈরবীই কি সর্দ্দারের পালিতা কন্যা?

লালজীর চিন্তাকুল হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে দৈববাণীর ন্যায় কে বলিয়া দিল ঃ—

১ম—"বনবালার ন্যায় বনে বনে তারার খেলা—পাহাড়ে পর্ব্বতে তারার লীলা। আপনি ধরা না দিলে তাহাকে ধৃত করা অসম্ভব! কিন্তু তারা জয়ার কুটীরে বাঁধা—কাকাতুয়ার প্রেমে আত্মহারা, সেখানেই তিনি ধরা পড়িবেন।
২য়—অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধন জন্য যিনি আত্মত্যাগী, কল্যাণী তাঁহার কল্যাণ করিবেন। তিনি পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পাইবেন।
৩য়—এ ভৈরবীই অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যা।

একথায় লালজীর নৈরাশ হৃদয়ে আশার উজ্জ্বল রেখা পড়িল; সাহস ও অধ্যবসায় ফিরিয়া আসিল। সে আশায় ভর করিয়া লালজী বীরবেশে সজ্জিত হইলেন। সহসা কল্যাণ সম্প্রদায় পর্ব্বতশিখর প্রকম্পিত করিয়া শত কণ্ঠে ধ্বনি করিলেন "কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে"। লালজী যোগিনীর উপদেশ মত বামকরের অনামিকায় তাড়িদঙ্গুরীয় ধারণ করিলেন। অঙ্গুরী ধারণ করিতে গিয়া আবার তাঁহার মনে পড়িল সেই ভুবনমোহিনী

যোগিনীর আনন্দময়ী মুখখানি—আর পরদুঃখ-বিমোচনার্থ তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তা! এহেন সরলতা সহৃদয়তা মূর্ত্তিমতী মায়া বই আর কি হইতে পারে?

পঞ্চবিংশ কল্প।

অন্যদিনের ন্যায় সে রাত্রি অবসান হইল। শৈলশোভা শাল তমালশাখায় শিখীগণ প্রভাতিক কেকারব করিয়া উঠিল। নানাজাতি বিহঙ্গমকুল কলরবে কানন আকুল করিয়া তুলিল। এক কোণে একটী অশোকতরুর নিবিড় শাখায় বসিয়া দয়েল ললিত তান ধরিল। নির্ঝরিণীর অনুচ্চ তরঙ্গ নিঃস্বন উষার মৃদু মন্দ সমীরণে মিশিয়া সেই অপ্রশস্ত উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিল। সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মোহিতলাল শিবির হইতে বাহিরে আসিয়া রণ দুন্দুভি বাজাইলেন। সে শব্দে রণবাজী—রণঅসি নাচিয়া উঠিল; সাধুসন্ন্যাসীগণ আবার জয়ধ্বনি করিলেন—"কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে"। "এই মাহেন্দ্রক্ষণই যাত্রার প্রশস্ত সময়; সৈন্যগণ অগ্রসর হও" বলিয়া স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ অশ্বারোহণে অগ্রগামী হইলে সৈন্যসামন্তগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই জনৈক সাধু আসিয়া সংবাদ দিলেন—"সুড়ঙ্গ পথে নির্গমনের দ্বার অবরুদ্ধ! এপথে গড়ে প্রবেশ অসম্ভব"। সে সংবাদে অশ্বারোহীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। রণসাধ মুহূর্ত্তেকের জন্য মিটিয়া গেল, কিন্তু কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেন না। আগ্রহ সহকারে লালজী জিজ্ঞাসা করিলেন 'নির্গমনের পথান্তর আছে কি'?

উ—আছে বটে—কিন্তু সে পথ তত সুগম ও নিরাপদ নহে। দুইদিকে শৈলস্কন্ধ ধরিয়া যাইতে হয়। সে পথ এত

অপ্রশস্ত ও বন্ধুর যে পদে পদে পদস্খলনের আশঙ্কা; একত্রে দুই ব্যক্তি পাশাপাশি চলিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। সুড়ঙ্গমুখের দুই পার্শ্বে সুদৃঢ় শৈল প্রাচীর, সে প্রাচীর ভগ্ন হইলে অবরুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইতে পারে।

লালজী—সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে তোপ দাগিলে প্রস্তরপ্রাচীর বোধ হয় সহজেই বিচূর্ণিত হইবে।

উ—সে তোপানলে জতুগৃহদাহের ন্যায় দলবল ভস্মীভূত হইবে। প্রস্তরে প্রতিঘাত পাইয়া গোলা গোলন্দাজকেই বিদগ্ধ করিবে। উদ্গীরিত তোপানলে গিরিসঙ্কটে কাহার তিষ্ঠান ভার হইবে।

লালজী—স্কন্ধবাহী হইলেও পীণ্ডারীর তীরে বিস্তর সৈন্যবল বিনষ্ট হইবে।

উ—একটী শরে এক বই দুই ব্যক্তি বিদ্ধ হবে না, কিন্তু তোপের মুখে পীণ্ডারী তীরন্দাজ উড়িয়া যাইবে।

লালজী আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন। বুঝিলেন প্রস্তাবিত পথ ভিন্ন সহসা গড় আক্রমণের অন্য উপায়াভাব। অগত্যা সৈন্যগণসহ শঙ্কটময় শৈলস্কন্ধারোহণ করিলেন; কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই লালজী বুঝিতে পারিলেন, সেপথে সৈন্যগণ অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিবে—কিন্তু উন্নত শৈলশৃঙ্গ হইতে সজোরবিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরে বলক্ষয়ের আশঙ্কা। সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছেন—আর প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নাই; গড়াক্রমণে যত কালবিলম্ব হইবে, গড় প্রবেশের পথ ততই দুর্ভেদ্য হইবে; অনন্যোপায় হইয়া

সেনাপতি সাঙ্কেতিক তূর্য্যধ্বনি করিলেন। সে ধ্বনির অর্থ—"অতি সাবধানে অগ্রসর হও"। নির্দেশানুসারে গোলন্দাজ অগ্রবর্ত্তী হইল। সৈন্যগণ পিপীলিকার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উভয় শৈলস্কন্ধ বাহিয়া চলিল। পাছে সৈন্যগণ ঠগীর তীর ভয়ে পৃষ্টভঙ্গ দেয়, এজন্য কল্যাণ সম্প্রদায় সহ সৈন্যাধ্যক্ষ পদাতিক দলের পশ্চাতে রহিলেন। অশ্বারোহীগণ গোলন্দাজের অনুসরণ করিল। উদ্দেশ্য নির্গমন পথ উন্মুক্ত হওয়া মাত্র তীব্র বেগে গড়ের প্রবেশ দ্বার আক্রমণ।

ফৌজদল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও প্রশস্ত স্থানে পৌঁছিলে সৈন্যাধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়া তোপ দাগিতে আদেশ দিলেন। তন্মুহূর্ত্তে তোপ ছুটিল। একটির পর একটি, তার পর একটি—তার পর আর একটি—এইরূপে পরে পরে ক্রমাগত তোপ ছুটিতে লাগিল। সে তোপানলে সুদৃঢ় প্রাচীর সহসা উড়িয়া গেল এবং নির্গমনের পথ বিমুক্ত হইলে ইংরাজফৌজ বীরদর্পে শৈলমালা বিকম্পিত করিয়া গড়ের দিকে অগ্রসর হইল। পঞ্চশত পীণ্ডারী বর্ষা ও ধনুক,হস্তে প্রবেশ-দ্বারের উপরিভাগে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; জিমূত হুঙ্কারাধিক সুগভীর তোপধ্বনিতে গড় সহ গড়রক্ষী পীণ্ডারী-গণের পাষাণ-প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; তোপধ্বনি শৈলশ্রেণী হইতে নীরব নির্ঝরিণীবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিক্ দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

চিতুসর্দ্দারের নির্দেশ ক্রমে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই মহাকালীর পূজা আরম্ভ হইয়াছিল। সে তোপধ্বনিতে ধ্যানস্তিমিতনেত্র

পূজকের আসন টলিল; স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় পূজারী ঠাকুর কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে কহিলেন—"বল মা জগদম্বে তোমার কি ইচ্ছা?" অমনি আকাশ-বাণী হইল "ঠগীর সর্ব্বনাশ।" রমা ও ধ্যানপরায়ণা ছিলেন; সে দৈববাণী তাহার কর্ণপটাহে ধ্বনিত হইল—"ঠগীর সর্ব্বনাশ।" সে দৈববাণীতে রমার প্রাণ কাঁপিল, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল; আশা ভরসা সব ফুরাইল। অমনি রমা অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে অভয় ভিক্ষা করিয়া কহিলেন "মা গো শৈলেশ্বরি, ঠগীগণ তোমার পরম ভক্ত ও নিত্য উপাসক; তোমার পূজাই তাহাদের আনন্দ! তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল তোমারই ইচ্ছা"—বলিতে বলিতে রমার কণ্ঠরোধ হইল, তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। সেই নিঃসজ্ঞ অবস্থায় কে যেন কাণে কাণে বলিয়া দিল "কালের ভেরী বাজিয়াছে; দানব বৃত্তির প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে। ঠগী-দমন ও অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধারসাধন ভবানীর ইচ্ছা।" সে মর্ম্মঘাতী ইচ্ছার কথা শুনিয়া রমার চৈতন্যোদয় হইল; নয়ন মেলিয়া দেখিলেন পূজারীঠাকুরের আসন শূন্য, প্রাণভয়ে ধর্ম্মভীরু গরিব ব্রাহ্মণ সরিয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং মায়ের প্রারব্ধ পূজা অসম্পূর্ণ রহিল। এবার রমা বুঝিলেন "এও মায়ের ইচ্ছা, করাল-বদনী কাত্যায়নীর কপট মায়া।" অনন্যগতি হইয়া রমা বিষণ্ণ বদনে আবার মায়ের পদতলে ধ্যানস্থা হইলেন। সে ধ্যান যখন ভঙ্গ হইল তখন গড় শত্রুর হস্তগত হইয়াছে।

শৈলপ্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া ইংরাজ ফৌজ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায়

পীণ্ডারীগণকে আক্রমণ করিল; পীণ্ডারীগণ বলিষ্ঠ ও সাহসী; তাহারা ও দুর্দ্দণ্ডবেগে শত্রুগণের প্রতিদ্বন্দী হইয়া সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিল। পীণ্ডারীর বিষাক্ত তীরবিদ্ধ হইয়া অনেক ইংরাজফৌজ ধরাশায়ী হইল। কিন্তু তোপের মুখে পীণ্ডারীগণ অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না, ক্রমে বিরল হইয়া পড়িল ও অবশিষ্টগণ অদৃশ্য হইল। সে অবসরে লালজী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আহত সৈন্যগণের ক্ষত মুখে তাড়িদঙ্গুরীয় ঘর্ষণ করাতে কতিপয়ের বিষের শক্তি নষ্ট হইল, কিন্তু কালবিলম্ব বিধায় অন্যান্যের জীবন রক্ষা পাইল না। স্বামীজী নিশ্চেষ্ট ভাবে এই দলের অনুসরণ করিতেছিলেন; যুদ্ধ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, আহতদের পরিচর্য্যাই তাঁহার কর্ত্তব্য। জয়ার অনুরোধ রক্ষার্থ উভয় দলের আহতগণ সাঙ্কেতিক পথে কল্যাণে প্রেরিত হইল।

এ দিকে প্রায় পঞ্চদশ শত পীণ্ডারী সহ শান্তশীল ও চিতু সর্দ্দার বহিরঙ্গনে ও সেনা নিবাসের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। সে সময় দেওঘর হইতে সংবাদ আসিল, ভন্‌সলা রাজ পীণ্ডারীকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক। সে সংবাদে সর্দ্দারজীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে এ যুদ্ধে ঠগীর সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। সর্দ্দারের জয়ের আশা অতলে ডুবিল, তিনি নৈরাশ হইলেন বটে কিন্তু উদ্যমহীন হইলেন না। নিষ্কোষিত অসি হস্তে একবার মায়ের মন্দিরের দিকে চাহিলেন, আবার পীণ্ডারীগণের উপর সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কি চিন্তা করিলেন। বোধ হয় ভাবিতেছিলেন পীণ্ডারীর পাপের প্রত্যক্ষ প্রায়শ্চিত্ত—আর

প্রাণাদপি প্রিয় জীবন তারার অজ্ঞাত পরিণাম। এ দিকে শান্তশীল মুক্ত অসি হস্তে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শান্তশীল বীরের ন্যায় অচল, অটল; প্রলয়ের পূর্ব্বে বিশাল বিটপীর ন্যায় স্থির, গম্ভীর। মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রুগণ বহিরঙ্গনে উপস্থিত হইল। শান্তশীল যথা সাধ্য প্রতিরোধের চেষ্টা করিলেন। পীণ্ডারীগণ চিৎকার করিয়া উঠিল "জয় মা কালি নৃমুণ্ডমালিনি খর্পরধারিণি শত্রু-বিনাশিনি শ্যামা।" কিন্তু আজ পাষাণী মা সন্তানের ডাক শুনিলেন না। আমীর আলী অশ্বারোহণে পীণ্ডারী দলের অগ্রণী হইয়া বলিতে লাগিল "অগ্রসর হও, করাল কৃপাণে শত্রুগণের মুণ্ডপাত কর, শত্রু না মারিয়া কেহ মরিও না।" পীণ্ডারীগণ সে বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সমস্বরে পঞ্চদশশত কণ্ঠে গাইল "জয় মা কালি নৃমুণ্ডমালিনি খর্পরধারিণি শ্যামা।" সেই ভীমরবে ইংরাজ ফৌজের প্রাণ কাঁপিল, অমনি কল্যাণসম্প্রদায় ধ্বনি করিল "কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে।"

তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিল; রণ কৌশলে ও তোপানলে দলে দলে পীণ্ডারী ধরাশায়ী হইতে লাগিল। শান্তশীল মরিতে প্রস্তুত কিন্তু শত্রু না মারিয়া মরিবেন কেন? তিনি অশ্বারোহণে অসিহস্তে শত্রুর সম্মুখীন হইলে দফাদার সৈন্যাধ্যক্ষ্যের উপর এবং শান্তশীল সৈন্যগণের উপর অসি চালাইলেন; জয়ার অনুরোধ স্মরণ করিয়া লালজী ফৌজ-গণকে ইঙ্গিতে জানাইলেন—"কোষাধ্যক্ষের অঙ্গে অস্ত্র চালাইবে না, আত্মরক্ষা করিবে মাত্র।" ফৌজগণ যথাসাধ্য

আত্মরক্ষারই চেষ্টা করিল কিন্তু কার্য্যতঃ লালজীও একেবারে অক্ষত রহিলেন না—কিন্তু সে আঘাত সামান্য মাত্র। মোহিতলাল এতক্ষণ ইচ্ছা করিয়াই অসির ব্যবহার করেন নাই; সহসা দফাদার ভীমবেগে মোহিতলালের উপর অসি চালাইল; ক্ষুৎপিপাসাতুর ভীম সিংহ সম্মুখে শিকার দেখিয়া তম্মুণ্ডপাতে সবেগে অসি চালাইলেন। ক্ষণকাল উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিল; কিন্তু লালজীর আক্রমণ সর্ব্বথা প্রতিরোধ করা আমীর আলীর পক্ষে সম্ভবপর হইল না। সুকৌশলে ও ভীষণ আঘাতে দফাদারের অসি বিচূর্ণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বারোহীগণকে সঙ্কেত করা মাত্র আমীর আলী বন্দী হইল। আমীর আলীর অবস্থা দেখিয়া পীণ্ডারীগণ উদ্যমহীন হইল; রণে ভঙ্গ দিয়া অবশিষ্টেরা পলায়নের চেষ্টা দেখিতেছিল কিন্তু ফৌজের হস্ত এড়াইতে পারিল না। ফৌজগণ ক্ষিপ্র হস্তে দলে দলে পীণ্ডারীগণকে ধৃত ও বন্দী করিল। ফৌজগণ যখন পীণ্ডারীগণকে বন্দী করিতে ব্যস্ত, সে অবসরে সৈন্যাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কে তীর ছুঁড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল "অধ্যক্ষজী সাবধান—ঐ তীর।" মোহিতলাল অসি দ্বারা সে তীর ব্যর্থ করিলেন বটে কিন্তু দ্বিতীয় তীর আসিয়া তাঁহার অশ্বকে বিদ্ধ করিল। অশ্ব তীব্র বিষের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। লালজী তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ ও প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহারে অশ্বটীর প্রাণ রক্ষা করিয়া জনৈক সৈনিকের অধীনে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিলেন। সে সময়ে তৃতীয় একটি শর আসিয়া জনৈক অশ্বারোহীকে বিদ্ধ করিল;

সে অবসরে লালজী দেখিলেন, তুটী যোগিনী অন্তঃপুরের উচ্চ প্রাচীরোপরি দাঁড়াইয়া অবিরত তীর ছুঁড়িতেছেন। তাহাদের সন্ধান ব্যর্থ হইতেছে না; সে শরে বিদ্ধ হইয়া কতিপয় সৈন্য ধরাশায়ী হইয়াছিল। আহতগণের রক্ষার ভার স্বামীজীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া পদব্রজে লালজী সেনা নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া জয়ভেরী বাজাইলেন। তাহা শুনিয়া সৈন্যগণ ধ্বনি করিল—"জয় ইংরাজের জয়।" সে জয়ধ্বনি লয় পাইতে না পাইতে কল্যাণসম্প্রদায় জয়োল্লাসে গাইল—

"জয় মা কল্যাণি কুরু কল্যাণ জীবে
কলুষনাশিনি সর্ব্বমঙ্গলে শিবে।"

সে জয়ধ্বনিতে চিতুসর্দ্দারের আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল; আত্মরক্ষার সাধ মিটিল। বাহুবল কোষাধ্যক্ষ ও দফাদারের পরিণাম দেখিয়া আর অসি চালাইলেন না; অম্লানচিত্তে লালজীর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। সুতরাং চিতুসর্দ্দার ও ফৌজের হস্তে বন্দী হইলেন। নওয়াগড় ইংরাজাধিকৃত হইল। প্রাচীরোপরি দাঁড়াইয়া যোগিনীদ্বয় সর্দ্দারের দুরবস্থা দেখিয়া সত্রস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এই দুইটী যোগিনী কে? যিনি ক্ষিপ্রহস্তে তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তিনি সর্দ্দার পত্নী অনুপমা; আর তাঁহার পার্শ্বে ধনুক হস্তে যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিই অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যা তারা। তারাও তীরহস্তে প্রস্তুত ছিলেন, উদ্দেশ্য যদি কেহ তাহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করে, তবে সে আততায়ীর উপর তীরের

সদ্ব্যবহার করিবেন। তাই তারা বলিয়াছিলেন, "তারার মুক্তি তারার হাতে।"

মোহিতলাল পুনরায় জয়ভেরী বাজাইলেন; অন্তঃপুরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন; অন্তঃপুর হইতে কাহার বহির্গমনের আদেশ রহিল না। প্রকারান্তরে অন্তঃপুরবাসিনীগণ অন্তঃপুরে বন্দী হইলেন। উভয় দলের আহত সৈন্য ও পীণ্ডারীগণ চিকিৎসার্থ কল্যাণে প্রেরিত হইল। স্বামীজীর কার্য্যে গোসাঞী দক্ষিণ হস্ত। লালজীর সম্মতিক্রমে শান্তশীলকে ও কল্যাণে পাঠান হইল। আহতদের সেবা শুশ্রূষার ভার জয়ার হস্তে ন্যস্ত হইল। পরসেবায় জয়ার আনন্দ! অতঃপর তারাকে হস্তগত করার জন্য লালজী কৌশলে খোঁজ করিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। যুদ্ধাবসানেই তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন।

ষড়বিংশ কল্প।

ত্রিংশতাধিক পীণ্ডারী সহ চিতুসর্দ্দার বন্দী হইলেন। দফাদার আমীর আলী ও আর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত ঠগীকে চিকিৎসার্থ উদয়গিরিতে প্রেরণ করা হইল। অন্যান্য আহতগণ কল্যাণে প্রেরিত হইল।

অতঃপর অন্তঃপুরবাসিনীদের তালিকা করিতে গিয়া দেখা গেল—তারা অন্তঃপুরে নাই; এ সংবাদে মোহিতলালের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তন্মুহূর্ত্তেই মনে হইল—যোগিনী যথার্থ ই বলিয়াছিলেন—"তারার মুক্তি তারার হাতে। তারাকে ধৃত করা ফৌজের সাধ্যায়ত্ত নহে!" তারার সখী-দ্বয়ের মুখে যাহা অবগত হওয়া গেল, তাহাতে তারার উদ্ধার সাধনের আশা আর রহিল না! সখীদ্বয় বলিয়াছিল,—"যুদ্ধাবসানেই তারা বনবালার ন্যায় বনের দিকে দ্রুতবেগে চলিয়া গিয়াছেন—আর এ গড়ে ফিরিবেন কি না সন্দেহ।" অন্তঃপুরবাসিনীগণও আপাততঃ বন্দী হইলেন। অন্তঃপুর হইতে কাহার নিষ্ক্রমণের আদেশ রহিল না। চতুর্দ্দিকে পাহারা বসিল। মোহিতলাল ভগ্নহৃদয়ে নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই সেনা নিবাসের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

এদিকে সন্ধ্যার ক্ষণপরে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। পূজারী ঠাকুর যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন করিয়াছিলেন; দাস দাসীগণ সমস্ত পলাতক; আজও মন্দিরে সন্ধ্যাদীপও জ্বলে

নাই। তারা মায়ের পরম ভক্ত; মায়ের সন্ধ্যারতি হইবে না, এটী তাঁহার প্রাণে সহিল না। যুদ্ধাবসানে তারা পার্ব্বত্যপথে একাকিনী ভবানীপুরে পৌঁছিয়া মন্দিরস্বামীকে সংবাদ দিলেন—"নওয়াগড় ফৌজের হস্তগত হইয়াছে; সর্দ্দারজী বহুসংখ্যক ঠগীসহ বন্দী হইয়াছেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণও বন্দী।" সে সংবাদ শুনিয়া গুরুজী কহিলেন,—"এতদ্দিনে ভবানীর ইচ্ছা পূর্ণ হইল; ঠগীকুল নির্ম্মূল হয় হউক, এখন সর্দ্দারকে বাঁচাইবার উপায় কি?"

তারা—সে উপায় ও গুরুজীর হাতে। যেমন কর্ত্তব্য মনে হয় করুন। কিন্তু উপস্থিত আমার একটী অনুরোধ আছে, রক্ষা করিতে হইবে।

গুরুজী—মা! তোমার অনুরোধ বা আবদার কখনও অগ্রাহ্য বা উপেক্ষিত হয় নাই। সর্দ্দারজীর পরিণাম চিন্তা করিয়া প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগিতেছে, হৃদয় যেন শুষ্ক হইতেছে. চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি! ভবানীর কি ইচ্ছা কে জানে?

এ কথায় তারার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। বাষ্পাকুল-লোচনে কাতর বচনে তারা কহিলেন—"নওয়াগড়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় শেষ হইল। সন্ধ্যা ব'য়ে গেল—মায়ের সেবা বন্ধ। পূজাও বোধ হয় এই শেষ; কিন্তু অন্ধকার মত কোন ব্যবস্থা হওয়া চাই।

গুরুজী—তোমার ইচ্ছা কি?

তারা—একদল কীর্ত্তনীয়া সহ জনৈক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে নওয়া-

গড়ে প্রেরণ করুন। তাহারা যাইয়া রীতিমত সন্ধ্যারতি ও কীর্ত্তন করে।

মাদল ও করতাল সহ একদল রাট ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ নওয়াগড়ে প্রেরিত হইল। তারা তাহাদিগকে যথারীতি আরতি ও ভোগান্তে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণগণ নওয়াগড়ে উপস্থিত হইয়া মায়ের মন্দিরের সম্মুখে মাদল বাজাইয়া ঘোর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আরতি ও চলিল। গুগ্‌গুলের গন্ধে গড় আমোদিত হইল। মাদলের রবে ও সে মনোহর গন্ধে মোহিতলাল চমকিয়া উঠিলেন; সে বিস্ময়কর ঘটনার মর্ম্মোদঘাটন করিতে গিয়া জানা গেল যে আগন্তুকগণ ভবানীপুরস্থ ভবানীর মন্দির হইতে মায়ের সেবার জন্য আসিয়াছে; উহারা অকপট রাট ব্রাহ্মণ, ঠগীদের সঙ্গে ইহাদের কোন সহানুভূতি নাই। ভক্ত মোহিত-লাল সরলভাবে সে কথা বিশ্বাস করিলেন। আরতি ও সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল। আরতি শেষ হইলে মায়ের প্রসাদ লইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ জানাইল। সমস্ত দিন অনাহারে ও যুদ্ধ ক্লেশে ততোধিক তারার চিন্তায় লালজীর শরীর একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া লালজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি আবশ্যক"?

ব্রাহ্মণ—মহাশয়ের জন্য মায়ের প্রসাদ আনিয়াছি, গ্রহণ করুণ। ক্ষুৎপিপাসাকাতর মোহিতলাল সহসা সেস্থানে অপ্রত্যাশিত প্রসাদ পাইয়া ততোধিক বিস্মিত হইলেন। সন্ধ্যারতি,

সঙ্কীর্ত্তন ও এই প্রসাদ সকলই যেন মায়ের মায়া বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌতুহল ও হইল। সেনাপতি আগন্তুকের আপাদমস্তক প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন, রাট হইলেও ঠগীগণের সঙ্গে আকারগত পার্থক্য অনেক। ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডিত, কপালে ত্রিপুণ্ডক ও দৃষ্টি সরল। গলায় রুদ্রাক্ষ, বাহুমূলে ইষ্টকবচ, পরিধানে গেরুয়া; সমস্তই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের লক্ষণ। লালজী কৌতুহল পরবশ হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"এ প্রসাদ কোথা হইতে আসিল" ?

উঃ—মায়ের প্রসাদ, সন্তানের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

প্রঃ—কে পাঠাইয়াছে ?

উঃ—জানিনা।

প্রঃ—প্রত্যহই কি এই রূপ আরতি হয় ?

উঃ—এখানে হয় কি না জানিনা কিন্তু ভবানীর মন্দিরে প্রত্যহ হইয়া থাকে। জনৈকা ভৈরবীর ইচ্ছাক্রমে মন্দিরাধ্যক্ষ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, বোধ হয় এ প্রসাদও সেই ভৈরবীর নিদেশক্রমেই সরকারের জন্য আসিয়াছে।

প্রঃ—গুরুজী কে ?

উঃ—ভবানীর মন্দিরাধ্যক্ষ—পণ্ডিত বাসুদেব শাস্ত্রী !

প্রঃ—আর সে ভৈরবী ?

উঃ—তাহা জানিনা—সম্ভবত নবাগতা।

প্রঃ—আপাততঃ ভৈরবী কোথায় আছেন ?

উঃ—ভবানীপুরে ভবানীর মন্দিরে।

এবার মোহিৎলাল বুঝিতে পারিলেন এ ভৈরবী কে।

তাঁহার নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল, ভৈরবী দর্শনের ইচ্ছা অতি বলবতী হইল। সাবধানে মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন—এখান হইতে ভবানীপুর কতদূর ?

উঃ—পার্ব্বত্য পথে তিন ক্রোশ মাত্র।

"আমি ভবানীর মন্দিরে যাইব, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল" বলিয়া প্রসাদ বাহককে বকশিশ স্বরূপ দশটী মুদ্রা প্রদান করিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ আশাতীত অর্থলাভে পরম প্রীত হইয়া সহর্ষে উৎসাহভরে কহিল—"তাহাতে আর ভাবনা কি ? হুকুম হইলে এখনই সরকারকে পৌঁছাইব।

"তবে তুমি একটুকু অপেক্ষা কর. আমি কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আসিতেছি"—বলিয়া মোহিতলাল ত্রস্তভাবে প্রসাদ-হস্তে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়া অনতিবিলম্বে বাহিরে আসিয়া প্রসাদ বাহককে বলিলেন—চল ঠাকুর জি—আমি প্রস্তুত।

'বান্দা হাজির হ্যায়'—বলিয়া তিনহস্ত পরিমিত একখণ্ড বংশযষ্টি হস্তে ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলে মোহিতলাল 'শ্রীহরি' বলিয়া তাহার অনুগমন করিলেন। উভয়ে নীরবে পথ চলিতে চলিতে অনেকদূর আসিলেন; পথে উভয়ের মধ্যে এইরূপ আলাপ হইল—

প্রঃ—ভাল, তোমার নাম কি ?

উঃ—পাঁড়ে ভকৎমল।

প্রঃ—মন্দির আর কতদূর ?

উঃ—আমরা অর্দ্ধেক-পথ আসিয়াছি।

প্রঃ—রজনী গভীর হইতে চলিল—এতক্ষণে হয়ত মন্দিরের

দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, বোধ হয় ভবানীর চরণ দর্শন হইবে না।

উঃ—ভক্তের বাসনা অসম্পূর্ণ থাকে না, ভৈরবী হয়ত আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় আছেন।

প্রঃ—ইতিপূর্ব্বে ভৈরবীকে কখনও দেখিয়াছ কি?

উঃ—ভৈরবী নাকি সর্দ্দারজীর কন্যা; ভবানীপুরে যাতায়াত প্রায়ই আছে।

চলিতে চলিতে পথ আর ফুরায় না; যতই পথ চলিতেছেন, দূরত্ব যেন ততই বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী দর্শনেচ্ছা প্রবল হইতেছে। সেই আশায়—সেই উৎসাহে রণ-ক্লান্ত লালজী পথ চলিতেছেন; দুর্গম পার্ব্বত্য পথ, বারবার পদস্খলন হইতেছে—কখন ও বা শিলাখণ্ডে আঘাত লাগিতেছে কিন্তু সেদিকে লালজীর লক্ষ্য নাই। ক্রমে পথ ফুরাইল, ক্রমে তাহারা মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিলেন; কিন্তু হায়, মন্দিরের দ্বার-রুদ্ধ। পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ, ভিতরে কেহ নাই। তদ্দৃষ্টে মোহিতলালের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল। তিনি মন্দিরের সোপানোপরি বসিয়া পড়িলেন; সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—আশা ত ফুরাইল, কিন্তু কষ্ট ফুরায় না। ভৈরবীর সাক্ষাৎ না পাইয়া পাঁড়েজীও বিষণ্ণ ও লজ্জিত হইল; বিষাদের কারণ—হুকুম তামিলীর বকশিশ! ভকৎমল সহজে সে আশা ছাড়িবার পাত্র নহে; বাহ্যিক উৎসাহস্বরে কহিল,—প্রভো হতাশ হইবেন না—ভৈরবী সম্ভবতঃ গড়েই ফিরিয়া গিয়াছেন;

চলুন্ আমরা ও ফিরিয়া যাই, হয় ত অর্দ্ধপথেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব।

মোহিত—পাঁড়েজি! আর চলিবার শক্তি আমার নাই; দৃষ্টি অন্ধকার—অদৃষ্টে কেবল কষ্টই সার! আমি আপাততঃ অন্য কোথাও যাইব না; তুমি স্বচ্ছন্দে স্বগৃহে যাইতে পার, তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে!

ভকৎ—বান্দা প্রভুর দাস, সরকারকে ছাড়িয়া কোথাও আমার স্থান নাই।

মোহিত—সে কি ভকৎমল? তুমি আমার জন্য কেন কষ্ট করিবে?

এ কথায় ভকৎমল প্রাণে আঘাত পাইল; তাহার প্রাণে নির্ব্বাণ শোকানল জ্বলিয়া উঠিল; ভকৎমল অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিল, "জনাব, এ অভাগার পক্ষে সংসার শ্মশান। মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, স্ত্রী পুত্র সকল চলিয়া গিয়াছে, আমার বলিতে আর কেহ নাই।" উদ্বেলিত শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রোধ হইল—নয়নজলে ভকৎমলের পরিধান বসন সিক্ত হইল। তাহার মানসিক কষ্ট দেখিয়া মোহিত-লাল ক্ষণকালের জন্য আত্মকষ্ট ভুলিয়া গেলেন; পরের অশ্রু-বিন্দু দেখিয়া যাহার চক্ষে জল আসে, সেই মানুষ। মোহিত-লাল ভকৎমলকে আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, "সে ভাল কথা, আমিও একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী খুঁজিতেছি, ভবানীর ইচ্ছায় আজ মিলিয়া গেল; তুমি দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে প্রস্তুত আছ?

ভকৎমল রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল—“আমার পক্ষে বিদেশই বিরাম স্থল।”

মোহিত—তোমার গৃহ সামগ্রীর কি ব্যবস্থা করিবে?

ভকৎ—যাহা কিছু ছিল ভবানীর সেবায় লাগিয়াছে।

মোহিত—ঘর বাড়ী——?

ভকৎ—সেও অযত্নে ধ্বংস হইয়াছে।

মোহিত—চল আমরা এ রাত্রির মত তোমার সে ভগ্ন গৃহেই অবস্থিতি করিব। এখন আর অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছা নাই।

ভকৎ—মাপ করিবেন, প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে পারিব না; এ জীবনে আর সে প্রেতপুরে প্রবেশ করিব না।

মোহিতলাল বুঝিতে পারিলেন, দারুণ মনোকষ্টে ই ব্রাহ্মণ গৃহ ত্যাগ করিয়াছে; সে গৃহ দর্শনে ইহার কষ্ট বাড়িবে বই কমিবে না। নিবান আগুণ জ্বালাইয়া লাভের অংশে দুঃসহ মর্ম্ম যাতনা। সুতরাং নওয়াগড়ে প্রত্যাবর্ত্তনই সঙ্গত। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত; ঘোর অন্ধকার; সুনীল আকাশে অনন্ত তারকামালা—সে আঁধারে যেন আর ও উজ্জ্বল। জগৎ গভীর নিস্তব্ধ; সে নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া দুইজনে পুনঃ সেই দুর্গম পার্ব্বত্য পথে গড়ের দিকে চলিতে লাগিলেন।

আর ভৈরবী? যুদ্ধান্তে ই ভবানীপুরে পৌছিয়া গুরুজীর সাহায্যে নওয়াগড়স্থ মায়ের আরতির বন্দোবস্ত করিয়া রাত্রি কিঞ্চিদধিক হইলে পুনরায় নওয়াগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। গড়ে পৌছিয়া হতভাগ্য হত পীণ্ডারীগণের সৎকারের যথারীতি

বন্দোবস্ত করিলেন এবং ক্ষিপ্রার জলে অবগাহন করিয়া ৺কালী মায়ীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মায়ের আনন্দময় মন্দিরে আজ সব নিরানন্দ। ভক্তিভরে মায়ের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া বিদায় লইলেন। সেখান হইতে রক্ষীগণের অজ্ঞাত পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সেখানেও সব নিরানন্দ। প্রলয়ে সোহাগিনী মাধবী লতা যেন সহকারস্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা; কুসুমিতা কুঞ্জলতা বিগত শোভা —যেন পদ বিদলিতা। রমা, অনুপমা, ফুলেশ্বরী, ফুলকুমারী ও অন্তপুর পরিচারিকাগণ—সকলেই বন্দী। সে দৃশ্যে তারার চক্ষে জল আসিল; কাঁদিতে কাঁদিতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন; প্রাচীরের গায়ে কালীমায়ীর একখানি চিত্রপট ঝুলান ছিল; সেখানি ও অন্যান্য কয়েকটী আদরের জিনিষ একটী ক্ষুদ্র পেটিকায় বন্ধ করিয়া "কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে" বলিয়া শয়ন কক্ষ হইতে গুপ্ত পথে বহির্গত হইলেন, আর সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন না। তারা গাহিত—"আমি সুখ জানি না, দুখ বুঝি না, হরি নামে সব যাই ভুলে"। তারা এতকাল সদানন্দ ছিলেন, তাই কেহ তাহার চক্ষে জল দেখে নাই। আজ তারা আত্মহারা—পাগলিনী —নিরাশ্রয়া—বান্ধবহীনা; - কোথায় যাবেন, কাহার কাছে মনের কথা বলিবেন, সে ভাবনায় আজ তারার বিগলিত অশ্রুধারা।

এদিকে গড়ে ফিরিয়া মোহিতলাল যাহা শুনিলেন, তাহাতে মনে আবার নূতন এক খটকা বাজিল; এক অভিনব

সন্দেহ উপস্থিত হইল। রক্ষীগণ জানাইল—ক্ষণকাল পূর্ব্বে এক কালভৈরবী আসিয়া পীণ্ডারীগণের শবদেহ গুলি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সে মূর্ত্তি সাক্ষাৎ উগ্রচণ্ডী, করাল বদনী—চক্ষু দুটী যেন দুটী জ্বলন্ত মশাল; হস্তে শাণিত ত্রিশূল; সেই ত্রিশূলাগ্রে শবগুলিকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষিপ্রার অতল জলে ডুবাইয়া গেল—আর ভাসিল না। সে দৃশ্যে মনে হয়, এ গড় প্রেতপুরী—নরমাংসখাদক পিশাচদলের লীলাভূমি!

সে কথা শুনিয়া লালজীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে এ ও সেই ভৈরবীরই লীলা। রক্ষীগণের ত্রাস দূর করিবার জন্য লালজী কহিলেন, "ঘটনা নিতান্ত অস্বাভাবিক বটে কিন্তু মায়ের মন্দিরপ্রাঙ্গনে ভুতযোনীর আগমন অসম্ভব। আমিও ভৈরবীর অনুসরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আঁধারে কোন্ পর্ব্বতকন্দরে লুকাইল, আর সন্ধান পাইলাম না।" সে কথা শুনিয়া হাবেলদার কহিল, "লালজি—ভীম ভৈরব না হইলে সে কাল ভৈরবীর অনুসন্ধান অসম্ভব।" 'ভাল তাই হবে' বলিয়া লালজী বিশ্রামার্থ শিবিরে চলিয়া গেলেন। রক্ষীগণের উপর আদেশ রহিল, আবার সেই ভৈরবী আসিলে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।

সে রাত্রি পোহাইল; ক্রমে আর ত্রিযামিনী কাটিল; কিন্তু সে ভৈরবী আর সে শ্মশানক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইলেন না। পঞ্চম দিনে বন্দীগণ সহ ইংরাজ ফৌজ উদয়গিরিতে উপস্থিত হইল। নব-বিজিত গড় রক্ষার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া এবং অন্তঃপুরবাসিনীদের বন্দীত্ব মোচন করিয়া স্বয়ং

সৈন্যাধ্যক্ষ উদয়গিরিতে ফিরিলেন। মেজর সাহেব মহোল্লাসে লালজীকে অভ্যর্থনা করিয়া স্মিত বচনে কহিলেন;—"এত দীর্ঘ কালের চেষ্টায় ঠগীদমন কার্য্যে পরিণত হইল।" লালজী কহিলেন, "ঠগী দমন হইল বটে—কিন্তু অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধন এখনও হয় নাই!

মেজর—তাহার সংবাদ কি?

মোহিত—যুদ্ধান্তে কোথায় পর্ব্বত কন্দরে লুকাইয়াছে।

মেজর—তাহার উদ্ধারের কি ব্যবস্থা হইয়াছে?

মোহিত—তাহাকে ধৃত করা আমাদের অসাধ্য—সে ভারও কল্যাণ সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। বিচারের দিনে তাঁহারাই সে কন্যাকে উপস্থিত করিবেন।

মেজর সাহেব ভাবিলেন—সম্পূর্ণ রণজয়। ঠগী দমন ও ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধন—এবার পদোন্নতি নিশ্চিত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শব-সাধন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম কল্প।

উপস্থিত কল্যাণ সকল বিষয়ের কেন্দ্রস্থল। উদয়গিরিতে ফৌজের ছাউনি মাত্র; কিন্তু লালজী প্রমুখ সৈনিকগণ অধিকাংশ সময় কল্যাণে থাকেন; উদ্দেশ্য—মায়ের প্রসাদ লাভ। কল্যাণ সম্প্রদায়ের অগ্রণী স্বামীজী,—স্বামীজীর উপদেশ ভিন্ন লালজী একপদ ও চলেন না। স্বামীজীর পরামর্শ মতে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত ঠগীগণ ও ক্রমে ক্রমে ধৃত হইতে লাগিল। অনুপায় ও নিঃসহায় হইয়া অনেক পীণ্ডারী পুনঃ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিল। নাগপুর ও মধ্য-প্রদেশ এক প্রকার নিরাপদ হইল। এখন বন্দীদের পরিণাম কি—তাহাই দ্রষ্টব্য।

শান্তশীল বন্দী, কিন্তু আহত বলিয়া কল্যাণে স্বামীজীর চিকিৎসাধীন আছেন। তাহার আঘাত তেমন গুরুতর নহে; বিশেষতঃ দয়াময়ী জয়ার যত্নাতিশয্যে ও স্বামীজীর প্রসাদে সে আঘাত জনিত কষ্ট অত্যল্পকাল মধ্যেই উপশমিত হইল। এদিকে মুমূর্ষা ভৈরবী ও কল্যাণীর কল্যাণে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন সুস্থ ও সবল হইতে লাগিলেন। সেজন্য আর জয়াকে খাটিতে হয় না। ভৈরবী এখন রোগমুক্তা।

যুদ্ধান্তে হৃতধন চঞ্চলারত্ন আসিয়া মায়ের কোলে বসিয়াছে। আজ আর ভৈরবীর আনন্দের সীমা নাই। দীর্ঘকাল পর চঞ্চলাকে পাইয়া বিন্দুর চিত্ত প্রফুল্ল,—হৃদয় উল্লসিত। বিন্দুবাসিনীর আনন্দে স্বামীজীর ততোধিক আনন্দ। ভৈরবীর স্নেহ ও যত্নে সেই নিবিড় নদীসৈকতে স্বামীজী সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, আবার তাঁহারই চেষ্টায় ভৈরবী নব প্রাণ পাইয়াছেন। আর যে প্রাণের প্রাণ প্রেম-পুত্তলিকার জন্য বিন্দু গৃহত্যাগিনী হইয়াছিলেন, সে হারাধন পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, এ সকল ই কল্যাণীর ইচ্ছা। কল্যাণ আজ করোঞ্চার প্রভাসক্ষেত্র। পিতার সঙ্গে পুত্রী, মায়ের সঙ্গে মেয়ের সাক্ষাৎ—ততোধিক প্রোষিতভর্ত্তৃকার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে পতির সন্দর্শন প্রকৃতই অপূর্ব্ব প্রভাস মিলন।

কল্যাণীর অনুগ্রহে ভৈরবী ও শান্তশীল সম্পূর্ণ সুস্থ। জয়ার ইচ্ছা আর কাল বিলম্ব না করিয়া পতি ও পত্নীর শুভ-সম্মিলন হয়। জয়া সুচতুরা, শান্তশীলের আন্তরিক বাসনা ও ভৈরবীর জন্য তাহার প্রাণের টান কতদূর বদ্ধমূল, তাহা পরীক্ষা করা

ও শান্তশীলের উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়তরঙ্গে আঘাত করিয়া একটুকু রঙ্গ দেখিবার জন্য কূট চাল চালিলেন; মায়ের প্রসাদী ফুলে মালা গাঁথিয়া শান্তশীলের গলে দিলেন। শান্তশীল মানসিক কষ্টের মধ্যে ও একটুকু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিলেন,—দেবি, একি রঙ্গ!

কল্যাণে জয়া দেবী বলিয়া পরিগৃহীতা।

জয়া—আজ তোমার বিবাহ।

শান্ত—সে কি—কন্যা কোথায়?

জয়া—আমার একটী পীড়ারী সখী আছে, সমবয়স্কা নহে—বাল সখী! সখীর বিবাহের বয়স হইয়াছে কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাই নাই বলিয়া সখীকে পাত্রস্থা করিতে পারিতেছি না। আমার বাসনা, তাহারই সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়!

শান্তশীল মর্ম্মান্তিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—দেবি, আমি যে মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ বিবাহিত!

জয়া এবার সুযোগ পাইলেন; বিমর্ষের ভাণ করিয়া কহিলেন—কি তুমি ব্রাহ্মণ? তবে তোমার এ দশা কেন? তুমি কুলকলঙ্ক; ছি! মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ও কি ঠগী হয়?

এ কথায় শান্তশীলের কঠোর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল; ভীষণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। বাষ্পাকুললোচনে কাতর বচনে কহিলেন,—"আমি প্রকৃতই কুলকলঙ্ক! ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচয় দেওয়ার অযোগ্য। আমি মহাপাপী—যৌবনকালে কুসংসর্গে পড়িয়া পতিপ্রাণা

সংসার ললাম সরলা স্ত্রীকে জীবনের সুখে বঞ্চিত করিয়াছি—আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু !

জয়া—তবে মরিলে না কেন ?

শান্ত—সেও বোধ হয় জয়ার অনুগ্রহে, শত্রু ও আমাকে দয়া করিলেন ! বুঝি ভোগ আর ও আছে।

জয়া—পরিত্যক্তা পত্নীকে পুনঃ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বোধ হয় ভোগের শেষ নাই !

শান্ত—সে ও জয়ার ই হাত—আর কল্যাণীর ইচ্ছা।

অতিশয় বিস্ময় সহকারে জয়া কহিলেন, সে কি—তোমার প্রণয়িনী কোথায় ?

শান্ত—নবাগতা ভৈরবী—৺শিবপ্রসাদ কন্যা—বিন্দুবাসিনী।

জয়া—এ পরিচয় যথেষ্ট নহে।

শান্ত—দেবি, সে অঙ্গুরীয় কি নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নহে ?

জয়া—সে কথা বিচারাধীন ; ভাল, ভৈরবী যদি তোমাকে পতি বলিয়া স্বীকার বা গ্রহণ করিতে না চাহেন, তবে উপায় ?

শান্ত—অতি সহজ—মৃত্যু !

জয়া—মৃত্যু কি ইচ্ছাধীন ? আত্মহত্যা যে মহাপাপ !

শান্ত—বোধ হয় ততদূর ভাবিতে হবে না, সর্দ্দারজীর সঙ্গে ঠগী মাত্রকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

জয়া—সেটী যাহাতে না হয়, সেজন্য স্বামীজী বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। স্বামীজীকে জানেন ?

শান্ত—না—আমি কল্যাণে আসিয়া ক্রমেই যেন আঁধারে ডুবিতেছি, দিন দিন দৃষ্টিহীন হইতেছি !

জয়া—কল্যাণীর অনুকম্পায় হয় ত আবার দিব্য চক্ষু পাইবেন।
ভৈরবীর সংবাদ কিছু রাখেন ?

শান্তশীল আগ্রহ সহকারে কহিলেন,—"সাহস করিয়া সে কথা
জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই—তিনি কেমন ?

জয়া—সম্পূর্ণ সুস্থ—রাহুবিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় প্রফুল্ল! কিন্তু
সে প্রফুল্লতায় যেন একটুকু কালিমা আছে—একটু
চিন্তার রেখা রহিয়াছে! কিঞ্চিৎ আকুল, যেন কাহারও
দর্শনাশায় ব্যাকুল! কি যেন পাইবার জন্য ব্যস্ত
অথচ সঙ্কুচিত! অঙ্গুরীয় দেখিয়া বলিয়াছেন যে ইহা
স্বামীকে প্রদত্ত অঙ্গুরীয় বটে; কিন্তু তিনি যে এখনও
জীবিত আছেন এবং অর্থাভাব সত্বেও যে এতকাল
ইহা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহার বিশ্বাসযোগ্য
প্রমাণ কি ?

শান্তশীল আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। জয়ার
দুইটী পা ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। জয়া অতি
কষ্টে পা ছাড়াইয়া লইয়া স্মিতমুখে কহিলেন,—ছি, মিছির জি!
একি তোমার ব্যবহার ? তুমি সুব্রাহ্মণ হইয়া আমার পায়ে
পড়িতেছ ? ইহাতে যে আমার মহাপাপ হবে, আমি যে যোগিনী!
তুমি পীণ্ডারী অধ্যক্ষ, তুমি নরঘাতক, তুমি ঠগী বীর! তুমি
কত রমণীর প্রাণ লইয়াছ, আর আজ কি না সামান্য যোগিনীর
পায়ে পড়িয়া কাঁদিতেছ। এ লজ্জা রাখিবার স্থান নাই,
যদি কখন তোমার পত্নীর সন্ধান পাই, তবে একথা তাঁহাকে
বলিব।

সে তীব্র মিষ্ট ভৎর্সনায় শান্তশীলের মর্ম্মজ্বালা অনিবার্য্য হইল; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, যে মুহূর্ত্তে ঠগী দলসহ বন্দী হইয়াছি, সেই হইতেই বলবীর্য্য, সাহস, অধ্যবসায় ক্ষিপ্রার প্রবল প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়াছে; কেবল এক সামান্য আশা সূত্র ধরিয়া বাঁচিয়া আছি; যদি—বলিতে বলিতে শান্তশীলের কণ্ঠরোধ হইল; আর কি বলিতে চাহিতে-ছিলেন, কিন্তু সে কথা কণ্ঠনালীর অর্দ্ধপথে আট্‌কাইয়া গেল, আর ফুটিল না।

জয়া—'যদি' কি?

উঃ—যদি ভৈরবীর সাক্ষাৎ না পাই, এ পোড়া প্রাণ ও বিসর্জ্জন করিব।

প্রঃ—তৎপূর্ব্বে দুই একটী কথা জানিতে চাই, সদুত্তর পাইলে সুখী হইব।

শান্ত ঃ—আপনার নিকট কোন কথা লুকাইব না!

প্রঃ—তারা কে?

উঃ--চিতুসর্দ্দারের পালিতা—ঠগী কর্ত্তৃক অপহৃতা ব্রাহ্মণ-কন্যা!

প্রঃ—তবে তারা জাতিতে পতিতা--পীণ্ডারীর অন্নে প্রতিপালিতা?

উঃ—সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমার ও তারার জন্য কালীমায়ীর প্রসাদ নিত্য বরাদ্ধ ছিল। আমরা পীণ্ডারী-স্পৃষ্ট অন্ন কখনও উদরস্থ করি নাই। আমরা জাতিভ্রষ্ট হই নাই।

একথা শুনিয়া জয়ার ভাবান্তর হইল; তিনি হাসিতে

হাসিতে কহিলেন "আপনার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় নাই জানিয়া সুখী হইলাম। নৈরাশ হইবেন না, মায়ের ইচ্ছায় সকলই সম্ভবে! যতদূর জানা গিয়াছে, ভৈরবী ৺শিবপ্রসাদকন্যা বিন্দু।

শান্ত—বিন্দুকে না দেখিয়া স্বর্গে গেলেও সুখ নাই! মনে হয় একবার দেখা পাইলে প্রাণের ব্যথার লাঘব হইত!

জয়া—সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা; কিন্তু পীণ্ডারী বেশে দেখা করা সঙ্গত হবে না। আপনি বেশ পরিবর্ত্তন করুন; আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করিবেন—বলিয়া জয়া আপন কুটীরে চলিয়া গেলেন।

জয়া রোগীনিবাস হইতে ফিরিবার সময় পথে মোহিত লালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, লালজি কুশল ত?

উঃ—সমস্ত কুশল কিন্তু কিঞ্চিৎ অকুশল। যুদ্ধান্তে তারা অন্তর্দ্ধান হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহার খোঁজ খবর নাই—বলিয়া সে রাত্রির ঘটনা সমস্ত বিবৃত করিলেন। সে কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া জয়া কহিলেন, সে জন্য তত ভাবিতে হবে না; গড় অধিকৃত ও শত শত ঠগীসহ ঠগীপতি চিতুসর্দ্দার বন্দী হইয়াছে, ঠগী দমনই এ যুদ্ধযাত্রার মূখ্য উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার গৌণ উপলক্ষ মাত্র। কল্যাণীর ইচ্ছায় সে বিষয়েও অকুশল হবে না।

মোহিত—যতক্ষণ না সে ব্রাহ্মণ-কন্যা আমাদের হস্তগত হইতেছে, ততক্ষণ আর শান্তি নাই। সে ব্রাহ্মণ কন্যাকে না দেখিলে কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্বাস করিবেন কেন?

জয়া—তা ত বুঝিলাম, কিন্তু তাহাকে হস্তগত করা সুকঠিন।

মোহিত—সে কথা জানিতে বাকি নাই; তারার কার্য্যকলাপ সকলই অমানুষিক। দ্বিতীয় কথা—কোষাধ্যক্ষকে অষ্টাহ অন্তে উদয়গিরিতে উপস্থিত করিতে হইবে, সেদিন বন্দীগণের বিচার হইবে।

জয়া—তাহার জন্য কি দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে?

মোহিত—তাহাতে আমার হাত নাই; বিচারের জন্য স্বতন্ত্র বিচারপতি আসিতেছেন।

জয়া—স্বামীজী ও গোসাঞী যে এত করিলেন, তাঁহাদের কার্য্যের কি পুরস্কার কিছু নাই?

মোহিত—ইংরাজরাজ সদাশয় ও সুবিবেচক; মহাপুরুষদের অনুরোধে অপরাধ ক্ষমাও করিতে পারেন।

জয়া—আমার একটি সামান্য অনুরোধ আছে, রক্ষা করেন ত বলি।

মোহিত—সাধ্যায়ত্ত ও সম্ভবপর হইলে অবশ্যই আপনার অনুরোধ সর্ব্বাগ্রে রক্ষিত হইবে, কিন্তু তারা—

জয়া—তারা কি?

মোহিত—আপনি ভৈরবী, আপনি দেবী, আপনাকে মনের কথা বলিতে আশঙ্কা বা লজ্জা নাই; সেই অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যা এ হৃদয়াকাশের ধ্রুবতারা—সে যোগিনী জীবন সর্ব্বস্ব!

সে কথা শুনিয়া কপট বিস্ময় সহকারে জয়া কহিলেন—"সে কি লালজি! তারা ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও ঠগীর অন্নে প্রতি-

পালিতা, জাতিতে পতিতা ; হিন্দুর আচার ব্যবহার বিবর্জ্জিতা ও স্বাধীনচেতা। এ বিবাহে আপনার কুলমর্য্যাদা রক্ষা পাইবে কেন ?

মোহিত—সে কথা ভাবিবার সময় আর নাই ; কুল ছাড়িয়া অকুলে ভাসিয়াছি—কেবল ডুবিতে বাকী !

জয়া—অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া এতদূর অগ্রসর হওয়া বোধ হয় সঙ্গত হয় নাই ; এ বিবাহে তারার মত হবে কিনা সন্দেহ।

"মত করিবে কিনা জানিনা" বলিয়া সেই ঘোর নিশিতে শৈলশৃঙ্গে সাক্ষাৎ ও উভয়ের মধ্যে কথোপকথন সমস্ত খুলিয়া বলিলেন ; আর জানাইলেন যে তাঁহার প্রদত্ত বিষ প্রতিষেধক অঙ্গুরীয় ব্যবহারেই ঠগীবিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ; প্রিয় অশ্ব ও অনেক ফৌজ তদুপায়েই বাঁচিয়া গিয়াছে। জয়া বুঝিলেন সাগরে বাণ ডাকিয়াছে, এখন আশাতরী রক্ষা পাইলে হয়। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া জয়া কহিলেন, "এ আলাপে তারার মতামত স্পষ্ট বুঝা যায় না। রাট সমাজের শীর্ষ স্থানীয় কেহ কেহ তারালাভে লালায়িত ; শুনিয়াছি, চিতুসর্দ্দার এ কন্যার বিবাহে সাত লাখ পর্য্যন্ত যৌতুক দিতে স্বীকার করিয়াছেন ; তারা বয়সে বালিকা কিন্তু তারার ভক্তি ভালবাসা, স্নেহ মমতা, সর্ব্বোপরি পরদুঃখ বিমোচনের ইচ্ছা ও চেষ্টা বৃদ্ধার ও অনুকরণ যোগ্য ! তারার অমিত সাহসের সঙ্গে কোমলতা, কমনীয় কান্তির সঙ্গে সুন্দর বদন শোভা ও রমণী সুলভ লজ্জা—এ তিনের

একত্র সম্মিলনে তারাকে দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মে! রত্নই রত্নের অনুসরণ করে, এখন প্রজাপতির কি ইচ্ছা কে জানে?

মোহিত—আমি অতি অমানুষ; আমি সাধ করিয়া কালসর্প হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছি, ইহার পরিণাম অতি ভীষণ!

জয়া—আপনি কি এ পর্য্যন্ত দার পরিগ্রহ করেন নাই?

মোহিত—কখন ও যে করিব, সপ্তাহ পূর্ব্বে একথা মনে ও আসে নাই।

জয়া—আপনি ভগ্নোৎসাহ বা নৈরাশ হইবেন না; তারার কথার অন্যথা হয় না; অবশ্যই পুনঃ দেখা হইবে। সুবিধা পাইলে তাহার মনের কথাও জানিতে চেষ্টা করিব।

মোহিত—আপনার সৌজন্যতায় সুখী হইলাম; পুনঃ সাক্ষাৎ কোথায় পাইব?

জয়া—কল্যাণে কল্যাণীর মন্দিরে। না হয় বিচারের দিনে উদয়গিরিতে।

মোহিত—উদয়গিরিতে কি প্রয়োজন?

জয়া—বন্দী শান্তশীলের জীবন ভিক্ষা।

মোহিত—আর কিছু?

জয়া—তেমন বিশেষ কিছু নহে; নবাগতা ভৈরবী একটী শারিকা পুষিতেন, একদিন শিকলি কাটিয়া পাখীটী কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল, এতকাল পর সে ধরা দিয়াছে; উদয়গিরিতে নাকি অনেক শুকের আমদানী হইবে, একটী শুকপাখী ধরিতে পারি ত আদরে পুষিব;

আর "সোহাগ করে দিব দোলা, শিখাইব হরিবলা—
খাওয়াইব দুধকলা ; সুখে শাঁক বাজাইব—শুক-শারিকার
বিয়ে দিব।"

মোহিতলাল এ রহস্যের অর্থ বুঝিলেন, নবাগতা ভৈরবী কে—আর তাঁহার পোষা শারিকাই বা কি তাহা তিনি জানিতেন ; তাই ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, আবার শিকলি কাটিবে না ত ?

জয়া—পারিবে না, এবার পাহারা রাখিব ; লালজী বোধ হয় পাহারার কার্য্যে তত পটু নহেন।

মোহিত—আত্ম রক্ষায় নয় বটে কিন্তু পরের জন্য কুণ্ঠিত হইব না।

"পাতি ফাঁদ ধরি চাঁদ আনি দিব কোলে ;
কোলের কাঙালিনী ধনী কাঁদে হরি ব'লে"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে জয়া চলিয়া গেলেন। মোহিতলাল ভাবিলেন একি মায়া ? সত্যই কি কল্যাণ মায়াভূমি !

অনন্তর জয়া গোসাঞীকে আপন ঘটকালীর ফল জানাইলেন। গোসাঞী হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিলেন, মঙ্গলে, তোমার সকল কার্য্যই সুন্দর ও দেবতাবাঞ্ছিত। পরের সুখ খুজিয়াই তুমি সুখী। অভাগিনী ভৈরবীর ভবিষ্যৎ কি কল্যাণী জানেন, কিন্তু উভয়ের মিলন যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল।

জয়া দ্বিতীয় কথা না বলিয়া দৌত্যকার্য্যে চলিয়া গেলেন এবং পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। ভৈরবীর সঙ্গে শান্তশীলের সাক্ষাৎ হইল—চারি চক্ষুর মিলন হইল। প্রথম

দর্শনেই উভয়ে উভয়কে চিনিয়া লইলেন; যুগান্তের বিরহ মুহুর্ত্তেকের দর্শনে ঘুচিয়া গেল। পতি পত্নীর সে অপূর্ব্ব সন্দর্শন কি সুন্দর—ও মনোহর! সুদীর্ঘকালের অদর্শন জনিত সাময়িক শালীনতা কণ্ঠরোধ ও দুষ্ট অশ্রুবারি আসিয়া দৃষ্টিরোধ করিল। ইচ্ছা সত্ত্বেও একে অন্যের মুখ পানে তাকাইতে বা সাহস করিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। উভয়ে নীরব—নিস্তব্ধ; উভয়ে যেন মন্ত্রমুগ্ধ! জয়া অদূরে অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের সে নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি সহকারে ডাকিলেন—'তারা?' তারা কক্ষান্তর হইতে আসিয়া জয়ার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

জয়া হাসিয়া নবদম্পতীকে দেখাইয়া বলিলেন—"ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা কর - ও ভৈরব কে? তোর কে হয়?"

ভৈরবী সুযোগ পাইয়া কহিলেন—"ভৈরবী ছাড়িয়া আবার ভৈরবে দৃষ্টি কেন?"

শান্ত—এ গরিব ব্রাহ্মণ—জয়নন্দন মিশ্র।

লজ্জাভরে মৃদুস্বরে বিন্দু কহিলেন—"তাহা জানিতে বাকী নাই—এ অঙ্গুরীয় ই তাহার প্রমাণ" বলিয়া অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ করিলেন।

মিছিরজী অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তবে আর এ
ভৈরবী বেশ কেন?

ভৈরবী—এ বেশের আদর সর্ব্বত্র—অন্যথা এতদূর পঁহুছিতে
পারিতাম কি না সন্দেহ।

জয়া—থাকিবে না আর যোগিনী, সাজাইব বিন্ধ্যবাসিনী!

তারা—আমি কত জিদ করিলাম, কিন্তু মা এ বেশ ত্যাগ করিতে চাহেন না। মা বলেন, "যে বেশের বলে তোকে পাইলাম—সে বেশ ছাড়িব কেন?"

জয়া—তা বেশ—ছাড়িয়াছ দেশ, ছাড়্‌বে না কো বেশ—দেখি কি হয় শেষ!

রহস্য ছাড়িয়া জয়া আবার কহিলেন,—তারা, ভৈরবী তোর মা নয়—মাসী, আর কোষাধ্যক্ষ মাসীপতি বা মেসো!

'মা নয়—মাসী' একথায় তারার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল, এতদিনে তারা বুঝিল—সে মাতৃহীনা। তারার মনোকষ্ট বুঝিয়া বিন্দু কহিলেন, না তারা—আমি তোর মা, আমি তোর মাসী,—আমি মৃতদেহে প্রাণ পাই, তোর মুখে দেখ্‌লে হাসি।" সে কথা শুনিয়া তারা আহ্লাদে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিলেন; মা সোহাগ করিয়া মেয়েকে কহিলেন—"ঐ ঠাকুরকে প্রণাম কর।" মেয়ে মায়ের আদেশ পালন করিলেন; বিন্দু আবার কহিলেন—গাও তবে—

"বল সে কেমন—যে হৃদয়েরই ধন।
সৃজন পালন যাঁর—যিনি নিত্য নিরঞ্জন—" ইত্যাদি

তারা গলা খুলিয়া গাহিলেন—"বল সে কেমন" ইত্যাদি তারার অনুরোধে জয়া ও জয়ার অনুরোধে বিন্দু গানে যোগ দিলে সমস্বরে সে গান অত্যুচ্চ পঞ্চমে উঠিল; বীণা-বিনিন্দিত সুকণ্ঠ বিনিঃসৃত সে সুমধুর গান শুনিয়া মিছিরজীর প্রাণে এক নূতন ভাবের উদয় হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন

'স্বর্গে আর নরকে কি প্রভেদ'—মন্দার কুসুমে আর পাপীর হৃদয়ে কত বিভেদ! অতঃপর জয়া ও বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া শান্তশীল রুগ্নাশ্রমে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় কল্প।

যুদ্ধান্তে এক এক করিয়া দিনের পর দিন কাটিল; কল্যাণীর প্রসাদে, ততোধিক জয়ার যত্নাতিশয্যে আহত পীণ্ডারী ও ফৌজগণ ক্রমে ক্রমে সুস্থ ও সবল হইল। ভৈরবী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ; সুতরাং জয়াকে আর সে জন্য খাটিতে হয় না। এখন অধিকাংশ সময় জয়া রোগীনিবাসে আহতদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন; একদিন জয়া কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়া কহিলেন, আগামী একাদশীতে বিচারের দিন ধার্য্য হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট দিনে বন্দীগণকে উদয়গিরিতে উপস্থিত হইতে হইবে। সে পর্য্যন্ত আর কাহার রোগ যাতনা বোধ হয় থাকিবে না।" সে কথা শুনিয়া বন্দীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"দেবি! আমরা মরিতে ভীত নহি, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন ও শ্রীচরণ দেখিতে পাই।"

জয়া কাতরভাবে মধুর বচনে কহিলেন,—"ভগবান তোমাদিগকে রক্ষা করুন; আর তোমরা সাধু ও সচ্চরিত্র হও—এই আমার বাসনা।"

এ কথা বলিয়া জয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। বন্দীদের কথায় জয়ার প্রাণে বড় কষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের যে মুক্তি নাই, তাহা জয়া একরূপ জানিতেন—কেবল পাপীকে উপদেশ দেওয়ার জন্য ঐ কথা বলিলেন।

নওয়াগড় পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে তারা কল্যাণে আশ্রয় লইলেন, জয়া সাদরে তারাকে আশ্রয় দিলেন। কল্যাণে

আসিয়া অবধি তারার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল; এখন আর তারার সে সাহস নাই—নিশীথে একাকিনী শৈল-বিহার নাই—স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ যাতায়াত নাই। এ সকল বন্ধ হইল, স্থান মাহাত্ম্যে। তারা এখন রূপসী—ষোড়শী; কাল ধর্ম্মে স্ত্রীসুলভ-শালীনতা—একটুকু আশঙ্কা আসিয়া তাঁহার সরল হৃদয়কে অধিকার করিল। স্বাধীন প্রবৃত্তি ও যথেচ্ছাচারিতা রহিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতির অনেক ব্যতিক্রম ঘটিল। কেবল অপরিত্যজ্য রহিল, বাল্যাভ্যস্ত মধুর গান—আর যৌবনে যোগিনীর বেশ। কল্যাণে সাধিকাগণের যোগিনী বেশ, তাই তারা ইচ্ছা করিয়া সে বেশ ত্যাগ করিলেন না। যোগিনীবেশে তারাকে যেমন সুন্দর দেখায়—অন্য বেশে তেমন টী দেখায় না।

একদা প্রদোষকালে কুটীরসম্মুখস্থ অশোক তরুমূলে নাতি পরিসর উপলখণ্ডোপরি উপবিষ্টা মায়ের বক্ষে মস্তক রাখিয়া তারা আপন মনে গাহিতেছিলেন—"হরি আমায় কর কোলে; আমি কোলের কাঙালিনী—ডাকি হরি হরি ব'লে" ইত্যাদি। সাধের কাকাতুয়া তরুশাখে ঝুলান দোলায় দুলিতেছিল; দুলিতে দুলিতে কাকাতুয়া গানে যোগ দিল; বিন্দু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গান শুনিতেছিলেন; সে গানে বিন্দুর ভাবাবেশ হইল—চক্ষে জল আসিল; দুই ফোটা অশ্রুবিন্দু চঞ্চলার কপোলদেশে পতিত হইলে, চমকিত ভাবে চঞ্চলা কহিল—"সে কি? আজ তুমি গান শুনিয়া কাঁদিতেছ কেন?

বিন্দু—জানি না, ও গানে কি মোহ আছে ? আবার গাও—
"হরি আমায় কর কোলে !"

চঞ্চলা—না মা, তুমি কাঁদিতেছ, আমি আর ও গান গাইব না—বলিয়া ইতিপূর্ব্বে সংগৃহীত বিবিধ কুসুমভার লইয়া চঞ্চলা মালা গাঁথিতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে মা ও মেয়েতে কত কথা হইল ; কয়েকটী মাত্র পাঠক ও পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি :—

মেয়ে—কতকাল করোঞ্চা ছাড়িয়াছ ?

মা—এক যুগ—দ্বাদশ বর্ষ।

মেয়ে—আবার কবে দেশে যাবে ?

মা—আমাদের এমন কোন্ বিষয় সম্পত্তি, বন্ধু, বান্ধব আছে যে সে মায়ায় দেশে যাইতে হইবে ?

মেয়ে—কেন মা, সে অশোক তরু—সে বকুল গাছ ? আর তাহার পাশে পাশে মল্লিকা যুথিকার ঝাড় ?

মা—এতদিনে সে সব বন-বল্লরীতে পরিণত হইয়াছে !

মেয়ে—ময়না মাসী ?

মা—ময়না নয়—মঙ্গলা ; ও নাম তোর মুখে আসিত না। তাঁহাকে কি তোর মনে আছে ?

মেয়ে—এক এক করিয়া বাল্যকালের অনেক কথা মনে আসিতেছে ; জয়া মাসীর ন্যায় তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন, কোলে করিয়া খেলা দিতেন—আর গান শিখাইতেন।

মা—তাঁহাকে কি আবার দেখিতে ইচ্ছা করে ?

মেয়ে—হাঁ মা—বড়ই সাধ যায়, কিন্তু করোঙ্কা যে এখান হইতে
বহুদূর!

সে সময়ে জয়া দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিতেছিলেন; মা কহিলেন ঐ যে কে এদিকে ছুটিয়া আসিতেছেন?'

আগমনকারীকে দেখিয়া মেয়ে হাসিয়া কহিলেন "এ যে জয়া মাসী; না জানি আবার কোন্ দেশ জয় করিয়া আসিতেছেন!"

চঞ্চলার কথা শেষ হইতে না হইতে জয়া আসিয়া তরুমূলে পঁহুছিলেন। চঞ্চলা হর্ষোৎফুল্ললোচনে সাদর বচনে কহিলেন, "মাসি, আজ কার জয়?"

উঃ—আজ ভৈরবীর জয়—তারা ওরফে চঞ্চলা সর্ব্বময়!

বিন্দু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—'এ আবার কোন্ জয়ের কথা!'

চঞ্চলা—বুঝি বা আবার রোগীর বার্ত্তা—আর্ত্তের জন্য মাসীর
বড়ই মমতা!

জয়া—তা নয় লো তা নয়! এবার জয়নন্দনের জয়—এখন
বাঁধতে পার্‌লে হয়!

বিন্দু—বলি দিদি রূপক ছাড়—ব্যাপার খানা কি খুলে বল।

জয়া হাসিতে হাসিতে হাতে কর গুণিতে গুণিতে কহিলেন—

"এক দুই তিন—কাল শুভদিন;
চার পাঁচ ছয়—প্রজাপতির জয়;
দশ বিশ নাহি জানি—জয়নন্দন চায় যোগিনী;
মেঘে শোভে সৌদামিনী—"এ মায়ের আদেশবাণী।"

বিন্দু—এ আবার কোন্ সুদিনের কথা? দুর্দ্দিন কাটিয়াছে, প্রাণধন হাতে পাইয়াছি, আর কি চাই?

জয়া—শুভদিনে আনন্দ করিতে হয়, যোগিনীর বেশে যেন আনন্দ জমাট বাঁধে না।

বিন্দু—মেয়ে কথা মানে না—এ বয়সে কি যোগিনী বেশ শোভা পায়?

সুযোগ পাইয়া কৃত্রিম রোষভরে জয়া কহিলেন, ছি—তারা তোর একি স্বভাব? তোর জন্য যে ফৌজদার এত করিল, শেষ কিনা তোর উদ্ধার হয় নাই বলিয়া মেজর সাহেবের নিকট সেনাপতিকে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইতে হইল। আগামী একাদশী দিনে উদয়গিরিতে দরবার বসিবে; সে দরবারে বন্দীগণের বিচার হবে। সেদিন করোঞ্জার অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যা দরবার-ক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে ফৌজদারের বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা!

তারা—ফৌজদার বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে; দলে দলে ঠগীগণসহ দফাদার বন্দী হইয়াছে, দলপতি ধৃত হইয়াছেন, নওয়াগড় ইংরাজাধিকৃত হইয়াছে; তারা ও মায়ের কোল পাইয়াছে; ফৌজদারের সম্পূর্ণ জয়—তবে আবার অনিষ্টাশঙ্কা কেন?

জয়া—সম্পূর্ণ জয় বটে কিন্তু একটুকু অজয়। ফৌজদার জানাইয়াছেন, যুদ্ধান্তে ব্রাহ্মণকন্যা কোথায় পালাইয়াছে, তাহার সন্ধান হয় নাই; কিন্তু মেজর সাহেব সে কথা বিশ্বাস করিবেন কেন? তাঁহার ধারণা অন্যরূপ!

তারা—তারাকে ধৃত করা ফৌজদারের সাধ্যায়ত্ত নহে; সময়ে তারা নিজেই ধরা দিবে; যাহা হউক, লালজীর সংবাদ কি? তাঁহার কুশল ত!

তারার মুখে লালজীর নামোল্লেখ এই প্রথম। সে উক্তি স্বভাব সুলভ সরলতা মাখা।

জয়া—সম্পূর্ণ আত্মহারা! চেয়ে থাকে আকাশ পানে, তারা দেখ্‌লে হাসে—নইলে কাঁদে।

একথা শুনিয়া তারার একটুকু ভাবান্তর উপস্থিত হইল; ব্রীড়াময় স্মিত বদনখানি একটুকু গম্ভীর হইল; প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে বিষাদ আসিল; তারা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে কি ভাবিলেন, ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন "যদি তাই হয়, তবে দরবারে উপস্থিত হইব কিন্তু তোমাকে ও সঙ্গে যেতে হবে" ইহা বলিয়া তারা আবার মালা গাঁথিতে লাগিলেন, অত্যল্পকাল মধ্যে মালা শেষ করিয়া কহিলেন,—"দেখ দেখি মালা ছড়াটা কেমন হইল?"

জয়া—অতি মনোহর—বরের উপযুক্ত!

"তা নয় মায়ের জন্য গাঁথিয়াছি। মাকে পরাইয়া দেও" বলিয়া জয়ার হাতে দিতে উদ্যতা হইলে জয়া আবার কপট কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "কি আমাকে দিবে না, তবে এ মালা আমি ছুঁইব না।"

তারা নিজের অপরাধ বুঝিয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন, বেশ এ মালাছড়াটী তুমি লও, আমি আর একছড়া গাঁথিতেছি।

মালা গাঁথা তারার বাল্যাভ্যস্ত রোগ বিশেষ। জয়া সাদরে

মালাছড়াটী লইয়া কহিলেন, "তারা মালাতে আমার কি প্রয়োজন? এ মালা হয় ভৈরবীর গলে দিব, নয় গোদাবরীর জলে বিসর্জ্জন করিব।"

তারা—মাসি—সত্যই তুমি রাগ করিলে? যোগিনী কি রাগ করে? রাগ যে যোগে বিরাগ ঘটায়!

জয়া—না তারা আমি রাগ করি নাই, সত্য বল্‌ছি, এ মালা তোর মায়ের কণ্ঠহার হবে।

তারা—সে কি? মা ও যে যোগিনী, মায়ের প্রসাদীফুল ভিন্ন এ ফুলমালা তিনি কণ্ঠে ধারণ করিবেন কেন? এ যোগ জীবনের কি শেষ নাই?

এ কথা শুনিয়া বিন্দু হাসিলেন; হাসিতে হাসিতে কহিলেন, চঞ্চলে, সাধনের কি শেষ আছে? যোগ-সাধন আজীবন—আর এ বেশ বাহ্য উপকরণ!

তারা—না মা—তবে আমি যোগিনী সাজিব না; আজীবন এবেশ আমার ভাল লাগিবে না।

জয়া—তুমি সাধ করে যোগিনী সাজিয়াছ, আবার ইচ্ছা হইলে এ মুহুর্ত্তেই ও বেশ পরিত্যাগ করিতে পার।

"তাই হবে, জাতীয়বেশে দরবারে যাইব; এবেশে হয় ত কেহ চিনিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণকন্যাদের বেশ বিন্যাসে কি কিছু বিশেষত্ব আছে?

বিন্দু—কিছু না—জাতীয় বেশ সাধারণ ও প্রিয়দর্শন।

"তবে আমি এখনই এ বেশ ত্যাগ করিতেছি" বলিয়া তারা অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

বিন্দু হাসিয়া কহিলেন, দেখ্‌লে দিদি, তারার বাল্য স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

জয়া—ফুটন্ত ফুলের হাসি, অতুল অমিয় রাশি, আমি বড় ভালবাসি !

অতঃপর কিছুকাল উভয়ে নীরব;—জয়া অতৃপ্তনয়নে বিন্দুর মুখপানে চাহিয়া আছেন, যেন কি বলিতে চাহেন কিন্তু বলা হইতেছে না, কি ভাবিয়া যেন সঙ্কুচিতা হইতেছেন। সঙ্গত কার্য্যে বিমুখ হওয়া বা সঙ্কোচ করা জয়ার স্বভাব বিরুদ্ধ; জয়া বিন্দুর করযুগল ধারণ করিয়া আদর ক'রে মৃদু মন্দ স্বরে কহিলেন, "বিন্দু, আশাই জীবনের মূল; যে আশায় জীবন ধরিয়াছিলে, কল্যাণীর কৃপায় যদি তাহা পূর্ণ হইল, তবে আর এ ভৈরবী বেশ কেন? কোষাধ্যক্ষ কে, কল্যাণে একথা জানিতে কাহার বাকী নাই; বিশেষতঃ গোসাঞীর ইচ্ছা মায়ের মন্দিরে উভয়ের মিলন হয়। পতিগ্রহণে আর আপত্তি কি?

মিছিরজীর প্রকৃত পরিচয় ইতিপূর্ব্বে ই ভৈরবী পাইয়াছেন; উভয়ের দর্শনে উভয়ের মন ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। জয়া বিন্দুর হিতৈষিণী—অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষিণী; তাঁহাকে মনের কথা বলিতে বিন্দুর লজ্জা বা আশঙ্কা নাই। পতির নষ্ট প্রকৃতির সংশোধন ই বিন্দুর ইচ্ছা; তাই তিনি অম্লানচিত্তে কহিলেন—"আপত্তি কিছু নাই, তবে লোকলজ্জা—আর আচারভ্রষ্ট !

জয়া—পীণ্ডারী হইলেই যে আচার ভ্রষ্ট হয়, সে কথা কিসে আছে? সে হিসাবে চঞ্চলাও পরিত্যজ্যা !

এ কথা শুনিয়া বিন্দুর বদন বিষণ্ণ হইল, কপোলে কালিমার রেখা পড়িল; তাঁহার আশা ভরসা যেন মুহূর্ত্তে অতলে ডুবিয়া গেল; জয়ার কথার উত্তর বিন্দু খুঁজিয়া পাইলেন না; বিন্দুর নয়ন বাষ্পাকুল হইল। বিন্দুকে তদবস্থ দেখিয়া জয়া কহিলেন—"সে জন্য ভাবিতে হবে না, কেহই জাতিতে পতিত নহে। কালীমায়ীর নিত্য প্রসাদ উভয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল; ইহারা পীওারীর স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে বিন্দু কহিলেন—কুল ত্যজিয়া অকুলে ভাসিয়াছি; এখন আর কুলাভিমান কি? কিন্তু ভয়—পাছে গোসাঞীর অপ্রীতির কারণ হয়।

জয়া—সে জন্য চিন্তা নাই। স্বামীজী ও গোসাঞী উভয়েরই নিদেশ, আগামী কল্য শুক্লা ষষ্ঠীতে মায়ের পূজা অন্তে জায়াপতিকে মায়ের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিতে হইবে; সে মিলন সময়ে গোসাঞী ও সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। কল্যাণ পুণ্যক্ষেত্র!

একথা শুনিয়া বিন্দু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনিমিষ লোচনে জয়ার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; উভয়ের চক্ষে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল; "কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে" বলিয়া জয়া বিন্দুকে প্রেমভরে কোল দিলেন; বিন্দু জয়ার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া আকাশপানে তাকাইয়া কহিলেন, জয়ে, তোমারই সার্থক জীবন—নিষ্কাম সাধন! পরের সুখ খুঁজিয়াই তুমি সুখী, আর সে সুখ খুঁজিয়া ই গৃহত্যাগী!

"তোমার ন্যায় পরের সুখ দেখিলেই আমার সুখ—আর

তোমার যোগব্রত ই সার্থক” বলিয়া জয়া গমনোদ্যতা হইলে কাকাতুয়া গাইল ঃ—

"দোল্ দোলা দোল্, হয়না যেন ভুল
হরি হরি ব'ল—সুমধুর বোল।"

তদুত্তরে জয়া কহিলেন—

"কাকাতুয়া কাকাতুয়া, ভৈরবীর কাল হবে বিয়া
থেকে থেকে দিব দোলা, খেতে দিব দুধ ছোলা।"

সহসা মাথার উপর দিয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল ; অদূর বনে ঝিল্লী রব থামিল। রাত্রি তখন প্রহর অতীত। জয়া স্বীয় কুটীরের দিকে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় কল্প।

আজ শুক্লা ষষ্ঠীর সুপ্রভাত; আজ মায়ের ষোড়শোপচারে মহাপূজার বন্দোবস্ত, উদ্দেশ্য ভৈরবীর স্বামী গ্রহণ। আজ মন্দিরে অভিনব ব্যাপার—প্রভাস মিলন। কল্যাণে সকলেই জানিল, ভৈরবী বন্দী শান্তশীলের ধর্ম্মপত্নী; তারা করোঞ্জার অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যা। আর জয়া? ভৈরবীর সমপ্রাণা সখী বা কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী মঙ্গলা, বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া ভৈরবী জয়াকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করেন। ভৈরবীর এ সাধন মঙ্গলার শিক্ষার ফল! আজ মঙ্গলার নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও সাধু কামনার ফলে যুগান্তর পরে পতি ও পত্নীর অপ্রত্যাশিত শুভ-সন্দর্শন। বিন্দুর সঙ্গে শান্তশীল ওরফে জয়নন্দনের একত্র মিলন। সাধু সম্প্রদায়ের চক্ষে সে দৃশ্য অতি মনোরঞ্জন।

পূজান্তে যথাসময়ে মঙ্গলা ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন; বিন্দু কিছুতেই ভৈরবীর বেশ পরিত্যাগ করিলেন না। অগত্যা মঙ্গলা মাজিয়া ঘসিয়া সে চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্কমুখ-খানিকে একটুকু উজ্জ্বল করিলেন, রুক্ষকেশে তেল মাখাইলেন। এদিকে গোসাঞী জয়নন্দনকে সঙ্গে করিয়া রোগীনিবাস হইতে মন্দিরে পৌঁছিলেন; মঙ্গলা ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "গোসাঞি! মায়ের সম্মুখে উভয়ের মিলন কল্যাণীর ইচ্ছা"—উপস্থিত কল্যাণ সম্প্রদায়কে কহিলেন, সমস্বরে বলুন্ সবে—"কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে।" তখন উচ্চৈঃস্বরে মন্দির প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি হইল "কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে"। তদনন্তর গোসাঞীর ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধ স্বামীজী মায়ের

চরণমূল হইতে দুটি প্রসাদী ফুল লইয়া বিন্দু ও জয়নন্দনের মস্তকে দিলেন; দম্পতী ভক্তিভরে স্বামীজীকে প্রণাম করিলে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "বহুকাল পর উভয়ের ছিন্ন হৃদয়গ্রন্থি মায়ের প্রসাদে আজ পুনঃ যুক্ত হইল, আর যেন বিচ্ছিন্ন না হয়"। সে কথা শুনিয়া মন্দিরের মধ্যে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল; পতি ও পত্নী মন্দিরস্বামী ও স্বামিনীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "অনুমতি করুন, আজ হইতে আমরাও মায়ের সন্তান বলিয়া যেন পরিগৃহীত হই"। মন্দিরস্বামী মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন "মা সকলেরই; ভক্তিভরে যে ডাকে, সেই মাকে পায়, সেই মায়ের উপযুক্ত সন্তান বলিয়া সমাদৃত হয়; মা ভক্তিতে বাঁধা; তোমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস আছে—আজ হইতে তোমরা মায়ের সন্তান হইলে"; স্বামীজী কল্যাণকুম্ভ হইতে শান্তিবারি ছড়াইয়া কহিলেন—"সাধু! সাধু! আজ হইতে তোমরা সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করিতে রহ"। জায়াপতি পুনরায় স্বামীজীর পদে প্রণত হইয়া কহিলেন—"ভবদীয় আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য। কায়মনোবাক্যে আমরা সন্তানের কর্ত্তব্য প্রতি-পালন করিব"। ক্ষণকালের জন্য উভয়ে ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গেলেন; নূতন প্রাণে নূতন উৎসাহ আসিল, সন্তানের কর্ত্তব্যপালনে নূতন অনুরাগ হইল। এ মিলনের পরিণাম যে কি—কে জানে?

চঞ্চলা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া এ সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন, সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছেন

না। জয়া চঞ্চলাকে টানিয়া আনিয়া বিন্দু ও গোসাঞীর নিকট উপস্থিত করিল। গোসাঞী কন্যাকে কহিলেন, চঞ্চলে, বিন্দু তোমার মাতৃস্থানীয়া প্রতিপালিকা মাতৃস্বসা; শিশুকাল হইতে তুমি মাতৃহীনা; পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা, এখন ও সে আশা করিও না" বলিয়া ভগ্নহৃদয়ে কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

মঙ্গলা এতক্ষণ নীরব ছিলেন; এখন সুবিধা পাইয়া চঞ্চলাকে কহিলেন, "বুঝিলে ত মিশ্র ঠাকুর কে? আজ ভৈরবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল; আর এই তোর সেই ফুলের মালা" বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত কুসুমহার বিন্দুর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। চঞ্চলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মাসি, আজ কল্যাণে অপূর্ব্ব ঘটনা—আজ প্রাণভরা আনন্দের দিন। মেয়ের মুখে হাসি দেখিয়া মায়ের মুখে হাসি ফুটিল; বিন্দু হাসিভরা মুখে বলিলেন, "মায়ের ইচ্ছায় আমি ও যেন এতাধিক আনন্দ করিবার সুযোগ পাই"। চঞ্চলা সে কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে উত্তর দিলেন—"কল্যাণে মা সদানন্দ; এখানে নিত্য আনন্দবাজার"। মঙ্গলা বিন্দুর দিকে চাহিয়া হাসিলেন ও চঞ্চলার অশ্রুত স্বরে কহিলেন, 'সে ঘটকালী ও আমার হাতে'।

অতঃপর মন্দিরস্বামিনীর নির্দ্দেশে যোগিনীনিবাসের অনতিদূরে ভৈরবীর জন্য একটী ভিন্ন প্রকোষ্ঠের বন্দোবস্ত হইল। জয়ার সঙ্কেত মতে অন্য একটী সেবিকা বিন্দু ও জয়নন্দনকে যথাস্থানে লইয়া গেলে কল্যাণ সম্প্রদায় ও গমনোদ্যত হইল। মন্দিরস্বামীকে উদ্দেশ করিয়া জয়া

চরণমূল হইতে দুটি প্রসাদী ফুল লইয়া বিন্দু ও জয়নন্দনের মস্তকে দিলেন ; দম্পতী ভক্তিভরে স্বামীজীকে প্রণাম করিলে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "বহুকাল পর উভয়ের ছিন্ন হৃদয়গ্রন্থি মায়ের প্রসাদে আজ পুনঃ যুক্ত হইল, আর যেন বিচ্ছিন্ন না হয়"। সে কথা শুনিয়া মন্দিরের মধ্যে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল ; পতি ও পত্নী মন্দিরস্বামী ও স্বামিনীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "অনুমতি করুন, আজ হইতে আমরাও মায়ের সন্তান বলিয়া যেন পরিগৃহীত হই"। মন্দিরস্বামী মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন "মা সকলেরই ; ভক্তিভরে যে ডাকে, সেই মাকে পায়, সেই মায়ের উপযুক্ত সন্তান বলিয়া সমাদৃত হয় ; মা ভক্তিতে বাঁধা ; তোমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস আছে—আজ হইতে তোমরা মায়ের সন্তান হইলে" ; স্বামীজী কল্যাণকুম্ভ হইতে শান্তিবারি ছড়াইয়া কহিলেন—"সাধু ! সাধু ! আজ হইতে তোমরা সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করিতে রহ"। জায়াপতি পুনরায় স্বামীজীর পদে প্রণত হইয়া কহিলেন—"ভবদীয় আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য। কায়মনোবাক্যে আমরা সন্তানের কর্ত্তব্য প্রতি-পালন করিব"। ক্ষণকালের জন্য উভয়ে ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গেলেন ; নূতন প্রাণে নূতন উৎসাহ আসিল, সন্তানের কর্ত্তব্যপালনে নূতন অনুরাগ হইল। এ মিলনের পরিণাম যে কি—কে জানে ?

চঞ্চলা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া এ সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন, সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছেন

না। জয়া চঞ্চলাকে টানিয়া আনিয়া বিন্দু ও গোসাঞীর নিকট উপস্থিত করিল। গোসাঞী কন্যাকে কহিলেন, চঞ্চলে, বিন্দু তোমার মাতৃস্থানীয়া প্রতিপালিকা মাতৃষসা; শিশুকাল হইতে তুমি মাতৃহীনা; পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা, এখন ও সে আশা করিও না" বলিয়া ভগ্নহৃদয়ে কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

মঙ্গলা এতক্ষণ নীরব ছিলেন; এখন সুবিধা পাইয়া চঞ্চলাকে কহিলেন, "বুঝিলে ত মিশ্র ঠাকুর কে? আজ ভৈরবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল; আর এই তোর সেই ফুলের মালা" বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত কুসুমহার বিন্দুর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। চঞ্চলা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মাসি, আজ কল্যাণে অপূর্ব্ব ঘটনা—আজ প্রাণভরা আনন্দের দিন। মেয়ের মুখে হাসি দেখিয়া মায়ের মুখে হাসি ফুটিল; বিন্দু হাসিভরা মুখে বলিলেন, "মায়ের ইচ্ছায় আমি ও যেন এতাধিক আনন্দ করিবার সুযোগ পাই"। চঞ্চলা সে কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে উত্তর দিলেন—"কল্যাণে মা সদানন্দ; এখানে নিত্য আনন্দবাজার"। মঙ্গলা বিন্দুর দিকে চাহিয়া হাসিলেন ও চঞ্চলার অশ্রুত স্বরে কহিলেন, 'সে ঘটকালী ও আমার হাতে'।

অতঃপর মন্দিরস্বামিনীর নির্দ্দেশে যোগিনীনিবাসের অনতিদূরে ভৈরবীর জন্য একটী ভিন্ন প্রকোষ্ঠের বন্দোবস্ত হইল। জয়ার সঙ্কেত মতে অন্য একটী সেবিকা বিন্দু ও জয়নন্দনকে যথাস্থানে লইয়া গেলে কল্যাণ সম্প্রদায় ও গমনোদ্যত হইল। মন্দিরস্বামীকে উদ্দেশ করিয়া জয়া

কহিলেন, প্রভো, মায়ের ইচ্ছা এখন ও অসম্পূর্ণ; আর গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক—

১ম—বন্দীমাত্রেই ঠগী বা ঠগীদলভুক্ত; এবং ইংরাজরাজের চক্ষে গুরুতর অপরাধী; সুতরাং বিচারে শান্তশীলের কি দণ্ডাদেশ হয়, ভগবানই জানেন। সেবকসম্প্রদায় ও সাধুগণ সকলে বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া যদি শান্তশীলের জীবন ভিক্ষা চাহেন, তবে ঠগীদমন ব্যাপারে কল্যাণ সম্প্রদায়ের অতুল সাহায্য ও সহানুভূতির কথা স্মরণ করিয়া বিচারপতি হয় ত জনৈক ব্রাহ্মণ বন্দীকে ক্ষমা করিতে পারেন।

সে প্রস্তাব শুনিয়া মন্দিরস্বামী কহিলেন—"সাধু! সাধু! জয়ে, ধন্য তোমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও পরসুখ চিন্তা! বেশ তাহাই হইবে। বল দ্বিতীয়টি কি?"

জয়া—সেটীও বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। ইংরাজরাজের নিকট কল্যাণ এক প্রকার চির ঋণী, তাঁহাদেরই অনুগ্রহে ঠগীদমন; আর তৎফলেই দিন দিন সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে; সাধু সন্ন্যাসীগণের সাধনের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে। মায়ের উপাসক সম্প্রদায় যত বাড়িবে, ততই জীবের কল্যাণ ও দেশ অপাপী হইবে; সনাতন হিন্দুধর্ম্ম উৎকর্ষ লাভ করিবে। ঠগীদমন কার্য্যে লালজী অগ্রণী, কল্যাণের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী; তিনি মায়ের সেবকসম্প্রদায় ভুক্ত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

মন্দির স্বামী—মায়ের প্রসাদ লাভে সকলেরই সমান অধিকার;

মায়ের সন্তান সংখ্যা যত বাড়িবে, কর্ম্মক্ষেত্রের ততই প্রসার হইবে। কল্যাণে ধর্ম্মবীর আছেন কিন্তু কর্ম্মবীর নাই। লালজী সে অভাব পূরণ করিলে ভালই হয়।

মন্দির স্বামিনী—এ প্রস্তাবের অর্থ কি? লালজী ফৌজের নেতা হইয়া আসিয়াছেন, কার্য্যান্তে ফৌজদলসহ চলিয়া যাইবেন। দুইদিন পরেই কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক ফুরাইয়া যাইবে।

জয়া—সেটী যাহাতে না হয়, তাহারই ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মন্দির স্বামী—তেমন ব্যবস্থা কি হইতে পারে?

জয়া—অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যা তারার উদ্ধার সাধন লালজীর বীরত্বের ফল। তারা গোসাঞীর একমাত্র কন্যা—করোঞ্চাতে ফিরিবার আর বাসনা নাই; তাই গোসাঞীর ইচ্ছা ব্রাহ্মণকুমার লালজীর হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। মন্দির স্বামীর অমত না হইলে আগামী ত্রয়োদশীতে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

মন্দিরস্বামী—কন্যাকর্ত্তা গোসাঞী; তাঁহার মত হইলে আমাদের অমত হইবে কেন? বর কন্যা উভয়েই অজ্ঞাত কুলশীল; তবে জয়া যে কার্য্যের ঘটক, সে কার্য্যের ফল মঙ্গলকর হবে, আশা করা যায়। কল্যাণীর ইচ্ছায় এ বিবাহে দম্পতী সুখী হইবে।

সে সময়ে স্বামীজী মন্দিরস্বামীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। মন্দিরস্বামী স্বামীজীকে সসম্ভ্রমে আপন পার্শ্বে বসাইয়া জয়ার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা

করিলেন। স্বামীজী সংক্ষেপে প্রস্তাব দুটী শুনিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন ;—প্রথম প্রস্তাবটী অতি সাধু এবং সর্ব্ববাদীসম্মত। এক দিকে একটি ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা, অন্যদিকে নষ্ট প্রকৃতিকে ধর্ম্মের পথে টানিয়া আনা। পরসুখ খুঁজিয়াই জয়া সুখী, আর জয়ার সকল কার্য্যেই মায়ের ইচ্ছা লুক্কায়িত। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী ও উপেক্ষনীয় নহে, বরং সাদরে গ্রহণ যোগ্য। জয়া ঠিকই বলিয়াছে দরবারান্তেই এ বিবাহ হওয়া সঙ্গত ; কারণ এখন ও কন্যার উপর পিতার সম্পূর্ণ অধিকার হয় নাই ; দরবারে তারাকে ও বন্দীগণের সঙ্গে উপস্থিত হইতে হইবে এবং বিশ্বস্ত প্রমাণ পাইলে কন্যাকে পিতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবে। কিন্তু সে পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না। কল্যাণের কর্ম্ম একরূপ শেষ হইয়াছে। আগামী পৌর্ণমাসীতে হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা ব'সবে ; সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহুবিধ যোগী, ব্রহ্মচারী ও পরিব্রাজক গণের আগমন হইবে। সম্ভবতঃ সেখানে ও ঠগীর অন্বেষণ হইবে। দণ্ডীদের উপর যাহাতে পুনঃ কোপদৃষ্টি না পড়ে, পূর্ব্বেই তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সে জন্য কল্য প্রত্যুষেই আমাকে কল্যাণ প'রিত্যাগ করিতে হইবে। আমার ও অনুরোধ, জয়ার প্রস্তাব দুইটী যেন কার্য্যে পরিণত হয়। ঠগীদমনে যোগসাধনের পথ নিষ্কণ্টক হইল, যোগী সন্ন্যাসীর বিপদ কাটিয়া গেল। কল্যাণীর ইচ্ছায় এদেশ আপাততঃ নিরাপদ, সর্ব্বত্র সাধন-কুশল। তবে একবার সকলে সমস্বরে গাও—

"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা।"

তখন উপাসক সম্প্রদায় সমস্বরে গাহিলেন ঃ—

"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা,
বিনে সে অভয়া অভয়দায়িনী শ্যামা।
পতিতপাবনী জানি আসিয়াছি দ্বারে
পাপের প্রবাহে ভাসি অকূল পাথারে,
জীর্ণ দেহতরী, বাঁধ গো শঙ্করি,
কল্যাণের কূলে অকুল কামনা। ২।
ত্রিশূল আঘাতে ফেল হৃদয় ভাঙ্গিয়া
কাঁদাইয়া অভাগারে লও মা কাড়িয়া
পাপ প্রলোভন, মরম বেদন,
অস্থি মজ্জাগত পিশাচ বাসনা। ৩।
অই সেই বিভীষিকা বিকট গর্জ্জন,
বুঝি জীবতরী হয় গো মগন,
কাঁপি থর থর, ধর মাগো ধর,
বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা। ৪।

ক্রমে গান পঞ্চমে উঠিল; সে গানে স্বামীজীর আবেশ হইল; সেই ঘোর আবেশের মধ্যে তিনি মায়ের নিকট বিদায় লইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন, কল্যাণে আর ফিরিলেন না।

চতুর্থ কল্প।

পতির সঙ্গে পত্নীর সম্মিলনে কল্যাণস্থ সকলের হৃদয় প্রফুল্ল ও আনন্দে পরিপ্লুত; কিন্তু ভৈরবীর মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি উদাস ও নৈরাশ্য ব্যঞ্জক; প্রাণের ভিতর যেন কি দাবানল জ্বলিতেছে, মর্ম্মঘাতী যাতনায় হৃদয় ফাটিতেছে, এ আনন্দের দিনে বিন্দুর প্রাণে এ প্রলয় কেন?

দম্পতী মন্দির হইতে চলিয়া গেলে জয়া বলিয়াছিলেন, "বিচারের দিনে কল্যাণসম্প্রদায়কে উদয়গিরিতে দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে, উদ্দেশ্য শান্তশীলের জীবন ভিক্ষা।" একথা শুনিতে ভৈরবীর বাকী রহিল না। বিন্দু বুদ্ধিমতি ও ভবিষ্যদ্দর্শিনী; বিন্দু মায়ের প্রসাদে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; তিনি যেন যোগবলে জানিতে পারিলেন, "পাপের দণ্ড অনিবার্য্য—প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু!" বিন্দু বুঝিতে পারিলেন, ভিক্ষায় মুষ্টিমেয় তণ্ডুলকণা মিলে কিন্তু অমূল্য রত্নলাভের আশা কুহকিনী মায়ার ছলনা মাত্র। গোসাঞী বলিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসীর গৃহধর্ম্ম সহে না"—বিন্দু ভাবিলেন যোগিনীর ও স্বামী সোহাগিনী হওয়া শোভা পায় না। স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার; এতকাল পর তিনি যে অভাগিনীকে গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট; স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল ইহকালের জন্য নহে, এ সম্বন্ধ পরকালেও অক্ষুণ্ণ থাকে। মৃত্যু পরলোকে যাওয়ার জন্য, তবে আর মৃত্যুতে দুঃখ কি? ভগবানে নির্ভর করিতে পারিলে মনে

সংসারের কষ্ট আসে না। একথা ভাবিতে ভাবিতে বিন্দু তন্ময় হইলেন; সহসা সে নিস্তব্ধ কক্ষে দৈববাণী হইল:— "সাধিলেই সিদ্ধি; পরলোকে স্বামীর সঙ্গে অনন্ত মিলন আর সে মিলনে অক্ষয় স্বর্গলাভ।" দৈববাণী শুনিয়া বিন্দু বুঝিতে পারিলেন, এ মিলনের পরিণাম কি। তখন বিন্দু ভক্তিপ্লুতস্বরে করযোড়ে কহিলেন, "মাতঃ করুণাময়ি—কল্যাণি? বলিয়া দাও সে সাধনের উপাদান কি?" আবার দৈববাণী হইল:— "অনুশীলায় শব-সাধন—ভরসা বিপদে শ্রীমধুসূদন।" সহসা এক দিব্যজ্যোতিঃ বিন্দুর মস্তকের রুক্ষ কেশজাল স্পর্শ করিয়া নক্ষত্রবেগে আকাশের দিকে ছুটিয়া গেল; সে জ্যোতিঃ সংস্পর্শে বিন্দু নিঃসংজ্ঞ ও মৃতকল্প হইয়া পর্ণশয্যায় পতিতা হইলেন।

মন্দিরে বিজয়া নাম্নী দ্বিতীয়া একটি সেবিকা ছিলেন; আর্ত্তের সেবা ও ক্ষুৎপিপাসাতুরকে অন্নদান করা জয়ার ন্যায় বিজয়ার ও নিত্যকর্ম্ম। যুদ্ধান্তে যে সকল আহত ঠগী ও ইংরাজফৌজ রোগীনিবাসে আনীত হইয়াছে, তাহাদের শুশ্রূষা ও পথ্য পাচন দান আপাততঃ উভয়ের মুখ্য কর্ত্তব্য; জয়ার গৌণ কর্ত্তব্য দিনান্তে একবার ভৈরবীকে দেখা। বিন্দুর জন্য এখন আর জয়াকে কিছু করিতে হয় না। আজ কাল জয়ার স্থান তারা লইয়াছেন। তারা সে মিলনের দিনে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া একেবারে রোগীনিবাসে উপস্থিত হইলেন, আর্ত্তগণকে যথাযোগ্য ঔষধ ও পথ্যদানে পরিতৃপ্ত করিয়া পার্ব্বত্য পথে ক্ষিপ্রার কূলে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বসঙ্কেতানুযায়ী ধ্বনি

করিলেন, কিন্তু কেহ উত্তর করিল না; নৌকা আসিল না, অপর পারে সে নৌকাও দৃষ্ট হইল না। তারা হতাশ হৃদয়ে মায়ের কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে জয়া আসিয়া রোগীগণের শুশ্রূষায় প্রবৃত্তা হইলে তাহারা বলিয়া উঠিল, "আমাদের জন্য আজ আর কিছু করিতে হইবে না; ইতিপূর্ব্বে একটী নবীনা যোগিনী আসিয়া সকলকে যথাযোগ্য ঔষধ ও পথ্য দিয়া গিয়াছেন; তাঁহার যত্ন কৌশলে ততোধিক তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধ কোমল করসংস্পর্শে আমরা এখন প্রায় রোগমুক্ত ও প্রকৃতিস্থ।"

সে কথা শুনিয়া জয়া বিস্মিতা হইলেন। কৌতূহল পরবশ হইয়া জয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে যোগিনী কোথা হইতে আসিয়াছিলেন?'

উঃ—তাহা জানি না; তিনি বলিয়াছিলেন, আপনারা কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া এ কার্য্যের ভার তাঁহার উপর দেওয়া হইয়াছিল।

প্রঃ—যোগিনী কোন্ দিকে গেলেন?

উঃ—গান গাইতে গাইতে শৈলশ্রেণী ধরিয়া নওয়াগড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। এবার জয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না যে এ ও তারার ই লীলা। আর বাক্য ব্যয় না করিয়া জয়া চলিয়া গেলেন।

দিবা অবসান প্রায়; বিহঙ্গমগণ দূর দূরান্তর হইতে আপন আপন কুলায়ে ফিরিতেছে; মন্দিরের পশ্চাতে বিস্তৃত উপবনে উচ্চ শাখীশিরে শিখীগণ সন্ধ্যার আহ্বানসূচক

কেকারবে উপবন বিলোড়িত করিতেছিল; মায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতির পূর্ব্বাভাস দামামা বাজিয়া উঠিল; বৈদিককণ্ঠে চতুর্দ্দিকে বেদোচ্চারিত হইল।

ভক্তগণ ভক্তিভরে সমাগত হইতে লাগিল। জয়া স্বায়ংকৃত্য সমাপনান্তে বিন্দুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; ক্রমে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, দীপমালা জ্বলিল, গুগ্‌গুলের হৃদয়োন্মত্তকর সুগন্ধে কল্যাণ প্রফুল্লিত হইল। ক্রমে আরতি শেষ হইতে চলিল, কিন্তু বিন্দু আসিল না। জয়া মনে মনে একটুকু বিরক্ত—ততোধিক উদ্বিগ্ন হইয়া ভৈরবীর কুটীরের দিকে চলিলেন। চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলেন—"বুঝি বা হর্ষে বিষাদ"! হয় ত এ অপূর্ব্ব মিলনের ফলে বিন্দুর রোগ যাতনা বা ফিরিয়া আসে।

এদিকে তারা ক্ষিপ্রার কূল হইতে ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মা সংজ্ঞাশূন্য, চক্ষু নিমীলিত, ক্ষীণ কবোষ্ণ শ্বাস ধীরে ধীরে বহিয়া জীবনের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। বিপদ কি তারা জানেন না; ধৈর্য্য তারার স্বভাব-সুলভ ও বাল্যাভ্যস্ত; সুতরাং তারা আত্মহারা বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হইলেন না। তারা ত্রস্ত হস্তে দীপ জ্বালিলেন; আপন পেটিকা হইতে কি একটী ঔষধ বাহির করিয়া মায়ের নাসারন্ধ্রে প্রয়োগমাত্র সজোরে হাঁচি হইল, সে সঙ্গে লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। মা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মেয়ে আনত-বদনে অতৃপ্তলোচনে তাঁহারই মুখ দেখিতেছে। মেয়ের মুখ চিন্তাকুল—গম্ভীর; দৃষ্টি স্থির অথচ স্নেহময়ী। পরিধানে

গেরুয়া,বাহুমূলে রুদ্রাক্ষ,নবীনা যোগিনীর বেশ ; এ বেশে তারার রূপ যেমন উজ্জ্বল দেখায়, অন্যবেশে সে রূপ যেন মলিন হয়। সে রূপ দর্শনে বিস্মিতবচনে মা কহিলেন, "চঞ্চলে, আবার তোর এ বেশ কেন ?"

চঞ্চলা—পূজান্তে রোগীনিবাস হইয়া পার্ব্বত্য পথে গড়ের দিকে গিয়াছিলাম, তাই এবেশের প্রয়োজন !

মা—পথে ইংরাজের ফৌজ বন্দী করিলে কি করিতে ?

চঞ্চলা—কল্যাণীর প্রসাদে এ বেশের জয় সর্ব্বত্র। যোগিনীকে আর ধরিবার হুকুম নাই সুতরাং ভয়ের কারণাভাব।

মা—এ হুকুম কা'র ? কাপ্তেন সাহেব কি সেনাপতির ?

মেয়ে—সেনাপতির না হইলে ও অন্ততঃ তাঁহারই অনুগ্রহে।

মা—লালজী যেমন তেজঃপুঞ্জ কান্তি ও শ্রীমান, তেমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ।

মেয়ে—তিনি কল্যাণের পরম হিতৈষী।

মা—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; তোর মঙ্গলা মাসী বলেন, একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহে চঞ্চলালাভ। লালজীর কোন সংবাদ পাইলে কি ?

মেয়ে—অশ্বারোহণে ক্ষিপ্রার তীরবাহী গিরিসঙ্কট ধরিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম ; তিনি ও আমাকে দেখিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ চিনিতে পারেন নাই, বোধ হয় কল্যাণেই আসিয়াছেন।

মা—একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের আবশ্যক। গোসাঞীর

আদিষ্ট ও অনুমোদিত কয়েকটী কথা তাঁহাকে বলিবার আছে।

"তবে তুমি উঠিয়া বস, এখনি আমি তাঁহার সম্বাদ লইয়া আসিতেছি" বলিয়া ত্রস্তহস্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন; গেরুয়া ছাড়িয়া শাটী পরিলেন, জটাবদ্ধ কেশগুচ্ছ বিমুক্ত করিয়া কটী পর্য্যন্ত দোলাইলেন; ত্রিপুণ্ড্রক মুছিয়া খয়েরের উল্কি কাটিলেন; রুদ্রাক্ষ ফেলিয়া বলয় পরিলেন। প্রসাধন শেষ হইলে মৃদুমন্দ মধুর স্বরে "বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন" গাহিতে গাহিতে কুটীরের বাহির হইলেন। সে গান শুনিয়া বিন্দু মনে মনে ভাবিলেন, গানটি সাময়িক বটে; কল্যাণী করুন, হৃদয়ের ধনের সঙ্গে যেন অচিরে শুভ-সম্মিলন হয়।

তারা নৈশ সমীরণে কণ্ঠ মিলাইয়া গান গাহিতে গাহিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর গেলে পর জয়া মাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে বেশে তারাকে একাকিনী দেখিয়া জয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—কি মা একাকিনী যে?

তদুত্তরে তারা মায়ের সংজ্ঞালোপ ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী দূতীপণার বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তদীয় প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত মায়ের কাছে থাকিতে অনুরোধ এবং লালজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উঃ—লালজী সম্ভবতঃ গোসাঞীর কুটীরে আছেন। ইতিপূর্ব্বে মন্দির হইয়া রোগী-নিবাসে গিয়াছিলেন। বিচারস্থলে

বন্দীদিগকে উপস্থিত করার ভার গোসাঞীর উপর দিয়াছেন।

অতঃপর জয়া ভৈরবীর কক্ষে ও গান গাহিতে গাহিতে তারা গোসাঞীর কুটীরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম কল্প।

অনুচ্চ শ্রুতিমধুর স্বরে গান গাহিতে গাহিতে তারা মায়ের মন্দিরে পৌছিলেন; সেখানে গোসাঞীর দেখা না পাইয়া কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কুটীরদ্বারে পৌঁছিলে তারার গান থামিল; দ্বার অর্দ্ধোদ্ঘাটিত, কক্ষ মধ্যে ক্ষীণ তৈল দীপ জ্বলিতেছিল; অজিনোপরি গোসাঞী উপবিষ্ট আর দ্বারের দিকে পৃষ্ঠ দিয়া দ্বিতীয় এক ব্যক্তি অবস্থিত। শেষোক্ত ব্যক্তির বেশভূষা দৃষ্টে তারার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তিনি স্বয়ং লালজী। তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া তারা সাহস করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; লজ্জা আসিয়া চরণদ্বয়কে অচল করিয়া দিল; কি এক অননুভূত চিন্তা আসিয়া তারার উদ্যম খর্ব্ব করিল; পবনবৎ অনিরুদ্ধ গতি আজ পিতার কুটীরদ্বারে অবরুদ্ধ হইল। কি বলিয়া পিতৃ সমক্ষে উপস্থিত হইবেন, কেমনে মায়ের নিদেশ জ্ঞাপন করিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

তারার জীবনে এই এক নূতন সমস্যা। তারার কার্য্যে এই প্রথম বাধা। একদিকে পিতৃসম্ভাষণ, অন্যদিকে মাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন! উভয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তারা এবার কর্ত্তব্য বিমুখ হইলেন—চিন্তিতা ও হইলেন; সহসা কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া দিল, "হাবা মেয়ে, পিতৃ সন্নিধানে কি লজ্জা করিতে আছে? ওই যে সম্মুখে বসিয়া তোমার উদ্ধারকর্ত্তা ফৌজাধ্যক্ষ, তাঁহাকেও ভয় করিতে নাই।"

সে দৈববাণীতে তারার চিন্তা ক্ষণকালের জন্য দূর হইল, হৃদয়ে সাহস আসিল; দ্বারদেশ হইতে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনীত কোমল স্বরে কহিলেন, "পিতঃ—চঞ্চলা উপস্থিত।" গোসাঞী সত্রস্তে বাহিরে আসিলেন এবং কন্যাকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—কি মা, অসময়ে এখানে কি প্রয়োজন?

মেয়ে আগন্তুকের অশ্রুতস্বরে মায়ের অনুরোধ জানাইলেন। "বেশ, তুমি অগ্রসর হও, আমি তাঁহাকে নিয়া আসিতেছি" বলিয়া গোসাঞী পুনঃ কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তারা পূর্ব্বের ন্যায় "বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন" গানটী গাহিতে গাহিতে ভৈরবীর কুটীরে প্রত্যাগতা হইলেন। বিন্দু ও জয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই লালজীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তারাকে একাকিনী দেখিয়া আগ্রহসহকারে জয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লালজীর সন্ধান পেলে কি?"

তারা—"পেয়েছি বৈ কি! ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন" বলিয়া পিতৃ সম্ভাষণের বিরাট ব্যাপার বিজ্ঞাপন করিলেন।

সে কথা শুনিয়া জয়া ও ভৈরবী স্মিত বদনে তারার মুখপানে চাহিলেন। উভয়ের সাময়িক কৌতূহল ও কৌতুকময় দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তারা মনে মনে একটুকু অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলেন; আর দ্বিতীয় কথাটী না বলিয়া ধীরে ধীরে মায়ের পার্শ্বে বসিয়া শয্যোপরি রক্ষিত 'জয়দেব' এর পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সকলে নীরব, সে কক্ষ নিস্তব্ধ; ক্ষীণ তৈলদীপ ও যেন লজ্জায় নির্ব্বাণোন্মুখ;

জয়া তৈল দানে প্রদীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করিতে উদ্যতা হইলে বাহির হইতে গোসাঞী ডাকিলেন—চঞ্চলে! ত্রস্ত-ভাবে জয়া বাহিরে আসিয়া সাদর সম্ভাষণান্তে লালজীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বেদীর উপর বিস্তৃত অজিনে উভয়কে উপবেশন করাইলেন। জয়ার প্রশ্নোত্তরে লালজী কহিলেন—"ভবদীয় আশীর্ব্বাদে ও কল্যাণীর প্রসাদে সর্ব্ব মঙ্গল"।

গোসাঞী—জয়ে, এখনও কি তোমার কার্য্য শেষ হয় নাই?

জয়া—ভৈরবী সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রায় মুহ্যমানা।

এ কথায় সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন। গোসাঞী কহিলেন—'মিছিরজী কোথায়'?

জয়া—বোধ হয় মন্দিরে আছেন; সর্ব্বদাই মাতৃপূজায়—মায়ের সেবায় ব্যস্ত, কুটীরে বড় একটা আসেন না।

গোসাঞী—সে ও কল্যাণীর ইচ্ছা!

জয়া—এ ইচ্ছার পরিণাম যে কি, কল্যাণীই জানেন।

গোসাঞী—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" সাধিলেই সিদ্ধি!

লালজী—নৈরাশ্যের কারণ নাই। আপনাদের নিঃস্বার্থ যত্ন ও আন্তরিক চেষ্টার ফলে আহতগণ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কল্যাণীর প্রসাদে নবপ্রাণ পাইয়াছে; এ নিষ্কামব্রতের উপযুক্ত ফল লাভ অসম্ভব নহে।

জয়া—সে কার্য্যও শেষ প্রায়; দুদিন পর আর তাহাদের

জন্য করিবার কিছু থাকিবে না; বন্দীদের অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?

লালজী—দলভুক্ত ঠগীমাত্রই যে নরহত্যা করিয়াছে তাহার বিশ্বস্ত প্রমাণ কি আছে? অপরাধের গুরু লঘু ভেদে দণ্ডের ও তারতম্য হইবে; কেহ কেহ বা নিষ্কৃতি ও পেতে পারে।

"বিচার ফল ভবিষ্যতের গর্ভে; ভৈরবীকে পুনঃ গৃহিনী করার চেষ্টাই ভুল; স্বামী-সম্মিলনের পরিণাম প্রীতিকর হওয়ার আশা কম" বলিয়া গোসাঞী গাত্রোত্থান করিলেন এবং "কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে" ধ্বনি করিতে করিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। অবসর বুঝিয়া লালজী কহিলেন,"রাত্রি গভীর হইতে চলিল, অনুমতি হইলে উদয়গিরিতে ফিরিয়া যাই।"

জয়া—আপনাকে দুই একটী কথা বলিবার ছিল, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না।

লালজী লজ্জিতভাবে কহিলেন,সে কি?—আপনি মাতৃস্থানীয়া পুত্রকে কোন কথা বলিতে মায়ের শঙ্কা বা লজ্জার কারণ নাই।

জয়া—আপনার সৌজন্যতায় সুখী হইলাম। কথাটি এই—'আপনার বাহুবলে তারার উদ্ধার সাধন হইল, এখন উহার পরিণাম কি হইবে?

লালজী—দরবারে তাঁহাকে উপস্থিত করিতে হইবে, এবং বিশ্বস্ত প্রমাণ পাইলে কন্যাকে পিতার হস্তে অর্পণ করা যাবে।

জয়া—তারাই করোঞ্চার ব্রাহ্মণকন্যা—পীণ্ডারীর পুরে প্রতি-পালিতা; বনবালার ন্যায় বনে বনে বিচরণ, বন ফুল

আহরণ উঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। কিন্তু দেবপূজায় ও অতিথিসেবায় ইহার অতি আনন্দ!

লালজী—চিতু সর্দ্দারের অন্তঃপুরে প্রতিপালিতা হইলেও জাতিতে যে পতিতা নহেন সে প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে; তারার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি, ততোধিক ভৈরবী বেশে তাঁহার মনোমোহিনী আকৃতি অতি আরামদায়িনী; তারার সরল ও সুঠাম দৃষ্টি ভগবানের নিখুঁত সৃষ্টি।

সে কথা শেষ হইতে না হইতেই ভৈরবী আসিয়া যোগ দিলেন; তারা তখনও অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় জয়দেবের পাতা উল্টাইতে ছিলেন; ভৈরবী বাহিরে আসিলে লালজীর দৃষ্টি তারার উপর ন্যস্ত হইল, সে দৃষ্টি সহজে ফিরিল না। সরলা বালিকা সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন না কিন্তু লালজীর পশ্চাৎ হইতে দ্বিতীয় নয়নযুগল কৌতুহল পরবশ হইয়া সে কটাক্ষের উপর লক্ষ্য করিতেছিলেন। জয়া যোগিনী হইলে ও একটুকু অকপট কৌতুকপ্রিয়;—জয়া সুচতুরা কিন্তু চাতুরীবিহীনা। জলে জল মিশাইতে আর ফুলের পক্ষ হইয়া পবনের সঙ্গে কৃষ্ণ ভ্রমরের বিবাদ বাধাইতে জয়ার বড় আনন্দ। জয়া কহিলেন, "লালজি, তারার বালিকা স্বভাব এখন ও যায় নাই; পড়িতে পারে না তবু ও জয়দেবের পাতা উল্টাইতেছে।" একথায় লালজী একটুকু লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন; "আমি মনে করিয়াছিলাম, তারা অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থখানি পাঠ করিতেছেন।" ভৈরবী স্মিত বদনে কহিলেন, "জয়দেব বুঝিবার শক্তি এখনও হয় নাই; একটুকু একটুকু করিয়া

শিখিতেছে মাত্র। তারার পরিগ্রহ করার শক্তি বেশ আছে, তবে উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাব!

জয়া—রস ভাই, গুরুদেবে আর কাজ নাই, এখন ভবিতব্য ঠাকুরকে চাই।

সে কথা শুনিয়া তারার লজ্জা হইল; বসনাঞ্চলে বদনার্দ্ধ আবৃত করিয়া শয্যাগত হইলেন। মৃদু নৈশ সমীরণে অকবরীবদ্ধ ঘোরকৃষ্ণ চিকুরজাল উড়িয়া উড়িয়া কখন বা পৃষ্ঠদেশ, কখন বা বাহুমূল, কখন বা অর্দ্ধাবৃত বদন কমল চুম্বন করিতেছিল। অষ্টমীর চাঁদের ন্যায় তৎকালীন সে বদন শোভা অতি মনোহর। প্রেমিকের চক্ষে সে দৃশ্য কত সুন্দর, কত মন মুগ্ধকর, অন্যে তাহা বুঝিবেন না। বার বার সে বদন শোভা দেখিয়াও লালজীর দেখিবার সাধ মিটিতেছে না। উদ্ভ্রান্ত নয়ন কেবল সে মুখখানি দেখিতে ব্যস্ত—সে বদনোপরি সে দৃষ্টি ন্যস্ত।

ভৈরবী এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিবার অবসর পান নাই। জয়ার কথার বাঁধুনী, ভাষের গাথুনী এত পরিপাটী ও কৌশলময়ী যে তদুপরি কোন কথা বলিবার সুযোগ ভৈরবী খুঁজিয়া পাইতেছেন না। জয়ার ন্যায় কাঁচা পাকা, অম্ল মধুর, শ্রুতি সুখকর বাক্যবিন্যাসের শক্তি ভৈরবীর নাই। আর নীরব থাকা অসঙ্গত ভাবিয়া ভৈরবী জয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন, লালজী হয় ত আমাদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছেন; গোসাঞী বলিয়া থাকেন, উপকারী জনকে মর্ম্মবেদনা না জানাইলে যাতনার উপশম

হয় না; লালজী আমাদের পরম উপকার করিয়াছেন, জীবন সর্ব্বস্ব হৃদয়াকাশের ধ্রুবতারা চঞ্চলাকে পামর পীণ্ডারীর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া মৃতদেহে প্রাণদান করিয়াছেন, সুতরাং লালজী আমাদের নয়নাভিরাম, সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ ও স্নেহের পাত্র। আমি বয়োজ্যেষ্ঠা ব্রাহ্মণকন্যা, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, কল্যাণী শ্রীম'নের কল্যাণ করুন।

লালজী—ভবদীয়া আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য! তারার উদ্ধার সাধন কল্যাণ সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের ফল, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। কল্যাণের উৎসাহপূর্ণ সহানুভূতি ও কৌশলময় রণপদ্ধতির বলেই ঠগীদমন ও অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যার উদ্ধার সাধন হইয়াছে। অন্যথা এ অজ্ঞাত পার্ব্বত্য-প্রদেশে ফৌজদলের আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইত। আর সে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নিশীথে কারা মুক্তি ও তারার অনুগ্রহে; সে জন্য তাঁহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ!

ভৈরবী—আপনার সাধুবাদে সুখী হইলাম; বীরের হৃদয় যে এত কোমল হয়, সে বিশ্বাস আমার ছিল না। তারা ষোড়শী, রূপসীও বটে, এ বয়সে যোগানুষ্ঠান শোভা পায় না। সংসার ধর্ম্মে—গৃহ কর্ম্মে থাকিয়া শরীরকে কষ্ট সহিষ্ণু করিতে না পারিলে সাধন সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন, বরং অধঃপতনেরই আশঙ্কা; তারাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এখন ইহার ভবিষ্যতের ও ব্যবস্থা করিয়া দিন্। কল্যাণ আমাদের পক্ষে অজ্ঞাতস্থান; আমরা নিঃসম্বল ও নিঃস্বহায়!

"সংসারের অভিজ্ঞতা আমার নাই ; শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন, পরগৃহে—পরান্নে এ দেহ প্রতিপালিত ; সংসারে কোন বন্ধন নাই, জীবনের জন্য ও মায়া নাই। মহাসাগরের বুদ্‌বুদের ন্যায় লক্ষ্যশূন্য হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি"—বলিতে বলিতে লালজীর তেজঃপুঞ্জ মুখকান্তি পাংশুবর্ণ ধারণ করিল ; প্রাণের ভিতরে কি এক ভীষণ প্রলয় বহিল ; লালজীর দৃষ্টি শূন্য—হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন, যেন বাহ্য জ্ঞান বিরহিত। সে অবস্থায় অজ্ঞাতে লালজীর কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল "তারা তোমার বিপদ? যে প্রাণ একদিন রক্ষা করিয়াছিলে—সে প্রাণ তোমার—সে প্রাণের উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার ; ইচ্ছা হয় রাখ, না হয় ক্ষিপ্রার প্রবল প্রবাহে বিসর্জ্জন কর।" এ কয়েকটী কথা যেন লালজীর হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সবেগে বহির্গত হইল।

লালজীকে তদবস্থ দেখিয়া জয়া ডাকিলেন, "লালজি!" লালজী নীরব—নিশ্চল ; জয়া আবার ডাকিলেন, লালজি, তুমি বীর—কিন্তু এ যে সাধন কুটীর, রণক্ষেত্র নহে। তবে এত চিন্তা কেন?"

এবার লালজীর চৈতন্য হইল ; লজ্জাবনত বদনে কাতর বচনে লালজী কহিলেন, "দেবি, সত্যই আমার চিত্তভ্রম হইতেছিল ; মনে হইতেছিল, আমি যেন নওয়াগড়ে বন্দী ; একটী ক্ষুদ্র অগভীর কূপে যেন আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সহসা কে যেন বন্ধন মুক্ত করিয়া গভীর নিশিতে সঙ্কেত পথে আমাকে উদয়গিরিতে রাখিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে আমার বীরগর্ব্ব অতলে ডুবিল'!

জয়া—এ কি চিন্তা না জাগ্রত স্বপ্ন ?

লালজী—চিন্তা কি স্বপ্ন জানি না। কল্যাণ মায়াময় ; এ ও বোধ হয় তারারই মায়া ; তারার লীলা অপার্থিব, তারার কার্য্য অমানুষিক। তারা এ হৃদয়ের উপাস্যদেবী !

একথা শুনিয়া জয়া কৌতুক করার সুযোগ পাইলেন ; তিনি স্মিত মুখে সরলভাবে কহিলেন, "হয় ত গৃহিণীর অনিন্দ্য মুখখানি মনে পড়িয়াছে, তাই এত উদ্ভ্রান্তি !

সে কথায় লালজী আর ও লজ্জিত হইলেন ; কি বলিতে গেলেন, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না ; ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, আশৈশব পরপ্রসাদোপজীবী নিঃসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুমারকে কন্যাদান কে করিবে ?

ভৈরবী—তারার অদৃষ্ট ও তেমন ; তারা শৈশবে মাতৃহীনা—পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা ; ইহার চতুর্থ বর্ষ বয়সে পিতা সংসার ত্যাগী—যোগী ; ষষ্ঠ বর্ষে বালিকা চৌরকরে অপহৃতা ; তারার নাম চঞ্চলা।

লালজী—তারা আপনার কে ?

জয়া—ভৈরবী তারার মাতৃস্বসা·প্রতিপালিকা—মাতৃস্থানীয়া।

লালজী—আর আপনি ?

ভৈরবী—ময়লা মাসী।

লালজী—সে কি ?

ভৈরবী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ইহার নাম মঙ্গলা। এ নাম চঞ্চলার মুখে আসিত না বলিয়া চঞ্চলা ডাকিত 'ময়লা মাসী।'

লালজী—করোঙ্কার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক ত্যাগ কতকাল ?

ভৈরবী—প্রায় এক যুগ—দ্বাদশ বর্ষ !

লালজী—এই দীর্ঘকালের মধ্যে তারার পিতার কোন সন্ধান হয় নাই ! তাঁহার সন্ধান করা এ জীবনের অন্যতর কর্ত্তব্য হইবে।

জয়া—সে জন্য আপনাকে কষ্ট করিয়া অধিক দূর যাইতে হইবে না। বোধ হয় গোসাঞীকে জানেন, তিনিই তারার পিতা।

এরূপ কথোপকথন চলিতেছিল, সহসা মিছিরজীর সহিত গোসাঞী ফিরিয়া আসিলেন। জয়া গোসাঞীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "ঐ যে কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং আসিতেছেন।

লালজীর চক্ষের সম্মুখে যেন এক মায়াময় যবনিকা উত্তোলিত হইল। তিনি বুঝিলেন, মায়ের ইচ্ছায় এ সমস্ত অপূর্ব্ব মিলন—কল্যাণ করোঙ্কার প্রভাসক্ষেত্র ! গোসাঞীকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া লালজী গোসাঞীর চরণে প্রণত হইলেন এবং বিনীত বচনে কহিলেন, গুরুদেব, সন্তানের অপরাধ লইবেন না ; এতদিন জানিতাম, মহাশয় কল্যাণ-সম্প্রদায়ের নেতা ; ইংরাজ ফৌজের দক্ষিণ হস্ত ; অজ্ঞাতে আঁধারের কীটের ন্যায় অন্ধখেলা খেলিতেছিলাম ; আজ বুঝিলাম আপনি পিতৃস্থানীয়—কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মহাগুরু।

গোসাঞী লালজীর মস্তক স্পর্শ করিয়া সহর্ষবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কুরু কল্যাণি কল্যাণ জীবে।" তোমার ন্যায় বীর ও ভক্ত সন্তানের সমাগমে কল্যাণ ধর্ম্ম ও যোগী সন্ন্যাসীর সাধনের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে।

লালজী—সাধু সন্ন্যাসীর পদে আর কুশাঙ্কুর ফুটিবার আশঙ্কা নাই। ইংরাজরাজ ধ্রুব বুঝিতে পারিয়াছেন, যোগের অর্থ নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণ, পর-হিত সাধন ; আর্ত্তের সেবা ও মুমূর্ষুর জীবন দান। আর যোগী সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী।

গোসাঞী—সে সকলই কল্যাণীর অনুগ্রহে। জয়া ও বিজয়ার কর্ম্ম প্রকৃতই নিষ্কাম ; সাধনা—পরের সুখ কামনা ; আর যোগ কল্যাণীর সেবায় নিয়োগ। আপনাদের বাহুবলে কল্যাণ আজ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

গোসাঞীর কথায় বাধা দিয়া জয়া কহিলেন লালজি, আপনার শৈশবকাহিনী শুনিতে বড় সাধ যায়।

লালজী—আমার বাল্যকালের কথা বিরক্তিকর ভিন্ন সুখকর হইবে না। উল্লেখ যোগ্য তেমন কোন ঘটনা এ ক্ষুদ্র জীবনে ঘটে নাই, বলিয়া—পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর ভরতপুর রাজপুরে অবস্থান, ভরতপুরের পতন ও রাজ-নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে ৺ কাশীধামে আগমন ; তৎপরে যোগী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারকল্পে ফৌজদলভুক্ত হইয়া উদয়গিরিতে শিবির সংস্থাপন সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন।

গোসাঞী—আপনার জন্মভূমি কোথায় ?

লালজী—বিষ্ণুপুর—ভরতপুর রাজের দেবোত্তর।

গোসাঞী—পণ্ডিত শঙ্করানন্দ আপনার কে ছিলেন ?

লালজী—পিতৃব্য—পণ্ডিত দয়ানন্দ আমার পিতা ছিলেন।

একথা শুনিয়া গোসাঞীর প্রাণে মহানন্দ হইল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, বিষ্ণুপুর আমাদের পাল্‌টা ঘর ছিল।

এবার জয়ার মুখে হাসি ধরে না। তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন,"ফুল ফুটিয়াছে,ভ্রমর জুটিয়াছে, এখন শাঁক বাজাইলেই হয়। এ প্রস্তাবে বোধ হয় কন্যাকর্ত্তার অমত নাই।"

গোসাঞী—আমার সম্পূর্ণ মত আছে, তবে লালজীর মতামত জানা আবশ্যক।

জয়া—সে ভার আমার উপর। কড়ি দিয়ে কেনা—আর দড়ি দিয়ে বাঁধা—আমার সিদ্ধ বিদ্যা। তবে কি না বিদায়টা ভালমত হওয়া চাই।

ভৈরবী—এ যে নূতন প্রথার ঘটকালী। স্থান মাহাত্ম্যে সকল কর্ম্মেই তুমি সিদ্ধ হস্ত। তুমি কনের ঘরে মাসী—বরের বাড়ী পিশী, আর মিষ্টান্নের বেলা প্রতিবেশী—তাই দাবী টা বেশী বেশী। ভাল বিদায়ের ভারটা আমার হাতে রহিল—বলিয়া ভৈরবী জয়ার কাণে কাণে কি কহিলেন। জয়া কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তোমাদের লাল আর কাল তোমাদেরই রহিল, আমি চল্লেম"—বলিয়া বিদ্যুদ্বেগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—তারা! "তারা আজ আত্মহারা—করব তোকে কুটীর ছাড়া; চল এখানে বসিয়া আর বিয়ের কথা শুনিয়া কাজ নাই।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া জয়া তারাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন, অনিন্দ্য মুখখানিকে মেঘমুক্ত করিয়া চিবুক ধরিয়া সোহাগ করিলেন। সে সোহাগে তারা আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। জয়া তারাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় কক্ষে

চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় লালজীকে একবার সাক্ষাৎ করার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। লালজীর অতৃপ্ত দৃষ্টি—আবার মেঘমুক্ত শরচ্ছশীর উপর ন্যস্ত হইল—যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল, ততক্ষণ আর সে দৃষ্টি ফিরিল না।

পথে যেতে যেতে তারা কহিলেন, 'বল মাসি—ব্যাপারখানা কি ?

জয়া—তারার হবে বিয়ে—মালা গাঁথি গিয়ে ; ফুল তুলেছি
যতন করে—রাখিয়াছি সাজি ভ'রে।

সে কথার উত্তর না দিয়া তারা অনুচ্চ পঞ্চমে গান ধরিল—
"বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন"। ইত্যাদি

লালজী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সহসা সুকণ্ঠ নিঃসৃত এ সুর সঙ্গীত কোথা হইতে আসিতেছে ?

ভৈরবী হাসিয়া কহিলেন, এ তারার গান ; এ গান গাহিয়া তারার অসীম আনন্দ। সে সময় মাথার উপর দিয়া পাপীয়া ডাকিয়া গেল ; অশোকতরুর ডালে বসিয়া পেচক সুকণ্ঠের পরিচয় দিল ; রাত্রি তখন প্রহরেক অতীত। লালজী ভৈরবী ও গোসাঞীকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া জয়ার কুটীরের দিকে গেলেন।

লালজী চলিয়া গেলে গোসাঞী কহিলেন—"এ বিবাহে কুল মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে, তারাও সৎপাত্রস্থা হবে"।

ভৈরবী—শুভ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হওয়া সঙ্গত। সত্বরে শুভলগ্নে কন্যাদান করিয়া নিশ্চিন্ত হউন !

"আগামী ত্রয়োদশীতে গোধূলি লগ্নে বিবাহের শুভক্ষণ ;

কল্যাণীর ইচ্ছায় তাই হবে" বলিয়া গোসাঞী স্বীয় কুটীরে চলিয়া গেলেন। ভৈরবী ও মিছিরজী বেদীর উপর উপবিষ্ট হইয়া চঞ্চলার বিবাহের কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ কল্প ।

জয়া কুটীরে পৌছিয়া তারাকে বলিলেন, আজ আমার বড় ক্ষুধা বোধ হয়েছে, কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয় ।

তারা—আজ বুঝি ভগবান কিছু মাপায় নি !

জয়া—কিছু না—সারাদিন নিরম্বু উপবাস !

তারা—মাসি, তোমার যে খাটুনি, কিছু না খাইলে শরীরই বা কিসে টিকিবে ?

জয়া—আরে দু এক উপোস, তারপর বিয়ের লুচী সন্দেশ—অতি পরিতোষ । যা যা শীঘ্র কিছু তৈয়ের কর গে ।

তারা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যথাকার্য্যে চলিয়া গেল ; জয়ার সামান্য ভাণ্ডারে যে কিছু ছিল, তদ্দারা যদিচ্ছা কিঞ্চিৎ খাবার প্রস্তুত করিয়া জয়াকে ডাকিলেন, মাসি !

উঃ—একবার এদিকে আয় মা ।

আস্তে ব্যস্তে তারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অপ্রতিভ ও বিস্মিত হইলেন । তারার বাক্‌রোধ হইল—মাসীকে আর খাওয়ার কথা বলা হইল না । এদিকে লালজী নিদেশক্রমে জয়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন । জয়া অনন্য-মনে ফুলের মালা গাঁথিতেছেন. আর এক পার্শ্বে বসিয়া লালজী ফুল বাছিয়া দিতেছেন । তদ্দর্শনে তারার একটুকু রাগ হইল—কারণ তারা জানিতেন—মালা গাঁথা তাহারই একচেটে—মৌরশী স্বত্ব । তারাকে উপস্থিত দেখিয়া জয়া কহিলেন,

"চেলি, তুই এ মালাটা শেষ কর, আমি আসিতেছি"—বলিয়া কুটীরের বাহিরে আসিলেন। তারা মাসীর নিদেশ পালনে নিযুক্তা হইলেন ; সসঙ্কোচে অবনত বদনে তারা মালা গাঁথিতে লাগিলেন। আর লালজী পূর্ব্বের ন্যায় ফুল বাছিয়া দিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রীড়াভরে বীণাবিনিন্দিত মৃদু মধুর স্বরে তারা কহিলেন, বীরের হাতে অসির খেলাই শোভে, ফুলবাছা পোষায় না।

লালজী লজ্জিত—ততোধিক বিমোহিত হইয়া কহিলেন, আপনার অনুমান সত্য, অসি ব্যবহারে কোন কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এ ফুলগুলি যেন সূচিকার ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে, হাত সরিতেছে না।

পূর্ব্বের ন্যায় আনতবদনে সুমিষ্ট বচনে তারা কহিলেন, আপনাকে কষ্ট করিতে হইবে না—আমিই ফুল বাছিয়া লইতেছি" বলিয়া ফুলগুলী আপন আয়ত্ত করিয়া লইলেন। লালজী হস্তস্থিত ফুলগুলী দেখাইয়া বলিলেন, "এগুলী বোধ হয় মালার উপযুক্ত নহে।"

"আমি উপযুক্ত করিয়া লইতেছি" বলিয়া তারা লালজীর হস্ত হইতে ফুলগুলী কাড়িয়া লইলেন। সে ফুলগুলী লইবার সময় হয় ত বীরের কঠিন করে ফুলের আঁচড় লাগিয়াছিল, তাই লালজী কহিলেন, "এ ফুলগুলী ফেলিয়া দিলেই ভাল হয়, এ-ত ফুল নয়—যেন তীক্ষ্ণ শর।"

এবার তারা মুখ উঠাইলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"শর হইলেও বিষাক্ত নহে ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

এবার লালজী আরও লজ্জিত হইলেন; কিন্তু উচ্ছ্বাসিত হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সহসা তারার কর ধারণ করিয়া কহিলেন, 'তারা'! তারা নীরব-নিস্পন্দ! লালজী আবার কহিলেন, "তারা, তুমি আমাকে ভাল বাস?" এবারও তারা স্থাণুর ন্যায় অটল; লালজী পুনরায় কাতর বচনে কহিলেন, তবে কি এ বিবাহে তোমার অমত? এবার তারা মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন, "মতামত পিতা মাতার।"

সে কথা শুনিয়া লালজীর মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে আহ্লাদের পূর্ণ শশী ফুটিয়া উঠিল। সাদরে পোষিতা আশালতা পুষ্পবতী হইল; মুখ সুপ্রসন্ন হইল। তিনি কহিলেন, "এ বিবাহে তাঁহারা সম্পূর্ণ মত করিয়াছেন।"

"তবে তাই" বলিয়া কথাটাকে চাপা দেওয়ার মানসে তারা কহিলেন, 'যুদ্ধান্তে সেদিন আমার অনুসরণ করিয়াছিলেন কেন?"

লালজী—ঠগী নিবারণ—আর অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যার উদ্ধার সাধনই সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য। অনুসরণের কারণ ব্রাহ্মণ কন্যাকে হস্তগত করা।

এবার তারা মুখোত্তলন করিয়া লালজীর উপর কোমল কটাক্ষ করিলেন এবং কহিলেন, সে চেষ্টা বোধ হয় বৃথা হইয়াছে; আপনি ধরা না দিলে তারাকে হস্তগত করা বীরের কার্য্য নহে।

তারার সে প্রগলভ ভাষে বীরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; লালজী সোহাগভরা কুটীল দৃষ্টিতে তারার কটাক্ষের সদুত্তর দিয়া

উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে কহিলেন, "তাহা আর জানিতে বাকী নাই। ক্ষিপ্রার বেগবান প্রবাহকে বাঁধা যায়, কিন্তু তারাকে ধৃত করা যায় না। আমি ত ছার, স্বয়ং রতিবল্লভ সমস্ত বিশ্ব-সংসারের ফুলচমূ সহ অনুসরণ করিলেও তারার গতি রোধ হইত কি না সন্দেহ!

তারা—তাই বুঝি কূলে এত ভয়—তা হউক সে অঙ্গুরীয় কোথায়?

লালজী—সেটী পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছি।

তারা—অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীভ্রষ্ট করিয়া ভুল করিয়াছেন, উহাতে ইষ্ট কবচ আছে, অশুচী সংস্পর্শে উহার মাহাত্ম্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

লালজী—সে জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। নিশাপ্রভাতে সে অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ করিব।

তারা—সে জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, আবশ্যক মত আমি তাহা চাহিয়া লইব। এইটী বীর ধর্ম্ম!

লালজী—বীরধর্ম্ম কি?

তারা—বীর হৃদয় বজ্রকঠিন ও নির্ম্মম; রাজ্যজয়ে যেমন চতুর, পদানত বন্দীকে দয়া করিতে ততোধিক নিষ্ঠুর!

লালজী—কেন তারা. পাষাণে কি কুসুম ফোটে না,—মরুভূমে কি বারিধারা ছোটে না? তাহার মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত তারা! তারা এই হৃদয়ের পারিজাত—আশা মরুভূমে জলপ্রপাত!

এ কথায় তারা আবার কোমল কটাক্ষপাতে লালজীর

হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলেন, এবং স্মিতমুখে কৌতুক-ভরে কহিলেন, তাই বলিয়াছি, সেটী বীরধর্ম্ম—চতুর চূড়ামণি নিতে পারেন, দিতে জানেন না। স্বার্থ মাখান ভালবাসায় মাধুরী থাকে না—বলিয়া মালাছড়া লালজীর করে অর্পণ করিয়া মাসীর খোঁজে চলিয়া গেলেন।

লালজী অপ্রতিভ হইয়া তারার পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত বিমুক্ত কেশগুচ্ছের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, কেশদাম যেন মানিনী ফণীর ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া তাহার দিকে রোষদৃষ্টি করিতেছে; আবার ভাবিলেন, হয় ত এ নব অনুরাগের পূর্ব্বাভাস—নূতন ধরণে নবপ্রেমের আবাহন!

আজ তারার এই প্রথম প্রেমালাপ; তারা যুবতী—রমণী সুলভ শালীনতা আসিয়া বাক্‌রোধ করিল; তারা রন্ধনশালায় গিয়া মাসীর কোলে মুখ লুকাইলেন; যেন কত অপরাধে অপরাধী। তারার সে ভাব দেখিয়া জয়ার প্রাণে হাসি উছলিয়া উঠিল, কিন্তু হাসিলে তারা আরও লজ্জিত হইবে, ভাবিয়া অতি সাবধানে হাসি সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "সে মালা ছড়াটা গাঁথিতেই কি এত সময় লাগিল?"

তারা মনে মনে একটুকু অপ্রতিভ হইলেন, লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিলেন না; অঙ্কদেশে মুখ লুকাইয়া তারা কহিলেন, "সত্যই মালা গাঁথিতে বিলম্ব হইয়াছে; ফুলগুলী আমাকেই বাছিয়া লইতে হইয়াছিল; তাঁহার হাত আদৌ চলে না।"

জয়া—তাঁহার—কাহার ?

তারা নিরুত্তর। জয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না যে এ নবপ্রেমের অনুরাগ, লজ্জাজনিত সাময়িক সোহাগ! জয়া আবার কহিলেন, তা হউক,—দেখি মালাটী কেমন হইয়াছে ?

তারা—মালা ছড়াটা সেখানেই আছে।

জয়া—লালজী ?

তারা—তিনিও সেখানেই আছেন।

জয়া অতিথি সৎকারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইলেন। নিশা দ্বিযামা অতীত প্রায়; তখনও লালজীর আহার হয় নাই: তাই সামান্য দ্রব্যে অযত্নলব্ধ ফল মূলে ভাবি জামাতাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। আহারান্তে লালজী উদয়গিরিতে চলিয়া গেলেন। বিদায়কালে তাঁহার কৌতুহলময়ী চঞ্চল দৃষ্টি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিল, সে মোহন মূর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, আর দর্শন মিলিল না।

সপ্তম কল্প।

কল্যাণে আসাবধি শান্তশীলের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! অধিকাংশ সময়ই তিনি মন্দিরে থাকেন; জপ, তপ, পূজা পাঠ করেন; এই কয়দিনে তাঁহার জীবনে যেন যুগান্তর ঘটিয়াছে; মায়ের প্রসাদে পাপীর দিব্য চক্ষু ফুটিয়াছে; খুঁজিয়া পাইতেছেন না আত্মকৃত ব্যাধির মুক্তি কোথায়—ইচ্ছাকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয়?

গোসাঞী ভৈরবীর কুটীর হইতে ফিরিবার সময় শান্তশীলের অনুসন্ধানে মন্দিরে আসিলেন। রাত্রি প্রহরেক অতীত: মন্দির নীরব—নিস্তব্ধ। উপাসক সম্প্রদায়ের কেহই মন্দিরে নাই; বৈদিকগণ পাঠ ছাড়িয়া ধ্যানস্থ; কল্যাণীর প্রকোষ্ঠদ্বার অর্গলিত; কেবল পূজকগণ আরতি অন্তে তৈজসপত্র যথাস্থানে রক্ষা করিতেছেন। আর ভুক্তাবশিষ্ট আহার্য্য মুখে করিয়া সারমেয়গণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে। একে অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। মন্দিরে শান্তশীলকে না দেখিয়া গোসাঞী বিস্মিত হইলেন; মণ্ডপ হইতে অঙ্গনে আসিলেন, সেখানেও তিনি নাই; গোসাঞীর বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল; হতাশ হইয়া কুটীরাভিমুখে চলিলেন; সহসা দেখিলেন, চাতা-লের এক কোণে কে অবনত মস্তকে বসিয়া কি চিন্তা করি-তেছে। মন্দিরের ক্ষীণালোক সে পর্য্যন্ত আসিয়া পোঁছে নাই; শুক্লা দশমীর চন্দ্রিমামালা আস্তে আস্তে মন্দিরের চূড়া হইতে অবতরণ করিয়া কল্যাণের পদবিধৌতা শাখা গোদাবরীর

অনুচ্চ-তরঙ্গে মিশিয়া আপন অস্তিত্ব হারাইতেছিল। সে সময় মন্দির প্রাঙ্গনের ক্ষীণালোক ও চন্দ্রালোকের অস্নিগ্ধ ধারার সংমিশ্রণে চাতাল খণ্ড পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। গোসাঞীর দৃষ্টি তত প্রখর ছিল না। সুতরাং উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন—আপনি কে?

সে শব্দ ঘোর চিন্তামগ্ন ব্যক্তির শ্রুতি গোচর হইল না। গোসাঞী আবার ডাকিলেন—আপনি কে? এবার মিছিরজীর চিন্তা ভঙ্গ হইল; সে স্বর চিনিতে পারিয়া শান্তশীল সত্রস্তে গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষীণ কাতর স্বরে কহিলেন—"কে গোসাঞি! অসময়ে এখানে কেন?

শান্তশীলকে তদবস্থ দেখিয়া গোসাঞী বিস্মিত হইলেন না। তাঁহার অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ও ভবিষ্যৎ ভাবনার বিষয় তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন; গোসাঞী সরল ও স্নেহপূর্ণ ভাবে কহিলেন, কে মিছিরজি! আপনার অনুসন্ধানেই ভৈরবীর কুটীর হইতে আসিতেছি; ভাবিয়াছিলাম, ইতিপূর্ব্বেই আপনি কুটীরে ফিরিবেন। গোসাঞীর কথায় বাধা দিয়া শান্তশীল কহিলেন, "কল্যাণীর মন্দিরে এ মিলন ইহকালের জন্য নহে—পরকালের জন্য! সে জন্যই প্রস্তুত হইতেছি; আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু; বিচারে প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য!

শান্তশীলের পরিতাপানলদগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্মঘাতী সে কাতরোক্তি শুনিয়া গোসাঞী প্রাণে আঘাত পাইলেন; মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শান্তশীলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তৎকালীন ঈষদ

উজ্জ্বল আঁধারে অস্ফুট আলোকে গোসাঞী দেখিলেন, শান্ত-শীলের মুখে বিষাদের কালিমা নাই, যেন দিব্যজ্যোতিতে সে মুখমণ্ডল উৎফুল্ল, নৈরাশ্যের লেশ নাই বরং যেন কি মহদনুষ্ঠানে উদ্যম ও উৎসাহ পূর্ণ। সংসারাভিজ্ঞ গোসাঞীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে সে প্রফুল্লতা কল্যাণীর প্রসন্নতার ফল—আর সে উৎসাহ ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য হৃদয়ের বল। গোসাঞী সান্ত্বনাসূচক শিষ্টবাক্যে কহিলেন, কল্যাণীর ইচ্ছায় সর্ব্ব মঙ্গল : এখন কুটীরে চল বিন্দুর শরীর বোধ হয় ভাল নয়, রাত্রিও অধিক হইয়াছে। কাল আবার সকলকেই উদয়-গিরিতে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

শেষোক্ত কথার উত্তরে শান্তশীল কহিলেন, "সে জন্য আমি প্রস্তুত, মুক্তকণ্ঠে অম্লানচিত্তে আত্ম অপরাধ স্বীকার করিব।

অনন্যোপায় হইয়া শান্তশীল অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে অন্তঃসার শূন্য দেহযষ্টিখানা লইয়া গোসাঞীর অনুসরণ করিলেন। উভয়ের ভৈরবীর কুটীরে আগমনের কথা ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

লালজী চলিয়া গেলে শান্তশীল আস্তে আস্তে আসিয়া বিন্দুর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কি বলিয়া বিন্দুকে সম্ভাষণ করিবেন, সে এক বিষম সমস্যা হইল; দীর্ঘকাল বিরহের পর এ সুখ সম্মিলন একদিকে, আবার অনন্ত অক্ষয় মিলনের চিন্তা অন্য-দিকে। ইহকালে দম্পতি-প্রেম ও প্রীতি পার্থিবিক; কিন্তু পরকালে পবিত্র মিলন আধ্যাত্মিক। শান্তশীল ভাবিতে

লাগিলেন, কেমনে বলিবেন "পতি ও পত্নীর এ মিলন ইহকালের জন্য নহে, পরকালের জন্য"। আজ নবধর্ম্মবীর শান্তশীল কল্যাণীর প্রসাদে দিব্যজ্ঞান পাইয়া, বিন্দুকে মনের কথা বলিতে প্রস্তুত হইলেন। তদীয় দুশ্চিন্তা দূর হইল, হৃদয়ে বল আসিল, মিষ্ট ও মধুর বচনে ডাকিলেন—বিন্দু!

বিন্দু পতির করকমল আপনকরে স্থাপন করিয়া তেমনই মধুর স্বরে কহিলেন, বিন্দু বটে—অবস্থিতি আছে, কিন্তু বেধ নাই।

পতি—তা হউক, এখন শরীর কেমন?

পত্নী—বেশ সুস্থ, গ্লানি হীন।

পতি—তুমি কি ঘুমাইতেছিলে?

পত্নী—ঘুম নহে কয়েকটী কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়াছিলাম মাত্র।

পতি— কথাটী শুনিতে পারি না কি?

পত্নী— না বলিলে আমার হৃদয়ের ভারই বা লাঘব হয় কই! ভাবিতে ছিলাম—(১ম) চঞ্চলার বিবাহ।

(২য়) জয়ার অলোকসামান্যা বুদ্ধিমত্তা ততোধিক তাঁহার পরসুখ কামনা!

(৩য়) এ অপ্রত্যাশিত অচিন্তনীয় মিলনের পরিণাম। ভৈরবী বেশে স্বামী সোহাগ বোধ হয় কর্ম্মকালে অমৃতে গরল।

সে কথা শুনিয়া স্বামীর প্রাণ আশ্বস্ত হইল।

বিন্দু মনে বেদনা পাইবে ভাবিয়া যে কথা বলিতে শান্তশীল কুণ্ঠিত হইতেছিলেন, স্ত্রীর মনও সে চিন্তায় আবিলিত জানিয়া শান্তশীল কহিলেন;—

সকলই কল্যাণীর ইচ্ছা! এ মিলন অমৃতে গরল যাঁহার ইচ্ছায় হয়ত তাঁহার ইচ্ছায় গরলই আবার অমৃত হবে। চঞ্চলার বিবাহ ঠিক হইল কি? গোসাঞী বলিতে ছিলেন, তাহাও জয়া দেবীর হাতে।

বিন্দু—তাই বটে; লালজীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়াছে, ইহাও মঙ্গলার চেষ্টার ফলে। জয়ার কার্য্য কলাপ, চতুরতা ও ঘটকালীর কৌশল দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি—প্রত্যেক কথাটী মায়া রচিত—প্রত্যেক কার্য্য যাদু ঘটিত অথচ নিঃস্বার্থ শ্রুতিমধুর ও মনমুগ্ধকর। মঙ্গলা প্রকৃতই মানবীবেশে দেবী—কল্যাণে সকলেই তাঁহাকে দেবী সম্বোধন করেন। ঠগীগৃহে প্রতিপালিতা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিতে লালজীর কোন আপত্তি নাই। পরিচয়ে যতদূর জানা গিয়াছে, তিনিও শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুমার;—গোসাঞী বলিয়াছেন এ বিবাহে কুল-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

শান্ত—তারা ঠগীর অন্তঃপুরে ছিল সত্য কিন্তু পীণ্ডারীর সংস্পৃষ্ট অন্নে প্রতিপালিতা নহে। আমার ও তারার জন্য কালী-মায়ীর নিত্য প্রসাদ বরাদ্দ ছিল; শুদ্ধাচারী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহার মায়ের ভোগ রাঁধিবার বা ছুঁইবার অধিকার ছিল না। শিশুবেলা হইতেই তারাকে স্নেহ করিতাম, কিন্তু কেন করিতাম, জানিতাম না। এখন বুঝিতেছি সে কেবল অজ্ঞাত ঘনিষ্ঠতার আকর্ষণে!

বিন্দু—উহার নাম চঞ্চলা। চঞ্চলার জন্যই আকুল হইয়া

ভৈরবী বেশে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলাম, কল্যাণীর ইচ্ছায় চঞ্চলাকে পাইয়াছি, এখন ইহাকে পাত্রস্থা করিতে পারিলেই এছার জীবনের আশা পূর্ণ ও কর্ত্তব্য শেষ হবে! সংসারের বন্ধন ঘুচিবে; অতঃপর অনন্যমনে পতিপদ সেবার অবসর পাইব।

শান্ত—সে আবার কি—যোগসাধন?

বিন্দু—পত্নীর পক্ষে পতি পদ সেবাই প্রধান সাধন। ইহলোকে পতি ধর্ম্ম—পতি কর্ম্ম—পতি যোগ—পতি সাধন! পতির পদ সেবা না করিলে শ্রীহরিকে ডাকিবার অধিকার ও হয়না;—বলিয়া বিন্দু ভক্তিভরে স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রভো, এতদিনে রুক্ষ কেশগুচ্ছ পবিত্র হইল।

এত দীর্ঘকালের পর মনসুখে বিন্দুর প্রাণের হাসি এই প্রথম!

শান্ত—বিন্দু তোমার পতিভক্তি অসাধ্য সাধনে সমর্থ। তোমার প্রেম অপার্থিব তোমার ভক্তি কামনা রহিত—আসক্তি-শূন্য। ঠিক বলিয়াছ—এ প্রীতিময় মিলন মায়াময়—ঐহিক নহে—পারত্রিক! সাংসারিক নহে—আধ্যাত্মিক! তোমার সাধনার ফলে যেন অনন্তে আমাদের অক্ষয় মিলন হয়।

শান্তশীল আর কিছু বলিতে পারিলেন না; অত্যুষ্ণ অশ্রুজল নীরবে মনোবেদনা বলিয়া দিতে লাগিল। সে দৃশ্যে বিন্দুর লোচনদ্বয়ও বাষ্পাকুল হইল; উভয়ের অশ্রুবিন্দু যুগল করে

পতিত হইয়া উভয়ের মনের বিরোধ ঘুচাইল ; উভয়ে উভয়ের নিকট মনে মনে ক্ষমা চাহিলেন, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন ; উভয়েই বুঝিতে পারিলেন, এ জীবনের যবনিকা পতনে অধিক বিলম্ব নাই !

অষ্টম কল্প ।

দশমীর নিশা অবসান হইল। অন্যদিনের ন্যায় উন্নত শৈল-শৃঙ্গে, বসিয়া ময়ূর ময়ূরী ঊষার আহ্বানসূচক কেকারবে দিঙমণ্ডল বিকম্পিত করিল ; নাগ কেশরের নিবিড় পল্লবরাজির অন্তরালে থাকিয়া দয়েল আগমনী গাইল ; বকুলের ডালে বসিয়া পীকবধূ 'কু হু কু' রবে কুসুম কোমল কামিনীর সরল প্রাণে অপ্রীতির গরলধারা ঢালিয়া দিল। কাণে কাণে যেন বলিয়া দিল কুহু ধ্বনির সবই কু। মন্দিরের বহির্দ্বারে উচ্চতোরনে দামামা বাজিয়া উঠিল। কুটীরে কুটীরে চৌদিক কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—

"কুরু মা কল্যাণী কল্যাণ জীবে,
নমঃ কুলকুণ্ডলিনি নারায়ণি শিবে।"

মন্দিরবাসিনী যোগিনীগণ প্রাতঃকৃত্যান্তে কেহ বা কুসুম-চয়নে, কেহ বা মায়ের পূজার অন্যোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন।

আজ একাদশী,—পরিব্রাজক, মায়ের স্তাবক, উপাসক,—পূজক ও ভৈরবীগণের সংযমন ; সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী নিরম্বু উপবাস। যথা সময়ে ভক্তগণ একাগ্রচিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এদিকে মায়ের নিত্য-পূজার ধুম পড়িয়া গেল। পূর্ব্বাহ্নেই পূজা সমাপ্ত হইল, উদ্দেশ্য—পূজান্তে কল্যাণসম্প্রদায়কে উদয়গিরিতে দরবার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে।

আজ বন্দী ঠগীগণের বিচারের দিন। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শিবির শিরে জয় পতাকা উড়িল; রাশি রাশি ধূম উদ্গীরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি বৃটিশ রাজের বিজয় ঘোষণা করিল। শৈলশৃঙ্গ পত্র ও পতাকামালায় সুসজ্জিত ও সুবিস্তৃত সামিয়ানাতলে দরবারের বন্দোবস্ত হইল! এক পার্শ্বে বিচারাধীন বন্দীগণের জন্য ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যথাসময়ে বন্দীগণকে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত করা হইল; নিষ্কোষিত অসি হস্তে অশ্বারোহী ও পদাতিকগণ পাহারায় নিযুক্ত হইল। মণ্ড-পের সম্মুখে প্রাদেশিক সর্দ্দার ও জায়গীরদারগণের বসিবার ব্যবস্থা হইল। আর অপর পার্শ্বে কল্যাণসম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নিরূপিত থাকিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই দরবার ক্ষেত্রে লোকারণ্য হইল; জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; সকলেই নীরব,—নিস্তব্ধ। যথা-সময়ে বিচারপতি সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে দিগন্ত কাঁপাইয়া আবার তোপধ্বনি হইল: সভাপতি উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে শিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করিয়া বিচারের কার্য্যা-রম্ভ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে বন্দীগণের তালিকা উপস্থিত করা হইল; বিচারাধীন মোট ১৭২১ ঠগী। সর্ব্বাগ্রে ঠগীদলপতি চিতু সর্দ্দার ও অপহৃতা ব্রাহ্মণকন্যাকে বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। চিতুর তেজঃপুঞ্জ কান্তি, উন্নতললাট, বিশাল নয়ন, ধীর ও শান্তমূর্ত্তি দর্শনে কে মনে করিবে যে সে সুন্দর হৃদয় বজ্রময়!

বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কি ঠগীদলপতি চিতু সর্দ্দার" ?

উঃ—হুজুর বান্দার নাম চিত্রবর সিংহ ওরফে চিতু সর্দ্দার। ভন্‌সলা রাজ্যে সামান্য জায়গীরদার।

প্রঃ—উপস্থিত বন্দীগণ সকলেই কি তোমার দলভুক্ত পাঁওারী-নরঘাতক ঠগী?

উঃ—সকলেই দলভুক্ত কি না জানি না; এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কেহ বা আশ্রিত বা অনুগৃহীত, কেহ বা একক্রিয় মিত্র, কেহ বা সমপ্রাণ সখা।

প্রঃ—করোঞ্জার ব্রাহ্মণ কন্যাকে কি তোমরাই অপহরণ করিয়াছিলে?

উঃ—অপহরণ করিয়া সে কন্যাকে জীবন সর্ব্বস্বের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছি; স্নেহ ও ভালবাসার কোন ত্রুটী হয় নাই।

প্রঃ—সে ব্রাহ্মণ কন্যাকে জাতিচ্যুত ও আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ?

উঃ—সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তাহার জন্য মায়ের প্রসাদ বরাদ্দ ছিল। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও সে প্রসাদ ছুঁইবার অধিকার ছিল না।

প্রঃ—সে কন্যার নাম কি ও সে এখন কোথায়?

উঃ—নাম তারা—অই যে জীবন তারা হুজুরের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া।

প্রঃ—তারা তোমার ঔরসজাতা নহে—পালিতা কন্যা মাত্র!

উঃ—ভগবান আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন।—বলিতে বলিতে চিতুর হৃদয়ে কি লুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; তদীয় বদনমণ্ডল রক্তিমাভ হইল; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পুনঃ

কহিলেন "তারা আমার আপন কন্যা নহে, কিন্তু মায়ের প্রসাদ! করোঞ্চার ব্রাহ্মণ কন্যা! এ অপহরণ পাপেই ঠগী কুল নির্ম্মূল হইতে চলিল!

প্রঃ—তবে তুমি স্বেচ্ছাক্রমে ও অম্লান চিত্তে এ কন্যার উপর দাবীত্যাগ করিতেছ?

উঃ—তারা আমাকে সচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে তারা অত্যজ্য; তারা ত্রিদিবের অমৃত ধারা—এ জীবনের ধ্রুবতারা!

তারাকে উপলক্ষ করিয়া বিচারপতি—জিজ্ঞাসা করিলেন. "তুমি কি ধারে যাবে"।

অবনত বদনে মধুর বচনে তারা কহিলেন, 'আমার পিতার কাছে'।

প্রঃ—টোমার পিটা কে?

পার্শ্বে দণ্ডায়মান গোসাঞীকে—দেখাইয়া বলিলেন, "এই আমার পিতা: সর্দ্দারজী পিতৃস্থানীয় পালক পিতা মাত্র"।

বিচারপতি চিতুসর্দ্দারকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "টারার প্রার্থনা মঞ্জুর এ সম্বন্ধে তোমার কোন ওজর আছে"?

চিতুসর্দ্দার মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "এ বিচার ক্ষেত্র—আমার মতামত সাপেক্ষ কি! তারার উপর—ধর্ম্মতঃ দাবী থাকিলেও আইনতঃ নাই। তারা যেখানে থাকিয়া সুখী হয়, সেখানেই যেতে পারে। পিতার কাছে থাকে, ইহাই বাঞ্ছনীয়"।

একথা শুনিয়া বিচার পতি স্মিত মুখে কহিলেন, টারা

তোমাকে মুক্তি দেওয়া গেল, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার পিতার কাছে যেতে পার। তারা সসম্ভ্রমে বিচার পতিকে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন। অমনি কল্যাণ সম্প্রদায় মহোল্লাসে উচ্চধ্বনি করিলেন ;—

"কুরু মা কল্যাণী কল্যাণ জীবে,
নমঃ কুল কুণ্ডলিনী নারায়ণি শিবে"।

এস্থলে দরবারের প্রথম যবনিকা পতিত হইল। তদনন্তর ঠগীগণের বিচারপর্ব্ব আরম্ভ হইল। কিন্তু এক্ষেত্রে বিচার-পতিকে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হইল না। প্রথমে দলপতি চিতুসর্দ্দার, পরে দফাদার আমীর আলী, তৎপর কোষাধ্যক্ষ জয়নন্দন ওরফে শান্তশীল বীরের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে নরহত্যা ও চৌর্য্য বৃত্তিদ্বারা অর্থোপার্জ্জন জনিত অপরাধ স্বীকার করিল। বন্দীগণ সকলেই মরিতে প্রস্তুত, সুতরাং কেহই মিথ্যা বলিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিল না। বিচারপতি চিতুসর্দ্দারকে কহিলেন, দলপতি, তোমার সাহস ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া সুখী হইলাম ; ভাল তোমাদের দলভুক্ত আর কত ঠগী আছে !

উঃ—আমি বন্দী—ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিব, সেও স্বীকার, কিন্তু আমার নিকট ঠগীর কোন সন্ধান পাবেন না—সেটী ঠগীর ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।—

প্রকৃতপক্ষে অনেক চেষ্টা করিয়াও এক ঠগী হইতে অন্য ঠগীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

বিঃপঃ—তোমার পরিবার বর্গে কে কে আছে ?

চিতু—দুই স্ত্রী আর দাস দাসী মাত্র !

বিঃপঃ—তাহাদিগকেও মুক্তি দেওয়া গেল। আজীবন তাহারা নওয়া গড়ে থাকিবার অধিকার পাইল। তোমার আর কিছু বলিবার আছে।

চিতু সর্দ্দার পরিবারের মুক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া কহিল, এখন আর আমার মরিতে কষ্ট নাই। এই হস্তে কত জীবহত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছি, কত অপগণ্ড শিশুকে পথের ভিখারী করিয়াছি, কত সতী সাবিত্রীর সিঁথির সিন্দুরবিন্দু বিলোপ করিয়াছি,—তাহার ইয়ত্তা নাই। ভন্‌সলা রাজের অনুগ্রহে উদরান্নের অভাব ছিল না, কেবল মায়ের আদেশ পালনই এ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। আমার শেষ প্রার্থনা এ দরখাস্তেই জ্ঞাতব্য বলিয়া এক মোড়ক কাগজ সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিল। তাহাতে লেখা ছিল ঃ—

১ম দফা—তারার বিবাহের বয়স হইয়াছে একদা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া উন্নত বংশে বিবাহ দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম ; দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা হয় নাই। ভবিষ্যতে তারার কোন কষ্ট না হয়, সেজন্য স্বেচ্ছাক্রমে ও সন্তুষ্টচিত্তে চম্পা, চন্দনা ও চৌগায়ী এই তিন খানা গ্রাম ও নগদ লক্ষ টাকা তারাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

২য় দফা—৺ভবানীর সেবা—ভবানীপুরে যে পৈতৃক ইষ্টদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহার নিত্য সেবা ও পূজার জন্য ভবানীপুর গ্রাম খানি দেবোত্তর থাকিল।

৩য় দফা—পারিবারিক ব্যবস্থা—পরিবারের মধ্যে দুই স্ত্রী ; এতদ্ব্যতীত বৃত্তিভোগী দাস দাসী ও অন্যান্য চাকরগণ আছে।

পূর্ব্বোক্ত ৩ খানি গ্রাম ব্যতীত আর ১৮ খানি গ্রাম আছে; উহার এক তৃতীয়াংশ তারা, এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীদ্বয়ের ভরণ পোষণার্থ ও বক্রী তৃতীয়াংশ কল্যাণীর শ্রীচরণে সমর্পিত হইল। শেষোক্ত অংশের আয় হইতে কল্যাণে একটী রোগীনিবাস সংস্থাপিত হয় এই প্রার্থনা।

৪র্থ দফা—গুপ্তধনের ব্যবস্থা—কপর্দ্দক ও উদরান্নের জন্য ব্যয় হয় নাই। ভবানীপুরের পঞ্চদশক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে মুণ্ডল পর্ব্বত-শিখরে কালী মায়ীর এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তত্র প্রতিষ্ঠিতা কালী মায়ীই ঠগীর বরদাত্রী ইষ্টদেবী। দেবীর প্রকোষ্ঠের পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র কুঠরীতে শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত এক উচ্চ বেদী আছে; ঐ বেদীই গুপ্ত ধনাগার। অপুত্রক বন্দীর সোপার্জ্জিত অর্থ সরকার বাহাদুরের প্রাপ্য। তারাকে প্রদত্ত এক লক্ষ টাকা বাদে বক্রী অর্থ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা গেল। ঐ গুপ্ত কোটরে হাতের লেখা এক খানা খাতা আছে; তাহাতে অনেক হতব্যক্তির নাম ধাম ও অনেক স্থলে অবলুণ্ঠিত ধনের পরিমাণও লেখা আছে; সরকার বাহাদুরের কর্ত্তব্য হইবে যে সূক্ষ্মানুসন্ধানে হতভাগ্যদের স্ত্রী পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের ন্যায্য অর্থ তাহাদিগকে অর্পণ করেন।

দান পত্র পাঠ শেষ হইলে শান্তশীল কহিলেন, "নওয়াগড়ের তোষাখানায় যে অর্থ মজুত আছে তাহার কি ব্যবস্থা হবে?

চিতু—সেখানে কত টাকা আছে?

উঃ—কিঞ্চিদধিক ত্রিশ সহস্র।

সে কথা শুনিয়া চিতুসর্দ্দার উর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশ পানে

তাকাইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া কহিল, "ইংরাজ রাজ পাষণ্ড ঠগী দলন করিয়া আজ উদয়গিরিতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিলেন। এই স্মৃতি রক্ষার্থ এ দরবার ক্ষেত্রে বিংশতি সহস্র অর্থ ব্যয়ে এক ধর্ম্মশালা ও অবশিষ্ট অর্থে তারার বাসোপযোগী স্বতন্ত্র ভবন নির্ম্মাণের জন্য প্রদান করিলেন। তৃতীয় দফার শেষ ভাগে এ কয়টা কথা যোগ করা হইল। অতঃপর চিতু কহিল, আমার আর কিছু বলিবার নাই; এখন দণ্ডাজ্ঞা সাপেক্ষ।

বিঃপতি—তোমার গুপ্ত ধনাগারে কত টাকা আছে?

চিতু—স্বর্ণরত্ন, আসরফি ও নগদ টাকায় বোধ হয় সপ্তলক্ষাধিক হবে।

গুপ্ত ধনের পরিমাণ শুনিয়া বিচারপতি বিস্মিত হইলেন; মেজর সাহেব মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া ভাবিলেন, এক দিকে ঠগী নিবারণ অন্য দিকে অপ্রত্যাশিত প্রচুর অর্থ সমাগম—সোণায় সোহাগা। মধ্যপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ হয়তঃ তাহারই অদৃষ্টে ঝুলিতেছে। বিচারপতি ঠগী সর্দ্দারকে প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন, ঠগীপতির সদাশয় ও সঞ্চিত অর্থরাশির এতাদৃশ সাধু ব্যবস্থায় বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। কিন্তু অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহারে উপযুক্ত দণ্ডের তারতম্য করা অসম্ভব। নরঘাতক ঠগীপতির উপযুক্ত দণ্ড—ফাঁসি—এবং তাহার প্রতি ঐ দণ্ডাজ্ঞাই দেওয়া হইল। আমীর আলী ও অন্যান্য দলাগ্রগণ্য ঠগীদেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কোষাধ্যক্ষ শান্তশীলকে লক্ষ্য করিয়া সেনাপতি কহিলেন, ইনি ঠগীসর্দ্দারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মাত্র, নরহিংসাপরাধের প্রমাণাভাব।

বিচারপতি শান্তশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে ?"

বন্দী শান্তশীল কহিলেন, "আমিও সম্পূর্ণ অপরাধি : অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী নহি।

এ কথায় কল্যাণসম্প্রদায়ের আশা ভরসা সব ফুরাইল : ভৈরবীর জীবন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল ; মিলনের সাধ পূর্ণ হইল। শান্তশীলেরও ফাঁসির আদেশ হইল। কল্যাণসম্প্রদায়ের আগ্রহে বিচারপতি কহিলেন, শান্তশীলকে ক্ষমা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ করা হইবে। আর জানাইলেন, অদ্য হইতে পক্ষান্তে অপরাধীদের ফাঁসী হইবে। বন্দীগণ লাট দরবারে এ হুকুমের বিরুদ্ধে বিচারার্থী হইতে পারে।" চিতু সর্দ্দার প্রমুখ বন্দীগণ মুক্তকণ্ঠে কহিল, "আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব না, ফাঁসীই আমাদের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।"

এস্থলে বলা আবশ্যক যে বন্দী ঠগীগণের মধ্যে ১২১ জনের ফাঁসী এবং অবশিষ্টদের দীর্ঘকাল কারাবাসের আদেশ হইল। তোপশাল হইতে এক দুই করিয়া সাতবার তোপধ্বনি হইলে দরবার ভঙ্গ হইল।

নবম কল্প।

প্রপঞ্চের লীলা অতি বিচিত্র,—কবি কল্পনার অতীত। সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, রোগ শোক, ধন মান, আশা ভরসা—নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। উদয়গিরির বিচার ব্যাপারই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঠগী দমন ইংরাজ রাজত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সে কীর্ত্তি সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

বিচারান্তে বন্দীগণ পুনঃ বন্দীশালায় প্রেরিত হইল। কল্যাণ-সম্প্রদায়ের অনুরোধে বিশেষতঃ লালজীর অনুগ্রহে শান্তশীল পূর্ব্বের ন্যায় কল্যাণে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইলেন। পক্ষান্তে তাহাকে উদয়গিরিতে উপস্থিত করার ভার লালজীর স্কন্ধেই ন্যস্ত হইল।

বন্দীগণের অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহণে স্বয়ং মেজর সাহেব ও পশ্চাতে সেনাপতি চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পরিণত বয়স্ক জনৈক রাট সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতর বচনে চিতু সর্দ্দারকে কহিল, "সর্দ্দার জি! কর্ম্মফল ত ফলিল; এখন এ দাসের প্রতি কি আদেশ"? সে স্থানে সহসা পরিচিত বিশ্বস্ত ভৃত্যের কথা শুনিয়া চিতু চমকিয়া উঠিল, এবং ক্রন্দমান ভৃত্যকে কহিল, "কে বেটহল—তুমি এখানে কেন"?

বট—প্রভুর আদেশ পালনার্থ; সর্দ্দারের আদেশ ছিল, তাই বিচার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি—বলিয়া বৃদ্ধভৃত্য—হো! হো! করিয়া বালকের ন্যায়—কাঁদিতে লাগিল। সে

দৃশ্যে মেজর সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দীগণের গতি থামিয়া গেল।

চিতু—বেটহল, তুমি নির্দ্দোষী, তোমার কোন ভয় নাই।—তৎপর মেজর সাহেবকে কহিল, হুজুর এ লোকটী আমার বৃদ্ধ বিশ্বস্ত ভৃত্য; মুণ্ডাদের ধনাগার রক্ষার ভার ইহারই হাতে; এ ব্যক্তিই সমস্ত দেখাইয়া দিবে। কার্য্যান্তে যেন ইহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

মেজর—নিরপরাধীর দণ্ড সুবিচারে নাই; কিন্তু উপস্থিত ইহাকেও বন্দীভাবে থাকিতে হইবে।

মেজর সাহেবের হুকুমানুসারে বৃদ্ধ বেটহল ফৌজের হস্তে বন্দী হইল। বন্দীগণ যথাস্থানে রক্ষিত হইলে মেজর সাহেব আপন শিবিরে ফিরিলেন; সেনাপতিও অনুমতি লইয়া আপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। গাত্র দহনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তানল আসিয়া বীর হৃদয়কে বিচলিত করিয়া তুলিল। শান্তশীলের জীবন দণ্ডাজ্ঞায় মোহিত লাল মর্ম্মাহত হইলেন, তারালাভে হতাশ হইলেন; সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, আশা ভরসা অতলে ডুবিল। সে মর্ম্মভেদী চিন্তায় লালজী বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। অন্যদিন দফাদার আসিলে তাহার সঙ্গে মন খুলিয়া আলাপ করেন, আজ দফাদার আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, লালজী তাহা লক্ষ্য করিলেন না। উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় এক একবার বলিতেছিলেন, "উঃ কি সর্ব্বনাশ! কোথা-

ধ্যক্ষের ফাঁসী! কল্যাণ সম্প্রদায়ের এত কষ্টের কি এই পুরস্কার” কখন বা বলিতেছিলেন,“তবে আশা পুরিল না—তারা লাভ হইল না” সে কয়টী কথা বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপবৎ অজ্ঞাতে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে বিনির্গত হইল। দফাদার সেনাপতির সেরূপ ভাঁবান্তর দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল। কতবার ডাকিল, কিন্তু কোন কথা লালজীর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল না। এভাবে কিছুকাল কাটিল, দফাদার ও কাষ্ঠ পুত্তলীকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে জনৈক দ্বার রক্ষক আসিয়া নিবেদন করিল—“কল্যাণ ছে একঠো সাধু আয়া মোলাখাৎ চাতে।”

সাধুর নাম শুনিয়া লালজীর চৈতন্য হইল, তিনি উৎসাহ ভরে কহিলেন, “জল্‌দি লে আও”।

বার্ত্তাবহ চলিয়া গেলে দফাদার কহিল, ‘আপনার শরীর বোধ হয় ভাল নয়।”

লালজী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “দফাদার এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন?”

দফা—আমি অনেকক্ষণ আসিয়াছি; সেলাম করিলাম, দুই এক বার ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই।”

লালজী সাবধানে মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, “বোধ হয় একটুকু তন্দ্রাবেশ হইয়াছিল!”

দফা—সম্ভবতঃ চিন্তাকুলতাও ছিল। একবার স্বীয় ভ্রম বুঝিয়া লালজী কহিলেন, দফাদার, তোমার অনুমান সত্য; আমার কোন বিষয় তোমার অজ্ঞাত নাই. কোন কথা

গোপন করিতেও ইচ্ছা নাই। আজ যে ব্রাহ্মণকন্যাকে মুক্তি দেওয়া গেল, তাহাকে দেখিয়াছ ?

দফা—দেখিয়াছি যেন শারদাকাশে সন্ধ্যার উজ্জ্বল তারা !

লালজী—সেদিন কাহার কৌশল ও ততোধিক অনুগ্রহে নওয়াগড় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম, জান ?

দফা—সে কথা বলেন নাই।

লালজী—সেও সেই ব্রাহ্মণকন্যার অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে। আর সেদিন রণক্ষেত্রে যে বিষাক্ত তীর ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহাও তাঁহারই সঙ্কেতবলে। এ কন্যার নাম তারা ; তারারূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ; এ হৃদয়াকাশের ধ্রুবতারা !

শীতকালের প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে বিগত কুজ্ঝটিকার ন্যায় দফাদারের মনের খট্‌কা ঘুরিয়া গেল ; দফাদার বয়োজ্যেষ্ঠ, সংসারাভিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল। সে সরল সুমিষ্ট বচনে কহিল, অভিষ্ঠ সিদ্ধির কোন সদুপায় থাকিলে বলুন আদেশ পালনে কালবিলম্ব হইবে না। চিতুসর্দ্দার দানপত্রে পালিত কন্যার জন্য যথেষ্ঠ ব্যবস্থা করিয়াছে।

লালজী—দফাদার, আমি অর্থাভিলাষি নহি ; জীবন রক্ষয়িত্রী বলিয়া তারার গুণেরই পক্ষপাতী।

দফা—শোভা আর সম্পত্তি সুখ ও শান্তির একত্র মিলন। সাধু যাঁহার সঙ্কল্প, ভগবান তাঁহার সহায়। অনুমতি হইলে কল্যাণসহ তারাকে এখনই উদয়গিরিতে উপস্থিত করিতে পারি।

লালজী হাসিয়া কহিলেন, ততদুর কষ্ট করিতে হবে না। বিবাহ একরূপ স্থির, ত্রয়োদশীতে গোধূলি লগ্নে বিবাহ স্থির হইয়াছে। এখন ভয়, শান্তশীলের ফাঁসীর আদেশে কল্যাণে হুলস্থুল পড়িয়াছে। সুতরাং বিবাহ পণ্ড হওয়াই আশঙ্কা।

দফা—এ অবস্থায় হতাশের কারণ নাই; বাগ্‌দানের পর বিবাহ অবশ্যম্ভাবী! কল্যাণাগত সাধুর নিকটই হয় ত সংবাদ পাওয়া যাবে, অন্যথা নিশা প্রভাতের পূর্ব্বেই সংবাদ আনিয়া দিব। এ বিবাহের কন্যাকর্ত্তা কে?

লালজী—কল্যাণ সম্প্রদায়াগ্রগণ্য গোসাঞীই কন্যাকর্ত্তা।

দফাদার সন্তোষ সহকারে কহিলেন, "তবে নিশ্চিন্ত হউন, তাঁহার কথায় অন্যথা হবে না।" উভয়ের একরূপ কথা আলাপ হইতেছিল, সে সময়ে দ্বাররক্ষক সাধুর সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে লালজী সাদরে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিলেন। আগন্তুক স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা গোসাঞী ঠাকুর। দফাদার সাদরে সাধুকে আসন প্রদান করিল।

কিয়ৎকাল সকলে নীরব নিস্তব্ধ; সুচতুর দফাদার কহিল, গোসাঞীর আগমনের কারণ বোধ হয় গুহ্য, অন্যের অশ্রোতব্য! অনুমতি হইলে বিদায় হইতে পারি।

সেকথা শুনিয়া গোসাঞী লালজীর মুখপানে চাহিলেন। তদর্থ বুঝিয়া লালজী কহিলেন, "না তোমার থাকিতে কোন বাধা নাই আমার কোন কথা তোমার অজ্ঞাত নাই; তুমি জান, কল্যাণসম্প্রদায়ের নিকট আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি; পাষণ্ডপীড়ারীদলন আর এতদঞ্চলে ইংরাজের

ধৰ্ম্মরাজ্য সংস্থাপন তাঁহাদেরই নিষ্কাম অনুগ্রহের ফল! কিন্তু কল্যাণের সম্মান রক্ষা হইল কৈ” বলিতে বলিতে লালজীর নয়ন বাষ্পাকুল হইল কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ভৈরবীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি আকুল হইলেন।

গোসাঞী—লালজীকে প্রবোধবাক্যে কহিলেন, আপনি কোষাধ্যক্ষের দণ্ডাজ্ঞার কথা মনে করিয়া এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? শান্তশীলের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, স্বেচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে! আজ কল্যাণে অশান্তির সীমা নাই। জয়া মন্দিরে আসেন নাই—সন্ধ্যারতি ও অৰ্দ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে মাত্র!

লালজী—ভৈরবী ও অন্যান্য?

গোসাঞী—বাত্যাহত লতাবল্লরীর ন্যায় ইতস্ততঃ ধূল্যবলুণ্ঠিতা! সকলেই অবসন্ন ও আত্মহারা!

লালজী—আর শান্তশীল?

গোসাঞী—স্থির—গম্ভীর। মায়ের ধ্যানে মগ্ন, মুখ উজ্জ্বল—বিষাদশূন্য!

লালজী—তাঁহার হৃদয়বল অসাধারণ।

দফা—ততোধিক সততা ও সদাশয়তা; অন্যথা প্রভুর ন্যস্ত অর্থ অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন।

গোসাঞী—অর্থই অনর্থের মূল—বিষয় বিষময়—ইহা তাহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; একদিন যে অর্থাভাব এ অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল, কল্যাণীর ইচ্ছায় আজ অৰ্জ্জিত অর্থেও তিনি বীতস্পৃহ।

অতঃপর গোসাঞী আবার লালজীর মুখপানে তাকাইলেন। সে চাহনীর অর্থ বুঝিয়া লালজী কহিলেন, নিঃশঙ্কচিত্তে যে অনুমতি হয় করুন্।

গোসাঞী—পরশু ত্রয়োদশীতেই লগ্ন স্থির হইয়াছে ; আগামী কল্য যথারীতি সংযত ও উদ্বাহদিনে উপবাসী থাকিতে হবে। গোধূলি লগ্নেই কার্য্য হবে এবং লগ্নোপস্থিতির যেন মন্দিরে আগমন হয়।

এ কথা শুনিয়া ঘাম দিয়া লালজীর চিন্তাজ্বর দূর হইল ; তিনি বিনয়বচনে কহিলেন, "ভবদীয় আদেশ শিরোধার্য্য !" কিন্তু কল্যাণীর কি ইচ্ছা কে জানে ?

"কল্যাণীর মন্দিরে অকল্যাণের আশঙ্কা নাই" বলিয়া গোসাঞী গাত্রোত্থান করিলেন। লালজী অভিবাদন করিলে "কুরু কল্যাণি কল্যাণ জীবে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

গোসাঞী চলিয়া গেলে দফাদার হাসিতে হাসিতে কহিল—"লগ্ন উপস্থিত প্রায় ; কন্যাকর্ত্তা প্রস্তুত, বরপক্ষকেও প্রস্তুত হইতে হয়"।

লালজী—সেজন্য কোন কষ্ট পাইতে হবে না, তুমি ও ২ জন পদাতিক মাত্র সঙ্গে যাইবে। কিন্তু এ বিবাহে হর্ষে বিষাদ—আলোকে আঁধার !

সে কথা শুনিয়া দফাদার বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সে কি লালজি ! এ শুভমিলনে আকাশের তারা—সংসার সুষমা, মণিময় কণ্ঠমালা ধারণে আবার হর্ষে বিষাদ কেন ?

"সে বড় নিদারুণ ঘটনা" বলিয়া ভৈরবীর সঙ্গে শান্তশীল ও তারার সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন।

দফা—আপনি তত শঙ্কিত হইবেন না। ভৈরবীরা স্বামী-বিরহকাতরা নহেন, যোগ ও সাধনই তাঁহাদের জীবনব্রত। এ ক্ষেত্রে কন্যা সম্প্রদান কে করিবেন ?

লালজী—কন্যার পিতা স্বয়ং গোসাঞী।

দফাদার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিল ; কৌতুহলভরে কহিল—"সত্যই কল্যাণ মায়াপুরী : পিতা পুত্রীর অপ্রত্যাশিত সন্দর্শন—আর রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন !

লালজী হাসিয়া কহিলেন, সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। আপাততঃ একথা যেন কর্ণান্তর না হয়।

অতঃপর দফাদার চলিয়া গেলে লালজী শয্যাগত হইলেন, কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ !

দশম কল্প।

বিচারান্তে কল্যাণসম্প্রদায় কল্যাণে প্রত্যাগত হইলেন কিন্তু ভৈরবী ফিরিলেন না। ভৈরবীর শূন্যকক্ষে জয়া চঞ্চলার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল; আজ জয়া আত্মহারা, কর্ত্তব্য-বিহীনা পাগলিনীপারা। ভৈরবীর পরিণাম ভাবিয়া আজ জয়ার হৃদয় ভাসিয়া গেল; তিনি আর মন্দিরে গেলেন না, মায়ের সন্ধ্যারতিতেও যোগ দিলেন না। আর শান্তশীল? তিনি অম্লানচিত্তে নবোদ্যমে আরতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মবীরের ন্যায় ধ্যানস্থ হইলেন। শান্তশীল ভৈরবীকে বলিয়াছিলেন, "এ মিলন ইহকালের জন্য নহে পরকালের জন্য অক্ষয় মিলন।"

ভৈরবী আজ সেই অক্ষয়মিলনের মূলসাধনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দিরে না ফিরিয়া দুর্গম নির্জ্জন প্রান্তর পথে অনুশীলার স্বামীজী কুটীরে চলিয়া গেলেন।

এস্থলে অনুশীলার একটুকু পরিচয় করা আবশ্যক। এতদ্প্রদেশে অনুশীলা সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর কিম্বদন্তি আপামর সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে। কল্যাণের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে যে বিস্তৃত শৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়, পুরাকালে উহা দ্বিখণ্ডে বিভক্ত ছিল, একখণ্ডে অতুল অপর খণ্ড শিলোড়া নামে অভিহিত হইত। "কে বড় কে ছোট" এ কূটতর্ক ধরিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিষম বিরোধ চলিতেছিল: অতুল পুরুষ আর শিলোড়া প্রকৃতি কালক্রমে

ভগবানের ইচ্ছায় পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ মিটিয়া গেল, এবং আশ্রিত উপত্যকাসমূহের অনুরোধে অম্বুরসঙ্গে শীলার পরিণয় হইল। তদবধি নবদম্পতির বিশালদেহের একত্র মিলন হইল এবং উভয়ের সংযোগস্থলে একটি বিচিত্র গিরিসঙ্কটের সৃষ্টি হইল। কালে এই গিরিসঙ্কটই **'সাধনশালা'** নামে পরিচিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে নবদম্পতি বড় শিব সাধক ছিলেন; তাঁহাদের সাধনবলে ভক্তপ্রিয় ভুতনাথ সে সাধনশালায় আবির্ভাব হইয়া শিষ্যদ্বয়কে ভগবৎতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। সে গিরিসঙ্কটে সুন্দর একটী প্রকোষ্ঠ ছিল; প্রকোষ্ঠ মধ্যে দুই পার্শ্বে দুই খানি নাতি দীর্ঘ উপলখণ্ড আর উভয়ের মধ্যে একটি শিলাময় বেদী তখনও অক্ষুন্নভাবে বিরাজ করিতেছিল। উপলখণ্ডদ্বয় অনুশীলার খট্টা ও সে সুন্দর প্রস্তরবেদী ভগবানের আসন বলিয়া অভিহিত হইত। অনুশীলার কঠোর যোগ সাধনে শৈলেশ্বর এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে ভক্তদ্বয়ের ক্ষণিক ত্যাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; অবশেষে ভগবতীর উপদেশে ভগবান অনুশীলাকে শিবলোকে লইয়া গেলেন; মুক্তি পদে ভক্তির মিলন হইল। অনুশীলার শিলাময় আত্মার শিবপ্রাপ্তি হইল! কেবল দেহ-পিঞ্জর অনুশীলা শৈলমালায় জীবলোকে সাধন শিক্ষার আদর্শ-স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিল। সাধনশালার মাহাত্ম্য বহুকাল পর্য্যন্ত সে পার্ব্বত্য প্রদেশে জাগ্রত ছিল; কিন্তু কল্যাণীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলার গৌরব অস্তমিত হইয়াছিল।

সেই শৈলমালার মূলদেশে অম্বুলা ও শীলোড়া নামে দু খানি

গণ্ডগ্রাম আজও অনুশীলার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। গ্রামে পার্ব্বত্য লোকের অধিবাস; গ্রামবাসীরা সর্ব্বশক্তি ভগবতীর উপাসক সুতরাং কল্যাণের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বিলক্ষণ ছিল। একদা শীলোড়াবাসিনী জনৈকা বৃদ্ধা রমণীর মুখে অনুশীলার যোগমাহাত্ম্য ও বৃদ্ধ বাবাজীর সাধনাশ্রমের কথা শুনিয়া বিন্দুর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে "সাধনশালাই" যোগ সাধনের প্রশস্ত স্থান। ভৈরবী মঙ্গলাকে বলিয়াছিলেন, "কল্যাণের কামনা পূর্ণ হইল, এখন সাধনশালায় যোগ সাধন করিবার সুযোগ পাইলেই জীবনের সাধ পূর্ণ হয়। কল্যাণীর ইচ্ছায় স্বামীসন্দর্শন ঘটিয়াছে, এখন অনুশীলার অনুগ্রহে সাধন-শালায় দেহ পাত হইলেই এ জীবনের ব্রত সাঙ্গ হয়"। তাই ভৈরবী আজ সে ব্রতোদ্‌যাপনের পথে চলিয়াছেন।

অনুশীলার কতিপয় স্ত্রী পুরুষ উদয়গিরির দরবারান্তে অনু-শীলায় ফিরিতেছিল। ইহাদের মধ্যে জনৈকা স্ত্রী অগ্রগামিনী ভৈরবীকে দেখিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, 'দেবি!' সে কথা শুনিয়া ভৈরবী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনুবর্ত্তীগণ নিকটস্থ হইলে মধুর বচনে কহিলেন, "তোমরা কে—কোথায় যাইতেছ।"

দলস্থ জনৈকা প্রৌঢ়া ভৈরবীকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "আমরাও কল্যাণীর সেবিকা, অনুশীলায় আপন আপন আলয়ে যাইতেছি।"

ভৈরবী—"কুরু কল্যাণী কল্যাণ জীবে"। তোমরাও বোধ হয় উদয়গিরি হইতে আসিতেছ?

প্রৌঢ়া—দেবীর অনুমান সত্য ; মন্দিরের পথ ভুলিয়া সম্ভবতঃ অনুশীলার পার্ব্বত্য পথে আসিয়াছেন।

ভৈরবী—আমিও অনুশীলায় যাব।

প্রৌঢ়া—প্রয়োজন ?

ভৈরবী—বাবাজীর কুটীরে তদ্দর্শনার্থ তুমি আমাকে নিয়ে চল।

প্রৌঢ়া—ভৈরবীর সেবাই আমার নিত্যকর্ম্ম, অনুমতি হইলে এখনই কুটীরে পৌঁছাইব ?

ভৈরবী—তবে চল ; সঙ্গীগণ তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, অন্য কথা পরে হইবে।

প্রৌঢ়ার নাম বুধিয়া ; তাহার সঙ্কেতানুযায়ী সঙ্গীগণ অগ্রগামী হইলে ভৈরবীর সঙ্গে মন্থর গমনে বুধিয়া বাবাজীর কুটীরাভিমুখে চলিল। যথাসময়ে বাবাজীর কুটীরে ভৈরবীকে পৌঁছাইয়া বুধিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল।

ভৈরবী যখন অনুশীলায় পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর ; বাবাজী তখনও ধ্যানস্থ। ভৈরবী অতি সন্তর্পণে ভক্তিভরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাবাজী ধ্যানান্তে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া আগন্তুকাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভৈরবী বাবাজীকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া সশঙ্কোচে কক্ষ মধ্যে বিস্তৃত কৃষ্ণা-জীনের একপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন।

বাবাজী যোগাসন হইতে প্রশ্ন করিলেনঃ—এ অসময়ে আগমনের উদ্দেশ্য ?

উঃ—দীক্ষাকাঙ্ক্ষিনী !

প্রঃ—বাহ্যিক আকারে যোগাবলম্বিনী বলিয়া প্রতীতি জন্মে !

উঃ—সাধন শিক্ষার্থিনী মাত্র—এখনও দীক্ষা হয় নাই।

প্রঃ—শিক্ষার আরম্ভ কোথায় ?

উঃ—প্রথম করোঞ্চায় পরে কল্যাণে। উপযুক্ত গুরুর উপদেশ লাভ এখনও হয় নাই।

প্রঃ—সংসার মায়া ?

উঃ—এক প্রকার কাটাইয়াছি ; উপযুক্ত শিক্ষাবলে ততোধিক গুরু মাহাত্ম্যে কামনাহীন হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

বাবাজী—অনুশীলায় সাধনশালা আছে কিন্তু সাধকের অভাব।

সে কথা শুনিয়া ভৈরবীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল ; হৃদয়ে বল আসিল ; তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, অভাগিনী সাধনশালায় সাধনাভিলাষিণী, ভবদীয় অনুমতি সাপেক্ষ।

বাবাজী—সাধনে অধিকার থাকা চাই।

ভৈরবী—অধিনী সংসারত্যাগিনী বিগতবাসনা ব্রাহ্মণকন্যা।

বাবাজী—সাধু ! সাধু ! শৈলেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

ভৈরবী—উপযুক্ত গুরুর সদুপদেশ ব্যতীত সাধনাসিদ্ধির আশা অতি বিরল।

বাবাজী—শিষ্যের উপর গুরুর স্নেহ পিতৃবৎ ; ঐ তাম্রকুম্ভে রক্ষিত মন্ত্রপূতঃ সিদ্ধোদকে আচমন কর, এখনই তোমার হৃদয়ের ভার লঘু হইবে। ভৈরবী মহাপুরুষের আদেশ পালন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

মহাপুরুষ কহিলেন—শান্তি—শান্তি! সুরকণ্ঠে শান্তি উচ্চারণে অনুশীলার শান্তিধারা যেন সংসারপ্রলয়পীড়িতা ভৈরবীর প্রাণে সুধা বর্ষণ করিল; তাহার চিন্তাকুল হৃদয় যেন তিলেকে শান্তিময় হইল। রোগক্লিষ্ট বদনমণ্ডল সুপ্রসন্ন হইল, নয়নে অলৌকিক জ্যোতিঃ বিকাশ পাইল। ভৈরবীর তদানীন্তন সাম্যমূর্ত্তি দর্শনে বোধ হইল যেন সংসারের বিভীষিকাময় প্রহেলিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভক্তিসাগরের প্রক্ষিপ্ত তরঙ্গবৎ কোথায় ছুটিয়া যাইতেছেন। ভৈরবী বিনীতবচনে কহিলেন, "প্রভো! মহাপুরুষের চরণাশ্রয়ে অভাগিনীর হৃদয়ের গুরুভার লাঘব হইয়াছে; আমি যেন সংসারের বাহিরে আসিয়াছি। আমার চক্ষে যেন সমস্ত অসীম অনন্ত শূন্যময় বোধ হইতেছে।" বাবাজী—সংসারীর অসংসারী হওয়াই মহত্ত্ব, সে কেবল দৈববলেই সম্ভবে। তোমার উপর ভগবানের অনুগ্রহ আছে, তোমার সাধনশক্তি অসামান্য! তুমি দীক্ষিতা হওয়ার উপযুক্ত; কিন্তু তৎপূর্ব্বে পরিচয় পাইলে সুখী হইব।

ভৈরবী আজ অম্লানচিত্তে আত্মপরিচয় দিলেন। ইন্দুর মৃত্যুর পর গোসাঞীর গৃহত্যাগ, ঠগী করে চঞ্চলাপহরণ, তদ্দেশে যোগিনী বেশে করোঞ্জা ত্যাগ, অবশেষে স্বামিজীর সঙ্গে নদী সৈকতে সাক্ষাৎ ও কল্যাণে আগমন পর্য্যন্ত সকল কথা সংক্ষেপে বিবরণ করিলেন; কেবল কল্যাণে স্বামী সন্দর্শনের কথা গোপন রাখিলেন। সে বিবরণ শুনিয়া বাবাজী হাসিয়া কহিলেন, করোঞ্জার কর্ম্মফলে কল্যাণীর মাহাত্ম্য দিগন্ত বিকীর্ণ হইল। তদনন্তর ভৈরবীকে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সাধন

তন্ত্রের গুহ্যতত্ত্ব বলিয়া দিলেন। দীক্ষান্তে ভৈরবী বিদায় লইলেন। বলা বাহুল্য যে মহাগুরুপ্রদত্ত সে মহাতন্ত্রই সাধন-শালায় শব-সাধনের মূলমন্ত্র হইল।

একাদশ কল্প।

উদয়গিরি হইতে গোসাঞী যখন কল্যাণে ফিরিলেন, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত ; একাদশীর চাঁদ কল্যাণ সম্প্রদায়ের বিষাদে বিষণ্ণ, নক্ষত্রমালা অপ্রসন্ন ; চন্দ্রিমার তেমন বিকাশ নাই, ফুটন্ত তারকাদলে তেমন বিভা নাই। দিঙ্মণ্ডল যেন বিষাদের ছায়ায় আবৃত ; আঁধারজাল যেন অজ্ঞাতে আসিয়া কল্যাণ ঘেরিয়া ফেলিল।

আজ সংসারবিরাগী গোসাঞী চিন্তাক্লিষ্টচিত্তে সন্ন্যাস ও সংসারাশ্রমের বিষম বিকল্পময় সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া। সর্ব্বত্যাগী হইয়াও একদিকে মাতৃহীনা পরগৃহে প্রতিপালিতা চঞ্চলাকে পাত্রস্থ করার বাসনা, অন্যদিকে ভোগ বাসনা বিবর্জ্জিতা অভাগিনী বিন্দুর পরিণাম চিন্তা করিয়া ব্যাকুলতা। একদিকে কন্যার বিবাহজনিত অচিন্ত্য অপ্রত্যাশিত উল্লাস ; অন্যদিকে বিন্দুর অস্তিত্বে হতাশ। তাই আজ গোসাঞীর যোগময় হৃদয় সংসার আবল্যে আবিলিত ; মন উদ্বিগ্ন।

গোসাঞী আপন কুটীরে না গিয়া বরাবর বিন্দুর কুটীরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। একি ! কুটীরের দ্বার অবরুদ্ধ ; "হয়তঃ বিন্দু জয়ার কক্ষে আছে" ভাবিয়া ব্রাহ্মণ জয়ার কুটীরদ্বারে গেলেন ; কুটীরদ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত, ক্ষীণ দীপালোকে অঙ্গন হইতে গোসাঞী অনুজ্জ্বল কক্ষের মলিনাবস্থা দেখিতে পাইলেন। জয়ার গণ্ডবাহী অশ্রুধারা নীরবে মনোবেদনা বলিয়া দিতেছিল ; আর চঞ্চলা—নিশার শিশিরসিক্ত গোলাপের ন্যায় আত্মহারা,

যেন দেহ ছাড়া! কিন্তু বিন্দু সেখানে নাই। এতদ্দৃষ্টে গোসাঞী বিস্মিত ও চিন্তাকুল হইলেন; ধীরপদে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কাতরস্বরে ডাকিলেন, 'জয়ে'! জয়া তেমনি কাতরকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"কি আদেশ?"

গোসাঞী—বিন্দুর সংবাদ কি? তাহার কুটীর অবরুদ্ধ—সম্ভবতঃ উদয়গিরি হইতে আর ফিরে নাই!

জয়া—আমি আর খোঁজ করি নাই; মিছিরজী কোথায়?

গোসাঞী—ধর্ম্মবীরের ন্যায় সাধন মগ্ন। জয়ে, তুমি যাহার জন্য এত কাতর হইতেছ, কই তাহার মুখে বিষাদ বা অশান্তির চিহ্ন মাত্র নাই!

জয়া—কাতর হইতেছি মন্দভাগিনী বিন্দুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। উহার দুষ্কৃতির কি শেষ নাই? আশা করিয়াছিলাম, এ মিলন ফলে কল্যাণীর ইচ্ছায় উভয়ে একপ্রাণে মায়ের সেবা করিতে পারিবে। হায়, সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

গোসাঞী—কল্যাণীর কি ইচ্ছা কে জানে? এ মিলন হয়তঃ পারমার্থিক—ইহকালের জন্য নহে, পরকালের জন্য।

জয়া—মিছিরজীও বলিয়াছেন—"এ মিলন ইহকালের জন্য নহে, পরকালের জন্য।"

গোসাঞী—অসম্ভব নহে; বিন্দুর আত্মত্যাগ ও সাধনশক্তি অসামান্যা। তাহার ফল অলৌকিক হইবে আশ্চর্য্য কি? আত্মসুখ কামনা বিন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ।

জয়া—ঠাকুর, সে কথা জানিতে বাকী নাই। চঞ্চলা বিরহে বিন্দু যেমন আত্মহারা হইয়াছিল, তাহার উদ্ধার সাধনে

তেমনি অভাগিনীর হৃদয় প্রীতিময় হইয়াছিল। সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা—মহামায়ার মায়া খেলা! ইহার পরিণাম কি কে বলিতে পারে?

সহসা শূন্যভেদ করিয়া আকাশবাণী হইল—"**শব-সাধন**" অনুশীলার সাধনশালায় মৃত-পতিপদ-স্কন্ধে যোগচর্যায় আত্ম-বিসর্জ্জন; আর সে সাধনবলে শিবলোকে "**অক্ষয়-মিলন**"।

সে দৈববাণী শুনিয়া গোসাঞী বিস্মিত ও জয়া মর্ম্মাহত হইলেন। স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় তারা বলিলেন, "সম্ভবতঃ মা অনুশীলায় গিয়াছেন, আমি তাঁহাকে পার্ব্বত্যপথে সেদিকে যাইতে দেখিয়াছি।" তারার কথা শেষ হইতে না হইতে ভৈরবী আসিয়া জয়ার কক্ষে পৌঁছিলেন। সহসা বিন্দুর আগমনে সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন; ক্ষণকাল সকলে নীরব—নিস্তব্ধ! সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। সে ক্ষণিক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভৈরবী কহিলেন, "ঠাকুর, অনেকদিন আপনার মুখে গান শুনি নাই; বড় সাধ একবার শুনি—

সেই মধুর গান—

"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা।"

বিন্দুর তৎকালীন প্রশান্তমূর্ত্তি-অপূর্ব্ব নয়নজ্যোতিঃ দৃষ্টে জয়া ভাবিলেন, বিন্দু আজ যোগবলে বলী, এতাদৃশ মহাপ্রলয়েও শ্রীমধুসূদনে আত্মসমর্পণ করিয়া অবিষণ্ণ—অসংসারীর ন্যায় শোকতাপশূন্য ও নির্লিপ্ত!

বিন্দুর সে যোগমাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া গোসাঞী অনুচ্চ পঞ্চমে গাহিলেন;—

কে আর বিপদে রাখিবে গো মা,
বিনে সে অভয়া অভয়দায়িনী শ্যামা। ১
পতিতপাবনী জানি এসেছি গো দ্বারে,
পাপের প্রবাহে ভাসি অকূল পাথারে ;
জীর্ণ দেহতরী বাঁধ গো শঙ্করী,
কল্যাণের কুলে অকুল কামনা। ২
করাল কৃপাণাঘাতে হৃদয় ভেদিয়া,
মলিন মরম হ'তে লও মা কাড়িয়া,
পুঞ্জীকৃত পাপ, মর্ম্মদাহী তাপ,
অস্থিমজ্জাগত বিলাস বাসনা। ৩
পুনঃ অই বিভীষিকা বিকট গর্জ্জন,
জীবতরী বুঝি আজ হয় বিসর্জ্জন,
কাঁপি থর থর, ধর মাগো ধর
বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা। ৪

জয়া ও বিন্দু সে গানে যোগ দিলেন। ক্রমে সঙ্গীত-লহরী পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিয়া আবার পঞ্চমে নামিল, নামিতে নামিতে সে গান থামিয়া গেল। সে গানে বিন্দুর প্রাণে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল ; বিন্দুর রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ—আজ দৈব বলে বলী, মলিন মুখ যোগ প্রভায় মণ্ডিত, নয়নের স্থির কোমল দৃষ্টি সাধনময় ! বিন্দু আজ অসার সংসার মায়াকে তৃণবৎ নখাগ্রে ছিন্ন করিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইতে চলিয়াছেন। বিন্দুর ভৈরবী বেশ, যে বেশে উদয়গিরিতে বন্দী স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন, সেই ভৈরবমোহিনী নবীনা

যোগিনী বেশ যেন অঙ্গুলী সঙ্কেতে বলিয়া দিতেছিল, "বিন্দু মানবী নহে শাপভ্রষ্টা দেবী; কল্যাণ দেবীর কর্ম্মক্ষেত্রে, অনুশীলায় যোগ সাধন; আর সে সাধন বলে অলকাধামে পতিপদে অক্ষয় মিলন"।

গান শেষ হইলে বিন্দু পুনরপি কহিলেন, ঠাকুর ঠিক বলিয়াছেন, "বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা"। পাত্রস্থা হইলেই মেয়েকে মায়ের কোল ছাড়িতে হয়: কল্যাণীর ইচ্ছায় স্বামী পাইয়াছি; পতীই পত্নীর গতি; সে পতিপদ ছাড়িয়া মায়ের ঘরে থাকিয়া মায়ের সেবায়ও মেয়ের অধিকার নাই; তাই "বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা"।

বিন্দুর মুখে গভীর গবেষণাপূর্ণ আধ্যাত্মিক কথা শুনিয়া গোসাঞী বুঝিলেন, সাধন বৃক্ষের জ্ঞানকাণ্ড বিকশিত হইয়াছে, ফলরূপ মুক্তিলাভের আর অধিক বিলম্ব নাই। সরলপ্রাণা মঙ্গলা বিন্দুর কথার গুঢ় মর্ম্ম ততটা বুঝিতে পারিলেন না। সেটী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাবে নহে, ভালবাসার ধর্ম্মে। তাই মঙ্গলা মৃদু মন্দ স্বরে কহিলেন, "প্রথমে তারাকে মায়ের কোল ছাড়াইয়া পতির ঘর করিতে দেও, পরে তোমার যে ব্যবস্থা হয়, করা যাবে"।

"সে ব্যবস্থা ও তোমারই হাতে" বলিয়া বিন্দু গোসাঞীর দিকে চাহিলেন। তদর্থ বুঝিয়া গোসাঞী কহিলেন, "সমস্তই ঠিক; লালজী ও যথা সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হইবেন। পূজান্তে মায়ের নির্ম্মাল্যে বর কন্যাকে দীক্ষিত করিতে হইবে এ সকল কার্য্যের ভার ও মঙ্গলার উপর রহিল; রাত্রিও অবসান প্রায়" বলিয়া গোসাঞী স্বীয় কুটীরে চলিয়া গেলেন।

গোসাঞী চলিয়া গেলে জয়ার কক্ষ নীরব, সকলে নির্ব্বাক। পিতার মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া তারা বুঝিলেন, লালজীর সঙ্গেই তাহার বিবাহ স্থির; বন বিহঙ্গিনী এতদিনে পিঞ্জরাবদ্ধ হইলেন। ষোড়শী তারা এ পর্য্যন্ত বিবাহ দেখেন নাই বিবাহ কি জানেন না। মঙ্গলা মাসী বলিয়াছেন, "সংসার জীবের কর্ম্মক্ষেত্র; সে ক্ষেত্রে বিবাহ ধর্ম্ম সূত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর একত্র সমন্বয়। পুরুষ দেহ, রমণী ছায়া, স্বামী জ্ঞান, স্ত্রী চিত্তশুদ্ধি বা হৃদয়ের শান্তি। দেহের সঙ্গে ছায়া আর জ্ঞানের সঙ্গে শান্তির সমাবেশে উভয়ের যখন অভেদাত্মা হয়, তখনই ধর্ম্মের জয়। তখনই বিবাহরূপ মহাযজ্ঞ সার্থক! লালজী বীরপুরুষ; তারা সরল প্রকৃতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা; বীর গৃহিনী হইয়া সংসার সংগ্রামে স্বামীর অনুগামিনী হওয়ার উপযুক্ত কিনা, অজ্ঞাতে সে চিন্তা আসিয়া তারাকে আকুল করিল। তারার সরল প্রাণে সংসার চিন্তা এই প্রথম।

দ্বাদশ কল্প।

আজ ত্রয়োদশীর সুপ্রভাত ; অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই মন্দিরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল ; দামামার সঙ্গে বৈদিক কণ্ঠে মাঙ্গলিক স্তোত্র পাঠ আরম্ভ হইল। শঙ্খ ঘণ্টা রবে মন্দির বিলোড়িত হইল।

"কুরু মা কল্যাণী—কল্যাণ জীবে" বলিয়া ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে জয়া গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন ; গৃহদ্বারে কয়েকটী স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, অমনি তাহারা গাহিল :—

"জাগ সখি—জাগ তারা হল নিশা অবসান,
পাখী করে কলরব, দয়েল ধরিছে তান।
পূর্ব্বাসার দ্বার খুলি, অরুণ কিরণ গুলি,
উল্লাসে উষার শিরে করিছে কীরিট দান।
শুভক্ষণ যায় বয়ে, কেন র'লে ঘুমাইয়ে,
উঠ শিবদুর্গা ব'লে শিবময় এ কল্যাণ"।

সে গান শুনিয়া জয়া বিস্মিতা হইলেন এবং কক্ষের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কে—কোথা হইতে আসিতেছ ?"

উঃ—তারার বাল্যসখী, নওয়াগড় হইতে আসিতেছি।

প্রঃ—এ কি গান ?

উঃ—বন্দিনীর গান—উষা মঙ্গল ; আজ তারার শুভ-বিবাহ ; সুপ্রভাতে সখীর নিদ্রাভঙ্গ করাই এ গানের উদ্দেশ্য।

প্রঃ—তারার বিবাহের সংবাদ তোমাদিগকে কে দিল ?

উঃ—বোধ হয় কোষাধ্যক্ষ—মিছিরজী; এসংবাদ কাহারও জানিতে বাকী নাই। নারদের নিমন্ত্রণের ন্যায় সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রঃ—সে ভালই, উপস্থিত তোমাদের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—উষা মঙ্গল গাইয়া সখীর নিদ্রাভঙ্গ করা। জয়া হাসিয়া কহিলেন, "তবে গাও--তারার ঘুম তত সহজে ভাঙ্গে না।" প্রত্যুতঃ তারা তখনও মহাসুখে ঘুমাইতেছিল। বৈতালিকগণ আবার গাইল—"জাগ সখি জাগ তারা, হল নিশা অবসান"—ইত্যাদি সে গান ললিত পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল, কিন্তু তারার ঘুম ভাঙ্গিল না। জয়া আবার হাসিয়া কহিলেন, এখনও তারা ঘুমাইতেছে।

সে কথা শুনিয়া বন্দিনীগণ বিস্মিতা হইয়া কহিল "প্রাতরুত্থান তারার চিরাভ্যস্ত—এই অল্প সময়েই কি তাহার এত পরিবর্ত্তন"?

জয়া—এ পরিবর্ত্তন কালধর্ম্মে।

অতঃপর সাধের কাকাতুয়াকে সম্বোধন করিয়া জয়া কহিলেন:—

'জাগ আমার কাকাতুয়ে,—আজি হবে তারার বিয়ে;
মন্দিরে লেগেছে ধুম, ভাঙ্গেনাকো তারার ঘুম;
হরি বলে গাও গান, নেচে উঠবে তারার প্রাণ'।

কাকাতুয়া অমনি উত্তর দিল:—

দোল দোলা দোল, দাও হরি কোল,
হয়না যেন ভুল—হরি হরি ব'ল।

কাকাতুয়ার মুখে মধুর হরিনাম শুনিয়া তারার সুখ নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; অমনি তারা বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে গাইলেন—

"বল সে কেমন যে হৃদয়ের ধন", ইত্যাদি।

তারার গান শেষ হইলে বন্দিনীগণ গাইল—

"জাগ সখি জাগ তারা হল নিশা অবসান,
পাখী করে কলরব, দয়েল ধরিছে তান।" ইত্যাদি—

তারা তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। বন্দিনীগণের গান শুনিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিলেন, মাসি—"এ আবার কিসের গান" ?

জয়া—মাঙ্গলিক গান ; বৈতালিককণ্ঠে ঊষা মঙ্গল।

তারা—বন্দিনীগণ কোথা হইতে আসিল ?

জয়া—উহারা নাকি তোমার বাল্য সখী ; গড় স্বামিনীদের নিদেশক্রমে নওয়াগড় হইতে আসিয়াছে। কিন্তু উহাদের বিনোদ গানেও তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। ছি বিবাহের দিনে কি এত ঘুমাইতে হয়।

সে ভৎর্সনায় তারা লজ্জিত হইয়া সসব্যস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া কক্ষের বাহির হইলেন, এবং অহ্লাদে সঙ্গীগণকে কোল দিলেন। সখীগণ মহোল্লাসে তারাকে বেষ্টন করিয়া গাইল ঃ—

"আহা কি আনন্দ আজি আনন্দময়ীর ধামে,
সোণার প্রতিমা রাধা শোভিবে শ্যামের বামে ;
আও সখি হেলে দুলে, খেলি সবে ফুলে ফুলে,
বীরবিমোহিনী বেশে সাজায়ে দি ফুলদামে।

ছিলে সখি দয়াবতী, দেব ধর্ম্মে ভক্তি মতি,
লভিলে সে ফলে আজি নয়নাভিরাম শ্যামে।
বীরের গৃহিণী হবে, বীর বধূ সবে কবে,
কল্যাণীর ইচ্ছা পূর্ণ হও সুখী পরিণামে।"

গান গাহিতে গাহিতে তারাকে সঙ্গে করিয়া সখীগণ মন্দিরের উপবনে চলিয়া গেল।

এদিকে মন্দিরে মহাধুম; ষোড়শোপচারে কল্যাণীর মহাপূজার আয়োজন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দোকানী দোকান খুলিল, হালুইকার খাজা গজার স্তুপ লাগাইল; প্রভাতিপবন বার্ত্তাবহ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিল, "আজ কল্যাণীর মহাপূজা, সেবকগণের প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা—উপলক্ষ—তারার বিবাহ।" আজ সর্ব্বত্র উৎসাহ, পরম আনন্দ। পুলকিত-চিত্তে দলে দলে ভক্তগণ সুদূর হইতে আসিতে লাগিল। অত্যল্প সময় মধ্যে বিশাল মন্দিরাঙ্গন লোকারণ্য হইল। ভক্তগণ মায়ের চরণামৃত লাভে ব্যস্ত, বুভুক্ষু ভিখারীগণ উদর জ্বালায় অধৈর্য্য; কোন কোন রঙ্গিনীর দল বিবাহের রঙ্গ দেখিতে উৎকণ্ঠ।

মায়ের মহাপূজায় নিমন্ত্রণ পাইয়া বৃদ্ধ বাবাজী অনুশীলার ভক্তমণ্ডলী সহ মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। স্থান মাহাত্ম্যে গুরু লঘু ভেদ জ্ঞান নাই, যে যেখানে তিলার্দ্ধ স্থান পাইল, সেই সেখানে বসিয়া গেল। বাবাজী শতাধিক বর্ষীয় বৃদ্ধ; বুধিয়া ও মতিয়া নাম্নী দুটী বৃদ্ধা পরিচারিকা এক পার্শ্বে বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে সে বিরাট ব্যাপার দেখিতেছে। বুধিয়া

কহিল বাবাজি—শুনিতেছি তারার বিবাহ—কিন্তু তারা কে ?
আর এত ধুমই বা কেন ?

বাবাজী—বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। এক দিকে মায়ের মহাপূজা অন্যদিকে কাঙালীভোজনের জন্য খাজাগজা ; একদিকে অনন্ত ভক্তগণের একত্র মিলন অন্যদিকে বিবাহের আয়োজন। মায়ের মন্দিরে নব উপকরণে এই এক নূতন সাধন !

মতিয়া—কেহ কেহ বলিতেছে "তারা ঠগীকরে অপহৃতা ব্রাহ্মণ-কন্যা, সে মেয়েটার জন্যই ঠগীর সর্ব্বনাশ !"

বুধিয়া—সেদিন সে মেয়েটাকে দেখিস্ নি ? ভৈরবীগণের মধ্যে মোটা সোটা বড় সুন্দরী ফুলকুমারী !

মতিয়া—হা হা সেই তারা গোসাঞীর ঝি, আজ তারই বিবাহ !

বুধিয়া—সে আবার গোসাঞীর ঝি হ'তে গেল কেন ? পীণ্ডারীর পোষা ; এ মেয়ে কে বিবাহ করিবে !

বাবাজী—ফৌজদলের সঙ্গে কল্যাণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জাগিয়াছে। সম্ভবতঃ সেই দলস্থ কাহারও সঙ্গেই বিবাহ হইবে। ভৈরবীর সাক্ষাৎ পাইলে সমস্ত জানা যাইবে।

গোসাঞী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এসকল কথা শুনিতেছিলেন ; বাবাজীর আগমন জানিয়া ভৈরবীও সেই দিকে ছুটিয়া আসিলেন। গোসাঞী কহিলেন, অই যে ভৈরবী এদিকেই আসিতেছেন। গোসাঞীর আজ বেশ পরিবর্ত্তন ; পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলে নামাবলী, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, কণ্ঠে আজানুলম্বিত যজ্ঞোপবীত। এ বেশে সহসা গোসাঞীকে চেনা ভার।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাবাজী চমকিয়া উঠিলেন ; উৎফুল্ললোচনে বক্তার মুখপানে তাকাইয়া কি ভাবিলেন, ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময় সহকারে কহিলেন—"কে পরমানন্দ—আজ এ বেশ কেন ?"

গোসাঞী—কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে।

বাবাজী—ঠগীকরে অপহৃতা করোঞ্জার ব্রাহ্মণকন্যা কি তোমারই আত্মজা ? স্বামীজী প্রদত্ত ইষ্টকবচ বোধ হয় বাহুভ্রষ্ট হইয়াছিল !

গোসাঞী—প্রভো, অন্তর্যামীর ন্যায় অন্যের অজ্ঞাত করোঞ্জা-কাহিনী অবগতির সূত্র অবশ্যই অতি গুহ্য ও অনন্যজ্ঞেয় !

বাবাজী—পরমানন্দ--সে সূত্র গুঢ় হইলেও তোমার পক্ষে অজ্ঞেয় নহে। স্বামীজীর মুখেই সে কথা শুনিয়াছি। তাঁহাকে এ বিবাহের বিষয় বলা হইয়াছে ?

গোসাঞী—এ কার্য্য তাঁহার মতে হইয়াছে। সেনাপতি সুব্রাহ্মণকুমার, কুলগত কোন বাঁধা নাই।

বাবাজী—দুঃখের বিষয় স্বামীজী এ বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না। তিনি কে জান ?

গোসাঞী—সে পরিচয় আজও পাই নাই, পাইবার অধিকারও নাই।

বাবাজী—সম্পূর্ণ অধিকারী—তিনিই করোঞ্জার রামানন্দ পাঠক তোমার পিতা !

"পিতা ধর্ম্ম পিতা কর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা ॥"

উপস্থিত তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যোগ তপস্যা সকলই পিতার প্রীতি সাধনার্থ। তিনি সিদ্ধপুরুষ মহাযোগী।

বাবাজীর কথা শেষ হইতে না হইতে ভৈরবী আসিয়া অভিবাদন করিলেন। বাবাজীও যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া আজ কল্যাণে আসিলাম ; বিদায় আদায়ের ব্যবস্থা কিছু আছে কি ?

ভৈরবী গোসাঞীকে দেখাইয়া বিনীত বচনে কহিলেন, "স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা উপস্থিত, সম্বল ভবদীয় আশীর্ব্বাদ আর শ্রীচরণের পদধূলি!"

বাবাজী পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎসে, তোমার জ্ঞান ও ভক্তি অনন্য সাধারণ! তোমার যোগসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী! কল্যাণে আজ অভিনব যজ্ঞ—এ যজ্ঞে পুরোহিতের কার্য্য আমিই করিব।

একথা শুনিয়া গোসাঞীর আনন্দাশ্রু বহিল ; পরম প্রীতিভরে গদগদস্বরে তিনি কহিলেন, প্রভো মাতৃবিয়োগের পর এ ভৈরবীই কন্যাটীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

বাবাজী—ইহার স্বামীর সন্ধান পেয়েছ কি ?

গোসাঞী—কল্যাণীর ইচ্ছায় তাহাও হইয়াছে। নওয়াগড়ের কোষাধ্যক্ষ শান্তশীল ইহার স্বামী।

এবার বাবাজী হাসিয়া কহিলেন, "কল্যাণ করোঙ্কার প্রভাসক্ষেত্র। পতি পত্নীর অপূর্ব্ব মিলন, যোগাশ্রমে পিতা পুত্রের সন্দর্শন, চৌরকরে অপহৃতা কন্যার উদ্ধার, আবার সে কন্যাকে সৎপাত্রে দান এ সমস্তই যোগমায়া! ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।

বাবাজীও গোসাঞীর মধ্যে এরূপ আলাপ চলিতেছিল, সহসা মন্দিরের বাহিরে উচ্চ কোলাহল উঠিল, ক্রমে সে কোলাহল ভিতরেও পৌঁছিল। জনৈক পূজারী আসিয়া সংবাদ দিলেন, "পাতা পড়েছে সকলে আসুন"; গোসাঞী বুঝিলেন সে কোলাহলের অর্থ কি? বাবাজীর আদেশক্রমে অনুশীলার ভক্তগণ পাতার খোঁজে গেল। কৌতূহল পরবশ হইয়া বাবাজী কহিলেন, "চল ভোজন ব্যাপার দেখিগে" গোসাঞী বাবাজীকে নিয়া ভোজনক্ষেত্রে চলিলেন; ভৈরবীও তাহাদের অনুগমন করিলেন।

মন্দির প্রাঙ্গণে পুরুষ সম্প্রদায় আর যোগিনী মহালে স্ত্রীলোকগণ বসিয়া গিয়াছেন। আর মন্দিরের বাহিরে কাঙালী-ভোজন চলিতেছে। মিছিরজী স্বহস্তে কাঙালীগণকে পরি-বেশন করিতেছেন; আর জয়া স্ত্রীলোকগণের পরিবেশনের ভার লইয়াছেন। বাবাজীর ইচ্ছানুসারে গোসাঞী মিছিরজীর ও ভৈরবী যথাসাধ্য জয়ার সাহায্যে নিযুক্ত হইলেন। আর বাবাজী সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। প্রচুর পরিমাণে চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ উপাদেয় সামগ্রী লইয়া কাঙালীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। নিমন্ত্রিত ভক্তগণ পরিতোষ সহকারে উদর পূর্ণ করিয়া সহস্রকণ্ঠে ধ্বনি করিল ঃ—

"কুরু মা কল্যাণী কল্যাণ জীবে"

সে ধ্বনি শুনিয়া কাঙালীগণ সমস্বরে উচ্চরবে বলিয়া উঠিল ঃ—

"সুখী হও জায়াপতি দীর্ঘজীবি হয়ে"

প্রকৃতপক্ষে এতাদৃশ বিরাট ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে কল্যাণে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই।

যথাসময়ে ভোজন ব্যাপার শেষ হইল, ক্রমে জনতা কমিতে লাগিল। সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া মন্দিরের গোধনগুলি আলয়ে ফিরিল। গোধূলি লগ্ন উপস্থিত জানিয়া জয়া উচ্চস্বরে শাঁক বাজাইলেন। গভীর শব্দে দামামা বাজিয়া উঠিল; সময় বুঝিয়া বাবাজী কহিলেন, "পরমানন্দ, প্রস্তুত হও, লগ্ন উপস্থিত।"

গোসাঞী—ভবদীয় পরিচয় ও অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত যাইতে মন সরিতেছে না।

বাবাজী—আমি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিতেছি তুমি কন্যাদান কর। আর আত্মপরিচয় দিতে পারিতেছি না; পুনঃ সাক্ষাতে জানিতে পারিবে।

গোসাঞী—পুনঃ সাক্ষাৎ কোথায় পাইব?

উঃ—অনুশীলায়!

অনন্তর বাবাজীকে বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিয়া গোসাঞী মূল কার্য্যানুষ্ঠানে চলিয়া গেলেন।

যথা সময়ে বর কন্যা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিলেন। কার্য্যারম্ভ সূচক ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বাবাজী আর দূরে থাকিতে পারিলেন না। বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "পরমানন্দ, সংসার বিরাগীর পক্ষে এহেন

সৌভাগ্য প্রায় ঘটে না। যোগ-ক্ষেত্রে বসিয়া যোগ্যপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতেছে, আমিও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, এ ক্ষেত্রে পৌরহিত্যের সম্পূর্ণ অধিকারী" বলিয়া প্রথমে কল্যাণীর স্তোত্রে পরে বিবাহের শাস্ত্রোচিত মন্ত্র পাঠে সকলকে স্তম্ভিত করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ততোধিক আচার্য্যোচিত কার্য্যকুশল দেখিয়া উপস্থিত কল্যাণসম্প্রদায় ও মন্দিরস্বামী বিস্মিত হইলেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে বাবাজীর নিদেশক্রমে গোসাঞী বরকন্যার করযুগল মায়ের প্রসাদী ফুলমালায় বাঁধিয়া দিলেন। মঙ্গলা ও বিন্দু ঘন ঘন শাঁক বাজাইলেন; উপস্থিত কল্যাণসম্প্রদায় মায়ের নির্ম্মাল্যে নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; দম্পতী নতশিরে সে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলে বাবাজী বলিয়া উঠিলেন শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! সে স্বস্তিবাক্যে সকলে ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন; ক্ষণকালের জন্য সে বিবাহমণ্ডপ নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল।

সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাবাজী আর কহিলেন, "লালজি, আজ হইতে চঞ্চলা তোমার হইল, চঞ্চলাকে ভালবাসিও কিন্তু ভুলিও না" বলিয়া গমনোদ্যত হইলে গোসাঞী সর্ব্বাগ্রে পরে জয়া, ভৈরবী ও নবদম্পতি অভিবাদন করিলে। বাবাজী জয়া ও ভৈরবীর মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন—শান্তি! শান্তি!! সে উক্তিতে শান্তিপ্রার্থয়িত্রী জয়া ও ভৈরবীর প্রাণে যেন অজ্ঞাতে শান্তিধারা তিলেকের জন্য উছলিয়া উঠিল। বাবাজী অনুশীলায় চলিয়া গেলেন।

মন্দিরস্বামীও গোসাঞীর ইচ্ছানুসারে মায়ের মন্দির

প্রদক্ষিণ করিয়া নবদম্পতিসহ ভৈরবী আপন কুটীরে চলিলেন। ভকৎমল এ পর্য্যন্ত লালজীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সকল দেখিতেছিল। ভকৎমলের সঙ্গে পূর্ব্বেই নওয়াগড়ে পাঠকগণের পরিচয় হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভকৎমল দরিদ্র ব্রাহ্মণ ইতিপূর্ব্বেও বিবাহ দেখিয়াছে একবার নিজেও বর সাজিয়াছে কিন্তু এ প্রণালীর বিবাহ দেখে নাই। তারার অমানুষিক লীলা দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিশ্বাস হইয়াছিল সর্দ্দার কন্যা মানবীবেশে দানবী; সেই ভুঁতুড়ে মেয়েটার সঙ্গে ফৌজাধ্যক্ষের বীরপ্রবরের বিবাহটা নিতান্ত অসঙ্গত ভাবিয়া মনে মনে একটুকু রাগও হইয়াছিল। দম্পতি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া ভকৎমল হতাশ হইল ও কাতর বচনে কহিল ঃ—লালজি, এখন বুঝিতে পারিতেছি সে নিশীথ রাত্রিতে কেন যোগিনীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। আপনার সাধ পূর্ণ হইল এখন ভকৎমলের উপর কি আদেশ?"

লালজী বুঝিতে পারিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বীয় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাতর হইতেছে। ব্রাহ্মণকে শান্ত্বনাকল্পে সুমিষ্ট বচনে লালজী কহিলেন, "কেন ভকৎমল, আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই, তুমি যেমন ছিলে, তেমনই থাকিবে। অধিকন্তু এ ব্রাহ্মণীও তোমাকে আদর যত্ন করিবেন। এ তোমার সর্দ্দারজীর পালিতাকন্যা মাত্র।" দানবীর অনুগমন করিতে ভকৎমলের ইচ্ছা হইতেছে না; কিন্তু তারার তদানীন্তন সুন্দর মুখখানি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে মনের রাগ কমিল বটে কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গী হইতে সাহস হইল

না। তাই ভকৎমল বিরস বদনে কাতর বচনে কহিল, "প্রভো, সংসারের মায়া কাটাইয়াছি কিন্তু দানবীর ছায়ায় থাকিতে ভরসা হয় না।" লালজী দেখিলেন, ব্রাহ্মণ ভয়ে আড়ষ্ট হইতেছে; কথা বাড়াইলে ব্রাহ্মণের আশঙ্কা বাড়িবে বই কমিবে না। সুতরাং প্রকারান্তরে প্রিয় বচনে কহিলেন—"তোমার আহার হয়েছে ?"

উঃ—কিছু না তাহার কোন বন্দোবস্তও দেখিতেছি না।

জয়া নিকটে দাঁড়াইয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন, সুবিধা পাইয়া কহিলেন, "বরপক্ষের ভোজনের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে।"

লালজী—তবে তুমি আহারান্তে দফাদারে সঙ্গে উদয়গিরিতে গিয়া আমার তৈজসপত্র রক্ষা কর; আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।

অতঃপর নবদম্পতি কুটীরে চলিয়া গেলেন। জয়া ভকৎমলের ভোজনের ব্যবস্থায় গোসাঞীর খোঁজে গেলেন। উদয়গিরি হইতে যাঁহারা লালজীর সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ভোজনের বন্দোবস্তের ভার গোসাঞীর উপর দিয়া জয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

এদিকে অতি দীনবেশে রমা ভৈরবীর কুটীর দ্বারে উপস্থিত। রমার বদন বিষাদে মলিন, চিন্তায় আকুল; সাহস করিয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। সহসা চঞ্চলার দৃষ্টি রমার উপর পড়িল; সত্রস্তে মাতৃকল্পা রমাকে আদর করিয়া বসাইলেন এবং বিন্দুকে রমার পরিচয়

দিলেন। বিন্দু হর্ষোৎফুল্ল নয়নে মধুর বচনে রমাকে আদর করিলেন; রমাকে দেখিয়া বহুকাল পরে বিন্দুর চক্ষে জল আসিল, তাহার হৃদয়ে বিষাদের লুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ইন্দুমণি দেখিতে ঠিক রমার মত ছিল; রমাকে দেখিয়া বিন্দু ভাবিলেন, "দিদি যেন ফিরিয়া আসিতেছেন।" বিন্দুর চক্ষে জল দেখিয়া রমা কহিলেন—"সে কি আজ আনন্দের দিনে কি চোখের জল ফেল্‌তে আছে? বর কন্যার যে অমঙ্গল হবে।"

সে অমঙ্গলের কথা শুনিয়া বিন্দু অতি কষ্টে অশ্রুজল সম্বরণ করিলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হইল। অবশেষে রমা রত্নাভরণ পূর্ণ গজদন্ত বিনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র বাক্স তারাকে ও একটী হীরকাঙ্গুরীয় দ্বারা জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নওয়াগড়ে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ কল্প।

বিবাহান্তে অষ্টাহ কাটিয়া গেল; বিচারে যাহাদের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, তাহার মঞ্জুরী আসিতে কালবিলম্ব হওয়াতে উদয়গিরি হইতে ইস্তাহার হইল, আগামী ত্রয়োদশী দিনে পুনঃ দরবার বসিবে এবং উক্ত দিনে শান্তশীলকে দরবারে উপস্থিত করার জন্য পৃথক্‌ভাবে পরোয়ানা প্রেরিত হইল।

এ দরবারের উদ্দেশ্য দণ্ডের হুকুম তামিল মাত্র। ঐ দিনেই যাহাদের জীবনদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহাদিগকে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ মিছিরজীর প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করেন নাই—সুতরাং তাঁহার জীবনদণ্ড অনিবার্য্য।

এ সংবাদ লালজী ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও বলেন নাই। "ব্রাহ্মণের ফাঁসী" এ দারুণ চিন্তা ও মনোকষ্ট লালজীর প্রাণে অসহ্য হইল। লালজীর কষ্টক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখিয়া শান্তশীলের ভবিষ্যৎ বুঝিতে গোসা-ঞীর বাকী রহিল না। মঙ্গলা ও চঞ্চলার সরল বিশ্বাস, কর্ত্তৃ-পক্ষ মেজর সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না। সে আশায় বুক বাঁধিয়া মঙ্গলা নিয়ত বিন্দুর ভবিষ্যৎ সুখ কামনা করিতেছেন। লালজী অতি সাবধানে ভৈরবী, মঙ্গলা ও চঞ্চলার নিকট মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলিতেছেন। তাই সরকারী কার্য্যের ভাণ করিয়া লালজী অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকেন; কখন বা চঞ্চলার সহিত ক্ষিপ্রার তীরে তীরে পার্ব্বত্য পথে পরিভ্রমণ করিয়া তরঙ্গ লীলা অথবা উচ্চ শৈলশৃঙ্গে আরো-

হণ পূর্ব্বক সূর্য্যাস্তের শোভা দর্শন করেন। আর যে প্রস্তরখণ্ডে উপবিষ্ট লালজীকে তারা যোগিনীবেশে দেখা দিয়াছিলেন, সেই স্থানটী উভয়ের চক্ষে বড় পবিত্র ও প্রীতিপ্রদ। সেখানে দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে তারার বড় সাধ। লালজী আদর করিয়া প্রায়ই তারাকে সেখানে লইয়া যাইতেন।

আর বিন্দু! তিনি বিবেকবাণীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া গোপনে গোপনে "শব-সাধনের" ভিত্তি স্থাপনে ব্যতিব্যস্ত। তিনি ধ্রুব জানিয়াছেন, স্বামীর জীবন দণ্ড অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এ ঐহিক মিলনের সুখচিন্তা তাঁহার যোগময় হৃদয়ে স্থান পাইল না। অথবা পতির পরিণাম ভাবিয়া অণুমাত্রও কাতর হইলেন না। বাবাজী বলিয়াছেন, অনুশীলার 'সাধনশালা' সাধনের উপযুক্ত স্থান; তাই বিন্দু কৃতসঙ্কল্প। "বিবেকবাণী" মানিব, অনুশীলায় "পতি শব" সাধন করিয়া এ ছার জীবন পাত করিব; বাবাজীর দীক্ষাবলে ও যোগ কৌশলে শব-সাধন অবশ্য সিদ্ধ হবে।" তাই অনুশীলার সঙ্গে বিন্দুর ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বাবাজীর উপদেশ মত সাধনশালায় বিন্দুর যোগ সাধন আরম্ভ হইল। বাবাজী ভৈরবীর সাধনশক্তি ও যোগাসক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং ধ্রুব বুঝিলেন, এই ভৈরবী হইতেই অনুশীলার লুপ্ত মাহাত্ম্য পুনঃ জাগ্রত হইবে।

অদ্য দ্বাদশী; বিন্দু সাধ করিয়া জয়ার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মায়ের পূজায় যোগ দিলেন। বিন্দু ভাবিলেন, "কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক এই শেষ—মায়ের সাধনাও শেষ!" সুতরাং বিন্দু আজ ভক্তিভরে মায়ের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া মনে মনে বর

মাগিলেন, "মাতঃ তোমারই ইচ্ছায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আবার তোমারই ইচ্ছায় যেন সাধনের সাধ পূর্ণ হয়।" জয়া বিন্দুর মনের ভাব ঘূণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না। পূজান্তে মায়ের চরণামৃত লইয়া জয়া ও বিন্দু আপন আপন কুটীরে ফিরিলেন !

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বিন্দু, লালজী ও চঞ্চলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মনে মনে বিদায় হইলেন। অনন্তর স্বামীর নিকট বিদায় লইতে চলিলেন। কুটীর সম্মুখস্থ অশোক তরুমূলে উপবিষ্ট পতির চরণ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "স্বামীই স্ত্রীর গুরু ও উপাস্যদেবতা; এ সম্পর্ক কেবল ইহকালের জন্য নহে, পরকালেও পতির চরণই স্ত্রীর সম্বল। আপনি বলিয়াছেন, 'আমাদের এ মিলন ইহকালের জন্য নহে, পরকালের জন্য।' আমার বিশ্বাস সেও সাধন সাপেক্ষ। আর সে সাধনও পতির চরণ। কল্যাণীর ইচ্ছায় পতি লাভ হইয়াছে কিন্তু প্রাণ ভরিয়া পতির চরণ পূজা করিতে পারি নাই। জীবনের একমাত্র সাধ পতির চরণ পূজা, অভাগিনী অনুশীলায় পতির চরণ পূজা করিয়া সহগমন করিবে" বলিয়া পতির নিকট বিদায় চাহিলেন। পতিও মরিতে প্রস্তুত ; পতি ও পত্নী উভয়েই সংসারের মায়া কাটাইয়াছেন, একে অন্যের মন বুঝিয়াছেন ; আজ দুটী হৃদয় এক, একই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ ; উভয়েই পরলোকে অক্ষয়-মিলনের জন্য সাধন পথে অগ্রসর। তাই আজ একের বিচ্ছেদে অন্যে কাতর নহেন ; তাই স্ত্রীর মুখে বিদায়ের কথা শুনিয়া স্বামীর প্রাণ কাঁদিল না—মনে কষ্ট হইল না ; পরন্তু

অকাতরে সরল ও মধুর বচনে কহিলেন, "শত অপরাধসত্ত্বেও স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিবার অধিকার স্বামীর আছে। আজ তোমার এ সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি, নয়নকোণে অলৌকিক যোগজ্যোতিঃ,—উজ্জ্বল স্থিরদৃষ্টি,—আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুক্কাইত পাপ-পুঞ্জ বিদগ্ধ করিতেছে, আর যেন বলিয়া দিতেছে, 'জীবনদণ্ডই এ পাপীর সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।' পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না হইলে পাপীর উদ্ধার অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, যোগিনীর রুদ্রতেজে পাপরাশি পুড়িয়া ভস্মময় হইবে, আর সেই ভস্মরাশি তপস্বিনীর তপঃপ্রভাবে শান্তি লাভ করিবে। যাও সতী, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবন ধন্য ও সাধন সিদ্ধ হউক।

অনন্তর বাষ্পাকুল লোচনে উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিতে দেখিতে বিদায় লইলেন। সান্ধ্যগগনে অনন্ত তারকামণ্ডলীকে সাক্ষ্য করিয়া স্বামীর পদে স্ত্রী ইহকালের জন্য বিদায় লইলেন। আজ হইতে উভয়ের ঐহিক সম্পর্ক ফুরাইল! উভয়ের জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল!

শান্তশীল বিন্দুকে বিদায় দিয়া মায়ের মন্দিরে চলিয়া গেলেন; বিন্দু মঙ্গলার নিকট বিদায় লইতে তাহার কক্ষে উপস্থিত হই-লেন। প্রাণের একমাত্র বন্ধন, যোগ-জীবনের একমাত্র অবলম্বন সাধের মঙ্গলাকে সাগ্রহে কোল দিয়া কহিলেন, "মঙ্গলে, পতিপদে বিদায় হইয়াছি, এখন তোমার নিকটেও বিদায় চাই; কল্যাণে আমাদের এই শেষ দেখা! আমার শেষ প্রার্থনা, কাল তোমরা যথাসময়ে উদয়গিরি যাইও, আমার অপেক্ষা করিও না। মনে করিও এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি তোমা-

দের পক্ষে মৃতা! এতকাল অকপট স্নেহে, যত্নাতিশয্যে ও সঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চনে যে জীবন বাঁচাইয়াছিলে, আজ সে জীবলীলা পূর্ণ হইল। দরবার অন্তে বৃদ্ধ বাবাজীর নিদেশানুযায়ী কার্য্য করিও; অনুশীলায় যেন প্রাণ ভরিয়া পতিপদ সেবা করিতে পারি। মঙ্গলে, তুমি মানবীবেশে দেবী, অন্তর্য্যামী নও বটে—কিন্তু বহুজ্ঞানী; মায়ের ইচ্ছায় যেন পুনঃ তোমার দেখা [illegible]লিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে তড়িৎবেগে মঙ্গলার দৃষ্টিবহির্ভূতা হইলেন; মঙ্গলা বিন্দুর অনুসরণ করার অবসর পাইলেন না। মঙ্গলার মনে হইল, নীরদকোলে দামিনীর ন্যায় সান্ধ্যগগনে যেন সে জ্যোতির্ম্ময়ী ভৈরবী মূর্ত্তি মিশিয়া গেল।

এদিকে বিন্দু মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া একেবারে অনুশীলায় বাবাজীর যোগ কুটীরে পৌঁছিলেন। বাবাজী ভৈরবীকে মধুর বচনে কহিলেন, "এস মা এতক্ষণ তোমারই অপেক্ষা করিতেছিলাম; দ্বাদশীর নিশা যোগারম্ভের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ!

ভৈরবী—আজ যোগব্রতের বোধন, অভিষ্টদেবকে আবাহন করার পূর্ব্বে সাধনশালার সমুচিত [illegible] হওয়া আবশ্যক; কল্য অভীষ্টদেবের আগমন হইবে।

প্রঃ—কোথা হইতে আসিবেন?

উঃ—উদয়গিরি হইতে।

প্রঃ—এ দেবতা কে?

উঃ—ধর্ম্মস্বামী বন্দী মিছিরজী।

বাবাজী সবিস্ময়ে কহিলেন, কে কে[illegible]ক্ষ শাস্ত্রশীল[illegible]

ভৈরবী অবনত মস্তকে নীরব রহিলেন।

বাবাজী—বৎসে, আমি এ কথার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিতেছি না।

অনন্তর স্বামীর পূর্ব্বচরিত্র, ও তদনন্তর কল্যাণে স্বামী সম্মিলনের কথা খুলিয়া বলিলেন। আর কহিলেন, "মন্দিরস্থা জয়াই এ মিলনের মূল, পরের সুখ খুজিয়াই তাঁহার সুখ।"

প্রঃ—জয়া কে?

উঃ—করোঞ্চার বালবিধবা মঙ্গলা—গোসাঞীর জ্ঞাতিভগ্নি।

একথা শুনিয়া বাবাজী কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন; চিন্তা করিয়া কহিলেন, ভগবানের কি ইচ্ছা কে জানে? শান্তশীলের অব্যাহতি বোধ হয় সম্ভবপর নয়।

ভৈরবী—নিশাপ্রভাতেই শেষ দিন আসিবে; পতির প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য! তাই আজ আবাহন, ভবদীয় সাহায্য সাপেক্ষ!

ভৈরবীর তদানীন্তন দিব্য স্নিগ্ধ দৃষ্টি বদনমণ্ডলের অলৌকিক প্রভা দেখিয়া বাবাজী স্তম্ভিত হইলেন এবং মনে মনে নব-যোগিনীর যোগবলের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎসে, তোমার যোগবলই যথেষ্ট, আমা হইতে কি প্রত্যাশা করিতেছ?

ভৈরবী—এ যোগিনীবেশ মাত্র উপযুক্ত উপকরণ ও শিক্ষা-গুরুর উপদেশ ভিন্ন যোগভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা!

প্রঃ—কি করিতে হবে বল!

তদুত্তরে ভৈরবী গদ গদ স্বরে কহিলেন, "প্রভো! আজ আর লজ্জা নাই; পতিপদ পূজাই এ যোগের উদ্দেশ্য! ফাঁসী

অন্তে পতির মৃত দেহ পাইতে পত্নীর সম্পূর্ণ অধিকার ; তাহারই উপযুক্ত বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক।"

ভৈরবীর কথা শুনিতে শুনিতে বাবাজী ধ্যানস্থ হইলেন ; তিনি জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইলেন, "শান্তশীলের পাপদেহ ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতেছে ; আর যোগিনী ভীষণ নিশীথে শ্মশান-ক্ষেত্রে মৃত পতির পদযুগল দুই স্কন্ধে স্থাপন করিয়া উর্দ্ধ নয়নে উর্দ্ধকরে সমাধিস্থ রহিয়াছে।"

সে তাণ্ডব দৃশ্যে বাবাজীর সমাধী ভঙ্গ হইল ; তিনি কহিলেন, "বৎসে, ধন্য তোমার পতিভক্তি—ততোধিক সাধন-শক্তি! তোমা হইতেই অনুশীলার কিম্বদন্তি সত্যে পরিণত হইবে।

ভৈরবী—কিম্বদন্তি কি ?

বাবাজী—কথিত আছে যে কালক্রমে কোন যোগিনী সাধন-শালায় শবসাধন করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন। মহামায়ার মায়াচক্রে সে শবসাধন জন্যই বোধ হয় এ নবযোগিনীর আবির্ভাব ?

উভয়ের কথা প্রসঙ্গে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত। ভৈরবীর অনুরোধে বাবাজী উদয়গিরি যাইতে স্বীকার করিলেন ; এবং গুরুর আদেশ লইয়া সিদ্ধোদকে সাধনশালার সংস্কার কার্য্যে ভৈরবী চলিয়া গেলেন। মতিয়া ও বুধিয়া চন্দনচূর্ণ ও ধূনা সংগ্রহ করিয়া দিল ; ভৈরবী স্বহস্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ধূপ চন্দন দানে গিরিশৃঙ্গ সুগন্ধময় করিয়া ধ্যানস্থা হইলেন। মতিয়া ও বুধিয়া যোগিনীকে অভিবাদন করিয়া

স্ব স্ব কুটীরে প্রস্থান করিল। গৃহে ফিরিবার পথে বাবাজীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'প্রভো, এ যোগিনী কে?

উঃ—মতি যে, সেদিন তুমিই ত এ ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলে।

মতিয়া—সে কি প্রভো!' ভৈরবীর সে রোগা দেহ নাই, মুখে সে কালিমা নাই; এ যেন দেবী মূর্ত্তি—উজ্জ্বল দৃষ্টি, এ কয় দিনে কি সে দেহের এত উন্নতি!

বাবাজী—যোগবলে সকলই সম্ভবে। আজ তোমরা বিদায় হও; কাল সকলকে উদয়গিরিতে যেতে হবে। কেবল বুধিয়া অন্য দুটী পরিচারিকাসহ আমাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সাধনশালার দ্বারে উপস্থিত থাকিবে। দেখিও যোগিনীর সাধনের যেন কোন ব্যাঘাত না হয়।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া মতিয়া ও বুধিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ কল্প।

অদ্য কৃষ্ণাত্রয়োদশী, উদয়গিরিতে শেষ দরবার!

মায়ের পূজান্তে উপাসক ও সেবক সম্প্রদায় কল্যাণ হইতে উদয়গিরির পথে চলিলেন। আজ স্বয়ং লালজী অগ্রণী—তাঁহার পশ্চাতে শান্তশীল ধর্ম্মবীরের ন্যায় জীবন সংগ্রামে চলিয়াছেন। গোসাঞী,চঞ্চলা ও মঙ্গলা ধীরপদে শান্তশীলের অনুগমন করিলেন। চলিতে চলিতে যতক্ষণ মন্দিরের উন্নত চূড়া দৃষ্ট হইল, ততক্ষণ শান্তশীল তদ্গতচিত্তে মায়ের সাধন করিলেন; মন্দির চূড়া দৃষ্টি বহির্ভুত হইলে শান্তশীলের দৃষ্টি শূন্য ও অন্ধকারময় হইল। সম্মুখের প্রশস্ত পরিষ্কার মার্গও যেন তিমিরাচ্ছন্ন ও কণ্টকিত বলিয়া মনে হইল। শান্তশীল বুঝিতে পারিলেন—এ নরকবর্ত্তের আরম্ভ মাত্র! ক্রমে উপত্যকা পথ ছাড়িয়া কল্যাণ সম্প্রদায় আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল; নীরবে সকলে পথ চলিতেছেন, যেন সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া মূকের ন্যায় চলিতেছেন। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শান্তশীল কহিলেন, গাও সবে—

"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা,
বিনে সে অভয়া অভয়দায়িনী শ্যামা।" ইত্যাদি

গোসাঞী সে অনুরোধের অর্থ বুঝিয়া গাইলেন—"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা" মঙ্গলা ও চঞ্চলা সে গানে যোগ দিলে পর্ব্বতমালা বিকম্পিত করিয়া সে সঙ্গীত লহরী দূর হইতে দূরান্তরে প্রতিধ্বনি হইল—

"কে আর বিপদে রাখিবে গো শ্যামা

শান্তশীল তন্ময় হইয়া কহিলেন, আবার গাও ঃ—

পুনঃ সেই বিভীষিকা বিকট গর্জ্জন,
বুঝি জীবতরী হয় অতলে মগন,
কাঁপি থর থর, ধর মাগো ধর,
বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা।”

সপ্তকণ্ঠে সমস্বরে আবার গীত হইল—

“বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা।”

সে গানে শান্তশীলের মলিন দৃষ্টি উজ্জ্বল হইল; জ্ঞান ও ভক্তিবলে বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। উদয়গিরির পদমূলে পৌঁছিলে গান থামিল। লালজী কহিলেন, একবার বলুন সবে—“জয় ব্রিটিশের জয়,—যতোধর্ম্ম স্ততো জয়।” শতকণ্ঠে সে জয়ধ্বনি উদয়গিরির সমন্নুখণ্ড গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল, সে ভৈরব রবে মেজর সাহেবের আসন টলিল। তিনি সত্রস্ত ও ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দফাদার জিমূৎ হুঙ্কারবৎ এ ভীষণ গর্জ্জন কোথা হইতে আসিতেছে? দফাদার বুঝিতে পারিল মেজর সাহেবের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সে স্মিতমুখে কহিল, স্বয়ং সেনাপতি বন্দীকে সঙ্গে লইয়া কল্যাণ হইতে আসিতেছেন, আর কল্যাণ সম্প্রদায় “ইংরাজের জয়” শব্দে পর্ব্বতমালা কাঁপাইয়া সৈনাপতির অনুসরণ করিতেছেন। মেজর সাহেব সে কথা শুনিয়া শান্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন “দরবার আরম্ভ সূচক তোপধ্বনি করা হউক।” আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল।

যথা সময়ে দরবারের কার্য্য আরম্ভ হইল। মেজর সাহেব

সর্ব্বাগ্রে বন্দীগণকে জানাইলেন যে লাট সভা অপরাধিগণের প্রাণদণ্ড ও কারাবাসের হুকুম সর্ব্বথা মঞ্জুর করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ শান্তশীলের উপর কোন অনুগ্রহ দেখান হয় নাই। সুতরাং তাহারও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা বাহাল রহিল। সরকার বাহাদুর ঠগীর উপার্জ্জিত অর্থের তিলার্দ্ধও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। দানপত্রের অন্যদফা সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই।

মেজর সাহেবের বক্তব্য শেষ হইলে বন্দীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা দণ্ডার্হ, ক্ষমাপ্রার্থী নহি ; বরং অম্লানচিত্তে দণ্ডাধীন হইতে প্রস্তুত।" এবার মেজর সাহেব বুঝিলেন, নরহত্যায় ঠগীগণের যেমন আনন্দ, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতেও তেমনি অকুণ্ঠিত। অনন্তর মেজর সাহেবের নিদেশানুসারে যাহাদের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে তাহারা রুদ্রমূর্ত্তি ঘাতকগণের সঙ্গে বধ্যভূমে ও অবশিষ্ট বন্দীগণ ইন্দোরের কারাগারে প্রেরিত হইল। বধ্যভূমে উপযুক্ত সংখ্যক ফাঁসীকাষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত ছিল, সুতরাং অত্যল্প সময়েই বহুসংখ্যক ঠগীর জীবনরবি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই চিরতরে অস্তমিত হইল !

ভৈরবীর অনুরোধে শান্তশীলের মৃতদেহ সঙ্গে লইয়া বাবাজী অনুশীলায় পৌঁছিলেন ; গোসাঞী, অন্যান্য কতিপয় সাধু ও জয়া বাবাজীর অনুসরণ করিলেন।

এদিকে ঠগীগণের আত্মীয় স্বজনগণ কোন কোন মৃতদেহ সৎকারের অনুমতি পাইল। তারার অনুরোধে চিতুর মৃতদেহ নওয়াগড়ে প্রেরিত হইল। স্বামীর অনুমতি লইয়া তারা শব

সঙ্গে নওয়াগড়ে চলিলেন। স্বামীকে বলিলেন, "অনুশীলায় আমার জন্য অপেক্ষা করিও অগৌণে আমি সেখানে পৌঁছিব।"

চিতুর শব নওয়াগড়ে পৌঁছিলে এক ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল। সংবাদ পাইবামাত্র অনুপমা উন্মাদিনীর ন্যায় মর্ম্মঘাতি হাহাকার করিতে করিতে পতির পদতলে লোটাইয়া পড়িল। আর রমা? তাহার ভাব অন্য রকম। তাহার মুখে শোক বা বিষাদের চিহ্ন নাই—প্রলয়ের পর প্রকৃতি যেন স্থির গম্ভীর! বজ্রদগ্ধ বিটপীর ন্যায় নিশ্চল—নিথর! রমা মৃদু মন্দ গমনে ক্ষিপ্রার স্রোতজলে পতির চরণদ্বয় বিধৌত করিয়া গণ্ডূষ লইলেন, ভৈরবীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'পতিই রমণীর গতি' সুতরাং সেই পদ ছাড়া হইবে না। সেই ব্রত উদ্‌যাপন জন্য অন্ন জল ছাড়িয়াছেন, পক্ষান্তপরে এই আজ এই জল গণ্ডূষ গ্রহণ করিলেন; পতির চরণামৃত পাইয়া অতি পরিতোষ হইলেন; অজ্ঞাতে কে যেন সে পরিতপ্ত হৃদয়ে শান্তিধারা ছড়াইয়া দিল। দগ্ধপ্রাণে সে শান্তিছায়া লইয়া পতির চরণতলে শায়িত হইলেন; ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় মুদিত হইল, রমার মহানিদ্রা আসিল– আর সে নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। যথা সময়ে প্রচুর চন্দন কাষ্ঠে হবিঃ সংযোগে সে যুগল দেহের সৎকার হইল। তারার যত্নে নিঃসঙ্গ অনুপমার চৈতন্য হইল। অনুপমা তারাকে আপন বক্ষে চাপিয়া কহিলেন, "তারা তুই মানবী বেশে দেবী, তুই রমাকে বৈকুণ্ঠে পাঠায়েছিস, আমার জন্য কি ব্যবস্থা কর্‌লি?"

তারা সজল নয়নে কাতর বচনে কহিলেন, মাতঃ, সকলই কল্যাণীর ইচ্ছা ; শান্তিময়ীর অনুগ্রহে তুমিও শান্তি পাইবে।"

"না-না—শান্তি নয়—উদ্‌ভ্রান্তি, নওয়াগড়ে আমার জন্য স্থান নাই" বলিয়া পবনবেগে অনুপমা প্রস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে অনুপমা পর্ব্বত গহ্বরে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে সন্ধ্যাতীত, তারা আর অনুপমার অনুসরণ করিবার অবসর পাইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া ক্ষিপ্রার কুলে কুলে পার্ব্বত্য পথে অনুশীলার দিকে চলিলেন। যোগিনী বেশে ত্রিশূল হস্তে তারা দ্রুতপদে চলিয়াছেন, পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"তারা!" সে পরিচিত স্বর চিনিতে পারিয়া তারা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন,—ডাকিলেন—"কে ও মা।" কিন্তু তারা কিছুই দেখিতে পাইলেন না—কেহ উত্তর দিল না। তারা আবার চলিলেন, আবার কে ডাকিল—"তারা" ? এবারও সেই পূর্ব্বস্বর। এবার তারা বুঝিলেন অনুপমা তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। তারা পুনঃ ডাকিলেন,—

"এস মাগো এস কাছে—
তোমারই জন্য তারা দাঁড়িয়ে আছে।"

এবারও কোন উত্তর নাই। তারা একটুকু ত্রস্তা—একটুকু ভীতা হইয়া চলিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ হইতে আবার সেই স্বরে উক্ত হইল—তারা একবার গাও—"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা।"

এবার তারা ধ্রুব বুঝিলেন, অদৃশ্যভাবে অনুপমা তাহার অনুসরণ করিতেছেন। মায়ের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সেই

নিভৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশে নৈশ সমীরণে কণ্ঠ মিশাইয়া মধুর পঞ্চমে তারা গাহিলেন,

কে আর বিপদে রাখিবে গো মা,
বিনে সে অভয়া অভয়দায়িনী শ্যামা। ইত্যাদি

সে গান শুনিয়া অনুবর্ত্তিনী আবার কহিলেন—'ভয় কি,তারা আমার মা, রাখবে তোকে শ্যামা মা, সে পদ পূজে অনুপমা।'

তারা আবার ডাকিল—"মা-মা" কিন্তু কোন উত্তর নাই। তারা দেখিল তাহার পশ্চাৎ হইতে একটী ছায়া যেন অগ্রে অগ্রে চলিয়া গেল। তারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আকাশ ভেদিয়া শব্দ হইল—

"তারা ছেড়েছে মা—কিন্তু তারা ছাড়ব না; প্রাণভ'রে দেখ্‌ব তারা কিন্তু দেখা দিব না।" বলিয়া সে ছায়া অন্তর্দ্ধ্যান হইল। অতঃপর তারাও অনুশীলায় পৌঁছিলেন।

এদিকে বাবাজীর সঙ্গে গোসাঞী ও লালজী শান্তশীলের শব লইয়া অনুশীলায় পৌঁছিলেন। মৃতদেহ সাধনশালার দ্বারের সম্মুখে এক প্রস্তর খণ্ডোপরি রক্ষিত হইলে বিন্দু সোৎসাহে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া পরম ভক্তিভরে মৃতপতির পদধূলি লইয়া উর্দ্ধ করে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া কহিলেন, "পতিই স্ত্রীর গতি, জীবন সর্ব্বস্ব, উভয়ের সম্বন্ধ কেবল ইহকালের জন্য নহে, পরকালে অক্ষয় মিলন। সে সুকৃতি পতির পদ পূজা; সুতরাং পতিপদে যোগভক্তিই স্ত্রীর মুক্তির কারণ; আর সেই মুক্তিপথই **"শব-সাধন।"** এ সাধনশালাই সে সাধনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

বৃদ্ধ বাবাজী এ কথা পূর্ব্বেই জানিয়াছেন; গোসাঞীরও তদর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। সে কথা শুনিয়া লালজী বিস্মিত-ভাবে গোসাঞীর মুখপানে তাকাইলেন; সে কৌতুহলময়ী দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া বাবাজী কহিলেন, "ভৈরবী পতির মৃতদেহ চিতানলে ভস্মাবশেষ করিতে প্রস্তুত নহেন; স্বীয় যোগবলে তপস্যানলে এ দেহ ভস্মীভূত করিতে চাহেন; আর এই সাধন-শালাই তাদৃশ কঠোর তপস্যার উপযুক্ত স্থান" এই বলিয়া মৃত-দেহে সিদ্ধোদক ছড়াইয়া কহিলেন—শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

তদুত্তরে ভৈরবী কহিলেন,—

স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

অতঃপর বিন্দু পতির শব লইয়া কক্ষ মধ্যে শিব-বেদিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। উপস্থিত সকলে দেখিতে পাইলেন—দুইটী জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া যেন ভৈরবীর সঙ্গে সে শব বহন করিয়া লইল। সে দৃশ্যে কল্যাণসম্প্রদায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থিরলোচনে বিন্দুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সকলেই নীরব—নিস্তব্ধ! মঙ্গলা তাদৃশ অলোকসম্ভব ব্যাপার দর্শনে মুহ্যমানা—স্পন্দন-রহিতা; তাঁহার দেহে যেন প্রাণ নাই, কথা বলিবার শক্তি নাই। কি বলিয়া আজ বিন্দুকে সম্ভাষণ করিবেন, কি বলিয়া আর মুখ দেখাইবেন, সে চিন্তায় মঙ্গলা আড়ষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার অসহ্য মনোবেদনার কারণ এই যে, যে বিন্দুকে এত কষ্ট করিয়া বাঁচাইলেন, যে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় দীর্ঘকালের পর মায়ের ইচ্ছায় পতিপত্নীর মিলন হইল, আজ সে স্বামী সম্মিলনই বিন্দুর কাল হইল, বিন্দুর জীবলীলা এখানেই ফুরাইল। মঙ্গলাই

বিন্দুর মৃত্যুর কারণ—এ কথা ভাবিয়া মঙ্গলা ততোধিক মর্ম্মাহতা হইলেন।

কক্ষমধ্যে শব প্রতিষ্ঠা করিয়া বিন্দু বাহিরে আসিলেন, এবং মঙ্গলাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মস্তক নিজস্কন্ধে স্থাপন করিয়া সাদরে সুমধুর বচনে কহিলেন—দিদি একবার গাও—"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা" মঙ্গলা নীরব; ভৈরবী আবার বলিলেন গাও সেই সুমধুর গান—"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা।"

এবার মঙ্গলা কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু ভগ্নহৃদয়ের দুঃখের কথা মুখে ফুটিল না; কেবল কাতরভাবে শূন্য নয়নে বিন্দুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সে চাহনির অর্থ "বিন্দু তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, বলিয়া দাও মঙ্গলার মুক্তি কোথায়?" বিন্দু আবার ডাকলেন—'মঙ্গলে' কিন্তু উত্তর নাই। তখন সময় বুঝিয়া গোসাঞী গাহিলেন ঃ—

"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা
বিনে সে অভয়া অভয়দায়িনী শ্যামা"

সে গানে মঙ্গলার মৃতকল্প দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল, প্রাণে বল পাইল. ভক্তির উচ্ছ্বাসে মঙ্গলার কণ্ঠরোধ দূর হইল। তিনি বিন্দুর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া সে গানে যোগ দিলেন। তখন সে সঙ্গীতলহরী অনুশীলার সাধন কক্ষে ও তথা হইতে শৈলমালার গহ্বরে গহ্বরে আকাশবাণীর ন্যায় প্রতিঘাত হইল "অভয়দায়িনী শ্যামা"

ভক্তের কণ্ঠে ভক্তির গান সহজে থামে না, আবেশ

কমে না। সুতরাং অনেকক্ষণ গান চলিল, যখন উহা থামিল, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। এক এক করিয়া দুইবার পাপীয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল, সাধনশালার উন্নত মস্তকে বসিয়া নিশাপ্রিয় পেঁচকমিথুন অস্পষ্টস্বরে বলিয়া দিল, "সাধক সাধনের সময় উপস্থিত।" অনতিদূরে অনুলা ও শিলোড়ার সঙ্কীর্ণ পল্লিতে গ্রাম্য প্রহরী সারমেয়গণ অশ্রাব্য কঠোররবে নিদ্রিত পল্লীকে জাগাইয়া বলিল, "সাধনশালায় ভক্তির আবির্ভাব, যাও মুক্তির পথ খুঁজিয়া লও।" মহাযোগী বাবাজী আকাশপানে চাহিয়া বুঝিলেন, সাধনের সময় উপস্থিত। তিনি গমনোন্মুখ হইলে, বিন্দু প্রণতা হইয়া কহিলেন, "প্রভো গুরুদত্ত মহামন্ত্রই সাধনের বল, দরিদ্রের সম্বল! আশীর্ব্বাদ করুন দুঃখিনীর সাধন যেন সিদ্ধ হয়।" বাবাজী দক্ষিণকরে ভৈরবীর মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন— "এই লও আমার যোগমায়া— আর তপঃপ্রভা—" বলিয়া বাহুমূলস্থ সিদ্ধ কবচ বিন্দুর বাহুমূলে বাঁধিয়া দিলেন। আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া বাবাজী চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে তারা আসিয়া অনুশীলায় পৌছিলেন। উৎকণ্ঠিতভাবে লালজী এতক্ষণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তারা পিতৃপদে প্রণতা হইলে কাতর বচনে পিতা কহিলেন, "সকল মঙ্গল ত?" "মঙ্গল কি অমঙ্গল, সে মা সর্ব্বমঙ্গলাই জানেন" বলিয়া সর্দ্দারের সৎকার, রমার সহমরণ এবং অনুপমার উন্মত্ততা সকল খুলিয়া বলিলেন। উন্মাদিনী যে অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাও জানাইলেন;

সকলে সে কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে রমার পতিভক্তির প্রশংসা করিলেন। তারা আবার কহিলেন, বোধ হয় উন্মাদিনী এ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।

তারার কথা শেষ হইতে না হইতে এক বিকট ছায়া পশ্চাৎ হইতে সকলের সম্মুখ দিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া গেল, এবং বিকট হাস্য করিয়া কহিল,—

"তারা ছাড়িয়াছে মা কিন্তু তারা ছাড়ব না,
নয়ন ভ'রে দেখ্‌ব তারা কিন্তু দেখা দিব না।"

তারা মঙ্গলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্যস্ততাসহকারে কহিলেন, "মাসি, এই সেই উন্মাদিনীর উক্তি।" তারার কথা শুনিয়া সে ছায়া আবার অট্টহাসি হাসিল। তারা কহিল,—

"বল মা কি করি উপায়,
মাতৃহীনা হ'য়ে আজি দাঁড়াই কোথায় ?"

উ ঃ—"তুই তারা শক্তি, তুই তারা ভক্তি, ব'লে দে মা কিসে হবে মুক্তি ?"

কে যেন বলিয়া উঠিল—"ভক্তিতেই মুক্তি।"

প্র ঃ—সে ভক্তি আমার কই ?

উ ঃ—একাগ্র মনে ডাক্‌লে মায়,
মুক্তির পথে চলে যায়।

সে ছায়া তখন বলিয়া উঠিল,

"ঠিক কথা—ঠিক কথা—তাই ত এসেছি হেথা,
সাধাকণ্ঠে ভক্তের মুখে শুন্‌বো দুটো ভক্তির গাঁথা।"

একথা বলিতে বলিতে সে ছায়া আঁধারে মিশিয়া গেল।

এ সকল অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া লালজী বিস্মিত ততোধিক স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; সাহস করিয়া একটা কথাও বলিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া গোসাঞীকে কহিলেন, "পিতঃ, আমার মনে হয় অনুশীলা মায়াপুরী, আর এ সকলই মায়ার খেলা। কল্যাণের শিক্ষা, দীক্ষা আর নিষ্কামভাবে পরের জন্য আত্মত্যাগ—সকলই যেন মায়াময়।"

গোসাঞী—যোগমায়া বটে; সাধনবলে সকলই সম্ভবে। এ স্থানমাহাত্ম্য! উন্মাদিনী যথার্থই বলিয়াছে, শক্তি ভিন্ন হয় না ভক্তি।"

লালজী—সে শক্তি লাভ কিসে হয়?

গোসাঞী—একাগ্রচিত্তে কল্যাণীর উপাসনা আর যোগসাধনা।

ইত্যবসরে মঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে গোসাঞীর চরণ ছুঁইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আজ সব ফুরাইল, কর্ম্মফল ফলিল; কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক কাটাইয়া বিন্দু বিদায় হইল; এখন অভাগিনীর গতি কি হবে?

কল্যাণে আসাবধি মঙ্গলার সঙ্গেই তারার ঘনিষ্ঠতা বেশী; মঙ্গলার মর্ম্মঘাতি সে কথা শ্রবণে রোরুদ্যমানা তারা কহিলেন, মাসি, তুমিও যদি ছাড়িয়া যাবে, তবে আমি দাঁড়াইব কোথায়? কল্যাণীর সেবার অধিকার আমার এখনও হয় নাই। মঙ্গলা গোসাঞীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "সে ব্যবস্থাও ঠাকুরই করিবেন।"

এবার গোসাঞী উভয় সঙ্কটে পড়িলেন; উভয়ের প্রশ্নের উচিত উত্তর করিতে গোসাঞীকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। তিনি

মনে মনে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে প্রত্যুৎপন্ন মতি সহকারে কহিলেন, "সকলই মায়ের ইচ্ছা; কল্যাণীর অনুগ্রহে কোন অকল্যাণের আশঙ্কা নাই; কুরু মা কল্যাণি কল্যাণ জীবে।"

মঙ্গলা ও চঞ্চলা সে কথায় আশ্বস্ত হইয়া নীরব হইলেন।

অতঃপর বিন্দু কল্যাণসম্প্রদায়ের নিকট বিদায় হইয়া গোসাঞীর পদধূলি মস্তকে লইলেন; মঙ্গলাকে কোল দিয়া কহিলেন, "মঙ্গলে! মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল করিবেন; পরের সুখ খুঁজিয়াই তুমি সুখী; পরকে আপন করিতে তুমি মন্ত্রসিদ্ধ! সে পথেই তোমার মুক্তি। তোমার সেবায় কল্যাণী সুপ্রসন্না।" তদনন্তর জীবন সর্ব্বস্ব স্নেহের পুত্তলিকা চঞ্চলার চিবুক ধরিয়া সোহাগভরে কহিলেন, "স্বামীই স্ত্রীর উপাস্য দেবতা; পতিপদ ভিন্ন স্ত্রীর অন্য গতি নাই। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সে গুরুসেবা, ক্ষুৎপিপাসাতুরকে অন্ন জল দান, আর্ত্তের শুশ্রূষা আর অতিথিসেবাই প্রশস্ত সংসারধর্ম্ম" বলিয়া লালজী ও চঞ্চলাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিন্দু সাধনকক্ষে প্রবেশ করিলেন; আর বাহির হইলেন না। কক্ষদ্বার অর্গলিত হইল। গোসাঞী, লালজী, মঙ্গলা ও চঞ্চলা উদাস প্রাণে কল্যাণে ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চদশ কল্প।

সাধনশালার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের গায়ে অতি ক্ষুদ্র অক্ষিবৎ দুটী করিয়া ছিদ্র ছিল। প্রাতঃসূর্য্যকিরণ ঐ ছিদ্র পথে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে অতি কষ্টে ভিতরের পদার্থ দেখা যায়। মঙ্গলা ও চঞ্চলা প্রত্যহ প্রত্যুষে আসিয়া সে ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে বিন্দুকে দেখিয়া যান। বিন্দু পতির চরণদ্বয় উভয় স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ঊর্দ্ধকরযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে ধ্যানস্থা। অবসর মত গোসাঞী ও লালজী আসিয়া থাকেন। এক দুই করিয়া ক্রমে সপ্তাহ কাটিল, বিন্দুর ধ্যানভঙ্গ হইল না; সে শবেরও কোনরূপ বিকৃতি জন্মিল না। ভৈরবীর কঠোর সাধনবলে সে মৃত দেহ কোনরূপ ক্লিষ্ট বা বিগলিত হয় নাই।

বাবাজীর আদেশক্রমে মতিয়া ও বুধিয়া প্রত্যহ সাধনশালার সংবাদ লইয়া যায়। অষ্টাহের প্রভাতে—শুক্লাষষ্ঠীর নিশাবসানে মতিয়া ও বুধিয়া ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে ভীতা ও স্তম্ভিতা হইল; সর্ব্বনাশ—সাধনশালা শূন্য—ভৈরবী মৃতদেহ লইয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছে। তাহারা আর সাহস করিয়া সেখানে থাকিতে পারিল না; কাঁপিতে কাঁপিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া বাবাজীকে কহিল, "পরভো, রক্ষা কর—রক্ষা কর, অনুশীলা এতকাল পর যে প্রেতপুরী হইল; ভৈরবী মৃত দেহ উদরস্থ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছে; কক্ষ শূন্য, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। আমরা কক্ষদ্বারে পৌঁছিবামাত্র ভিতর হইতে প্রচণ্ড ঝড়ের ন্যায় সোঁ করিয়া একটা হাওয়া বাহির হইল;

সে বাতাসে আমরা যাই যাই হইয়া রহিয়া গিয়াছি ; কিছুদূর গিয়া সে ঝটিকা পর্ব্বতমালায় মিশিয়া গেল, অমনি গহ্বর ভেদ করিয়া উক্ত হইল ঃ—

"বাহবা-বাহবা বা,—দেখ্‌লেম আজ দেখ্‌বার নয় যা ;
সার্থক সতীর **শব-সাধন**—শিবলোকে অক্ষয় মিলন।
ঠাকুর এলেন রথে চড়ে,—নিয়ে গেলেন যুগলবরে ;
ভাগ্যে আমি ছিলেম একা—তাই ঠাকুরের পেলেম দেখা ॥"

সে কথা শুনিয়া বাবাজীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে এত দিনে কিম্বদন্তি ফলিয়াছে। আর বুঝিলেন, ঐ উক্তি উন্মাদিনীর। মনে মনে উন্মাদিনীর কঠোর তপস্যার প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "মতিয়ে! তোদের কোন ভয় নাই ; এ যোগমায়া ; এতদিনে ভৈরবীর কঠোর তপস্যার ফল ফলিয়াছে। যোগবলে ভৈরবী শশরীরে পতিসহ ধ্রুবলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনে অনুশীলা জাগ্রত হইল" বলিয়া বাবাজী সাধনশালার দিকে চলিলেন ; মতিয়া ও বুধিয়া ভয়াকুলচিত্তে বাবাজীর অনুসরণ করিল।

"মৃতদেহ উদরস্থ করিয়া ভৈরবীর প্রস্থান" কল্যাণে এ সংবাদ পৌছিবার পূর্ব্বেই মঙ্গলা অনুশীলায় পৌছিলেন। রাত্রিতে মঙ্গলার সুনিদ্রা হয় নাই ; তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন "বৈকুণ্ঠ হইতে একখানি পুষ্পরথ ধীরে ধীরে সাধনশালার দ্বারে অবতীর্ণ হইলে কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল এবং সারথীর নির্দেশক্রমে ভৈরবী শবস্কন্ধে রথারোহণ করিলে দ্বার পুনরায় ভিতর হইতে অর্গলিত হইল, এবং পুষ্পরথ বিদ্যুৎবেগে শূন্যপথে চলিয়া গেল।"

কক্ষদ্বারে বাবাজীকে উপস্থিত দেখিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে মঙ্গলা স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া বাবাজী কহিলেন, "জয়ে তুমিই ধন্যা, তোমার সেবায় মা সুপ্রসন্না! তোমার সফল স্বপ্ন! এ স্বপ্ন নহে, মায়ের আদেশবাণী! যোগবলে সত্য সত্যই ভৈরবী ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কক্ষ শূন্য, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলিত ; ইহাই প্রত্যক্ষ যোগমায়া।"

বিস্ময়ে মঙ্গলার মুখে কথা ফুটিল না ; বাবাজীও ক্ষণকাল নীরব, বিশাল অনুশীলা নীরব, নিস্তব্ধ। প্রাতঃ সূর্য্যকিরণ সাধনশালার গায়ে খেলিতেছিল, উচ্চ শৃঙ্গোপরি ময়ূর ময়ূরী কর্কশ কেকারবে ঊষার আগমন বার্ত্তা জানাইতেছিল ; নিভৃত গহ্বরপার্শ্বস্থ পার্ব্বত্যশোভা বনস্পতিগণের নিবিড় পল্লবিত শাখায় বসিয়া দয়েলমিথুন তখনও অনুচ্চ পঞ্চমে মধুর ললিত রাগে বনস্থলীকে জাগাইতেছিল। অনতিদূরে শিরীষের ডালে বসিয়া কাল কোকিল কলকণ্ঠে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল ; আর সেই কুহুধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে কে বলিয়া উঠিল :—

বাহবা-বাহবা-বা, দেখলেম্ আজ দেখবার নয় যা ;
সার্থক সতীর শব সাধন, শিবলোকে অক্ষয় মিলন !
ঠাকুর এলেন রথে চ'ড়ে, নিয়ে গেলেন যুগল বরে ;
ভাগ্যে আমি ছিলাম একা, তাই ঠাকুরের পেলেম দেখা ॥"

এবার মঙ্গলা শিহরিয়া উঠিলেন, আগ্রহ সহকারে কহিলেন, "বাবাজি, এ আবার কোন ভক্তের কথা ?"

বাবাজী—সেই নওয়াগড়ের উন্মাদিনীর উক্তি! আজ অষ্টাহ

যাবৎ ঐ শিরীষ তরুমূলে উন্মাদিনী কঠোর তপঃ করিতেছে ; উহার উক্তি যথার্থ—ভৈরবীর শব-সাধনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদিনে অনুশীলার লুপ্ত মাহাত্ম্য পুনরুদ্দীপ্ত হইল, কিম্বদন্তি ফলিল—আর—বলিয়া বাবাজী থামিয়া গেলেন।

মঙ্গলা—বাবাজি আর কি ?

উঃ—সে কথা পরে হবে।

ইত্যবসরে গোসাঞী ও লালজী প্রমুখ চঞ্চলা ও কল্যাণ-সম্প্রদায়ের কতিপয় সাধু পবনবেগে সাধনশালায় ছুটিয়া আসিলেন। গোসাঞী বাবাজীকে অভিবাদন করিলে বাবাজী কহিলেন—"সাধু! সাধু! আজ ভৈরবীর সাধন সিদ্ধ! মঙ্গলার সফল স্বপ্ন—আর অনুশীলার কিম্বদন্তি সাধনবলে এতকালে সত্যে পরিণত হইল" বলিয়া বাবাজী মঙ্গলার স্বপ্ন বৃত্তান্ত, উন্মাদিনীর উক্তি ও যোগবলে মৃতপতি সহ ভৈরবীর শিবলোক প্রাপ্তির বিষয় খুলিয়া বলিলেন।

বাবাজীর কথা শেষ হইলে হাসিতে হাসিতে উন্মাদিনী আবার বলিল ঃ—

"পড়ে আছি অনুশীলায় পাই যদি সে অভয়া শ্যামা,
তারা ছাড়া উন্মাদিনী—জয় তারা আমার মা,
সার্থক সতীর শবসাধন, শিবলোকে অক্ষয় মিলন ;
ঠাকুর এলেন রথে চ'ড়ে, নিয়ে গেলেন যুগল বরে ;
ভাগ্যে আমি ছিলাম একা, তাই ঠাকুরের পেলেম দেখা॥"

গাও সবে ঃ—

"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা,
বিনে সে অভয়া অভয়দায়িনী শ্যামা।"

গোসাঞী ভক্তের ভক্তিপ্রবলতা বুঝিয়া সুর ধরিলেন,

"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা" ইত্যাদি

মঙ্গলা ও চঞ্চলা গানে যোগ দিলে সে সঙ্গীত ক্রমে পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল ; সকলে সমস্বরে গাহিলেন ঃ—

"কে আর বিপদে রাখিবে গো মা
বিনে সে অভয়া অভয় দায়িনী শ্যামা ;

* * * * *

পুনঃ সেই বিভীষিকা বিকট গর্জ্জন,
বুঝি জীবতরী হয় অতলে মগন;
কাঁপি থর থর—ধর মাগো ধর
বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা !"

সে গান থামিতে না থামিতে আগ্রহ সহকারে উন্মাদিনী কহিল ঃ—

না না, সাধনের শেষ নহে, আরম্ভ মাত্র, আবার গাও—ঐ গান—

সকলে সমস্বরে গাহিলেন,

"কাঁপি থর থর, ধর মা গো ধর—
বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা !"

এবার উন্মাদিনী কাতরকণ্ঠে কহিল,—

আবারও সেই কথা,—'বুঝি এই শেষ মায়ের সাধনা'
তবে আর সাধ পূরিল না, শক্তিহীনে মুক্তি হ'লনা !"

তারা ডাকিল—"মা—মা একবার তারায় দাও গো দেখা।"

তদুত্তরে উন্মাদিনী কহিল,—

'ভুলিয়াছি পতিশোক, ভুলি নাই তারা,

পাবে দেখা—একদিন—যবে দেহ ছাড়া

হবে পাষাণীর প্রাণ, মরব কত সুখে

মায়ের চরণামৃত দাও যদি মুখে।"

তারা—কখন্—কোথায় ?

উঃ—হবে যবে কালপূর্ণ ক্ষিপ্রার কুলে,

দেবীঘাটে পক্ষান্তরে মায়ের চরণ তলে।"

উন্মাদিনীর এতদুক্তির রহস্য কেহই ভেদ করিতে সক্ষম হইলেন না।

কিয়ৎকাল সকলে বিস্মিত—ততোধিক স্তম্ভিত! মঙ্গলা মন্ত্রমুগ্ধ! বাবাজী গোসাঞীকে অন্তরালে লইয়া অন্যের অশ্রুত-স্বরে কহিলেন, "পরমানন্দ, আমার অনুশীলায় যোগ সাধন শেষ হইল; কেবল কিম্বদন্তির সত্যতা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম; আজ শব-সাধনের পূর্ণাহুতি হইল; একদিন তোমাকে আত্মপরিচয় দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম, আজ সে সময় উপস্থিত। এতদিনে পরমহংস হয়. ত হরিদ্বার ছাড়িয়া হিমালয়ের নিভৃত গুহায় বাবার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কল্যাণের কার্য্য শেষকরিয়া তুমিও অনতিবিলম্বে সেখানে চলিয়া যাইও; পরমহংস আমার পুত্র—তোমার পিতৃদেব রামানন্দ পাঠক। তদনুপস্থিতিতে তুমিই পুত্রের কার্য্য করিও। নিশীথে আমি ধ্যানস্থ হইব; পঞ্চাহ পরে যখন

দেখিবে, এই দুই হস্ত ব্রহ্মতালুতে উপর্য্যুপরি ন্যস্ত হইয়াছে, তখন বুঝিবে সমাধি পূর্ণ,—এ দেহ প্রাণশূন্য”—বলিয়া বাবাজী নিজাশ্রমে চলিয়া গেলেন।

পিতা ও পিতামহের পরিচয় পাইয়া গোসাঞীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, কল্যাণমাহাত্ম্য প্রকৃতই কল্পনাতীত, যোগমায়ার লীলাক্ষেত্র! গোসাঞী শূন্য মনে কক্ষদ্বারে ফিরিলে মঙ্গলা কহিলেন—“ঠাকুর আজ সব ফুরাইল।”

গোসাঞী আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, “জয়ে! তোমার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। মন্দিরস্বামিনী হয় ত মন্দিরের ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া অবসর লইবেন। কিন্তু কল্যাণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই শেষ! বাবাজীর সমাধি পূর্ণ হইলে পিতৃ সন্ধানে যাইব! **শব-সাধন** কল্যাণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য,—যোগবলের পূর্ণ বিকাশ! তোমরা কল্যাণে ফিরিয়া যাও,—আমি আপাততঃ অনুশীলায়ই থাকিব।

মঙ্গলা—পিতা কে?

গোসাঞী—পরমহংস বা স্বামীজী।

একথা শুনিয়া মোহিতলাল কহিলেন, পিতঃ, প্রকৃতই কল্যাণ করোঞ্চার প্রভাসক্ষেত্র; পিতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী ও স্ত্রীর অপূর্ব্ব মিলন।

গোসাঞী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, বৎস, এসকলই কল্যাণীর ইচ্ছা! উপস্থিত পার্ব্বত্যপ্রদেশে শান্তি স্থাপনই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। কল্যাণীর অনুকম্পায় এ কার্য্য অসম্পূর্ণ

থাকিবে না ; প্রপঞ্চময় সংসারে মায়ের ইচ্ছাই আদ্যাশক্তি আর সে শক্তিলাভে ভক্তিই মূলমন্ত্র !

লালজী—উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ভিন্ন এ সামান্য জনের পক্ষে সে শক্তিলাভ অসম্ভব !

গোসাঞী—মায়ে ভক্তি ও কর্ম্মে আসক্তি থাকিলে শক্তিলাভে অবশ্যই সমর্থ হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহিণীই প্রধান সহায়।

মঙ্গলা—ঠাকুর, চঞ্চলা যে আজও অশিক্ষিতা—অজ্ঞান বালিকা ; সংসারের ধার ধারে না। আজও সে অবদ্ধ চিকুর-জালে বেণীবন্ধন করিতে জানে না ; সুগৃহিণী হইতে যে শিক্ষার আবশ্যক চঞ্চলার তাহা হয় নাই।

গোসাঞী—চঞ্চলা বালিকা বটে কিন্তু চতুরা ও বুদ্ধিমতি ; মঙ্গলার ন্যায় কৃতী গুরুর শিক্ষা কৌশলে বালিকার ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা ও মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন সত্বরেই হইবে ; গৃহাশ্রমই নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণ ও বাসনা বিরহিত কর্ম্মশিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। সংসারে স্ত্রীর শিক্ষাগুরু স্বামী ; পতির অকপট প্রেম ও পত্নীর অকৃত্রিম ভক্তির একত্র সংমিশ্রণই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সোপান ; কল্যাণীর ইচ্ছায় এ ক্ষেত্রেও সে প্রেম ও ভক্তির অভাব হইবে না" বলিয়া গোসাঞী মঙ্গলা, কণ্যা ও জামাতার নিকট বিদায় হইলেন। সকলে প্রণতা হইলে "কুরু কল্যাণি কল্যাণ জীবে" বলিয়া গোসাঞী বাবাজীর আশ্রমাভিমুখে চলিয়া গেলেন ;

লালজী, মঙ্গলা ও চঞ্চলা শবসাধনের মাহাত্ম্য ভাবিতে ভাবিতে শূন্যমনে কল্যাণে ফিরিলেন। আজ হইতে মঙ্গলার কণ্ঠে গান থামিল; বিন্দুর নাম লোপ পাইল।

ষোড়শ কল্প।

বাবাজী আশ্রমে আসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন ; ক্রমে চারি দিন কাটিল ; পঞ্চম দিনে সমাধি পূর্ণ হইল। শিষ্যের ন্যায় গোসাঞীও ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, যথাসময়ে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইলে দেখিতে পাইলেন, মহাগুরুর সমাধি পূর্ণ। তদনন্তর পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে বাবাজীকে সমাধিস্থ করা হইল। ষষ্ঠ দিবসে গোসাঞী পিতৃসন্ধানে অনুশীলা পরিত্যাগ করিলেন। আর তাঁহার উদ্দেশ হইল না।

এদিকে ভৈরবীর শবসাধন ব্যাপার লইয়া কল্যাণে এক নবযুগের সৃষ্টি হইল : বিস্ময় ও ভক্তির প্রবল স্রোত বহিল। মন্দিরস্বামিনী জয়ার হস্তে মায়ের সেবা ও মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিয়া বিরলে যোগব্রতোদযাপনের জন্য অসবর লইলেন ; জয়া কায়মনোবাক্যে মায়ের সেবা, সনাতন সত্য ধর্ম্ম ও যোগমায়ার মহিমা প্রচারে ব্রতী হইলেন। সে প্রচারকৌশলে সকলের বিশ্বাস জন্মিল, 'সাধিলেই সিদ্ধি'— 'যোগবলে শিবলোক প্রাপ্তি', 'ভক্তি মূলে মুক্তি' ; এই ত্রিবাহিণীই ত্রিবর্গ লাভের মুখ্য উপায়।

সরকার বাহাদুরের নিদেশক্রমে পার্ব্বত্য প্রদেশে শান্তি সংস্থাপনের ভার সৈন্যাধ্যক্ষ মোহিতলালের উপর ন্যস্ত করিয়া মেজরসাহেব ঠগীবিভাগের কর্ত্তা হইলেন। হুল্কাররাজ্যই ঠগীগণের প্রধান লীলাভূমি বলিয়া ইন্দোরে বড় ঠগী আফিস হইল ; উদয়গিরির আফিস ইন্দোরের অধীনে থাকিল।

সরকারী কার্য্যানুরোধে মোহিতলালকে অধিকাংশ সময় উদয়গিরিতে থাকিতে হয়। প্রিয়ম্বদা চঞ্চলা ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী, রাজকার্য্যে সহকারিণী—শৈলবিহারে নিত্য সঙ্গিনী। স্থানীয় পার্ব্বত্যপথ, গিরিসঙ্কট সম্বন্ধে চঞ্চলার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং চঞ্চলার উপদেশ অনেক সময় লালজীর বিশেষ উপকারে আসিত। উদয়গিরিতে অবস্থিতি সত্ত্বেও কল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। দিনান্তে মঙ্গলার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইলে চঞ্চলার সুনিদ্রা হইত না। গোসাঞী বলিয়াছেন, সংসারাশ্রমই কর্ম্ম শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র! মঙ্গলা চঞ্চলার কর্ম্মশিক্ষার ভার লইয়াছেন। তিনি বলিতেন, সংসারে কর্ম্মশিক্ষা ক, খ, গ এই তিন বর্ণাত্মক অর্থাৎ :—

ক—কল্যাণীর কৃপা ভিন্ন জীবের কল্যাণ হয় না।

খ—খদ্যোৎমালা যেমন আঁধার ভিন্ন শোভা পায় না, তেমন প্রকৃত জ্ঞান ভিন্ন জীবাত্মা উজ্জ্বলত্ব প্রাপ্ত হয় না।

গ—গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তাই যোগ সাধনের মূলমন্ত্র।

এ শিক্ষার উপাদান শ্রীমদ্ভাগবৎ; শ্রীমদ্ভাগবৎ মঙ্গলার নিত্য পাঠ্য। মঙ্গলা সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহার প্রিয়পাঠ্য!

উন্মাদিনী বলিয়াছে "শক্তি ভিন্ন হয় না ভক্তি, ভক্তি মূলে মুক্তি।" মঙ্গলার শিক্ষা কৌশলে শিষ্যাণীগণ বুঝিলেন, "সাধন ভিন্ন হয় না শক্তি ভক্তি তাহার মূল।" মঙ্গলার সাধন কুটীরে দিনান্তে একবার না আসিলে চঞ্চলার চিত্তশুদ্ধি হয় না; গৃহকার্য্যে মন বসে না, এমন কি স্বামীর সোহাগ ও মধুর

লাগে না। বিন্দু বলিয়াছিলেন, "যোগিনীবেশে চঞ্চলাকে সুন্দর দেখায়" তাই চঞ্চলা আজও সে বেশ ত্যাগ করেন নাই। যতক্ষণ উদয়গিরিতে থাকেন, ততক্ষণ তারার গৃহিণীর বেশ, সে বেশ গৃহকার্য্যের উপযোগী বিশেষতঃ স্বামীর প্রিয়দর্শন। কিন্তু শৈলবিহারে কিম্বা কল্যাণে যাওয়ার সময় ভৈরবী বেশে যৌবনে যোগিনী সাজিয়া বাহির হইতেন।

চিতুসর্দ্দার পীণ্ডারী প্রধান ছিল বলিয়া সর্ব্বত্র তারার সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। এখন সর্দ্দারকন্যা স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার গৃহলক্ষ্মী হইয়াছেন, ইহা রাট সম্প্রদায়ের গৌরবের কারণ হইল। ঠগীবৃত্তি যে নিতান্ত ঘৃণিত ও নৃশংস, একথা বুঝিতে কাহার বাকী থাকিল না; লালজীর সুবন্দোবস্তে উচ্ছৃঙ্খল রাটগণ উঞ্ছবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কৃষিকার্য্যে রত হইল এবং দিন দিন তাহাদের অবস্থাও উন্নত হইতে লাগিল। আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারার উপর রাট সম্প্রদায়ের প্রীতি ও ভক্তি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে উদয়গিরির নিঃশত্রু এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল। তারার অমায়িক ব্যবহারে ঠগীগণের পরম শত্রু মোহিতলাল রাটকুলের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মিত্ররূপে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলেন।

কল্যাণে তারার আর দুইটী নিত্যকর্ত্তব্য ছিল।

১ম ঃ—আর্ত্ত নিবাসে রোগীর শুশ্রুষা।

২য় ঃ—ক্ষুৎপিপাসাতুর দীন দরিদ্রকে অন্নজল দান।

উদয়গিরিতে সর্দ্দারজীর ইচ্ছানুসারে তারা যে অতিথিশালা খুলিয়াছেন, সাহস করিয়া অনেকেই সেখানে যায় না। কল্যাণে

কাঙালিনীর জন্য অবারিত দ্বার; সুতরাং কল্যাণে কার্য্যারম্ভের উদ্দেশ্য কাঙালীদিগের মনে বিশ্বাস স্থাপন। ক্রমে সকলে তারাকে চিনিল, তাঁহার ইচ্ছানুসারে ভিখারিণীগণ দলে দলে উদয়গিরিতে গিয়া আশাতীত ভিক্ষা পাইতে লাগিল।

একদা মঙ্গলা ও চঞ্চলা সাধনকুটীরে বসিয়া ভাগবদালাপ করিতেছিলেন, রাত্রি তখন প্রহরেক অতীত; কল্যাণ নীরব নিস্তব্ধ। শিরীষ বৃক্ষের নিবিড় পত্ররাজি হইতে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঝিল্লীরব ছুটিয়া আসিতেছিল। সহসা সে তরুরাজি প্রকম্পিত করিয়া যেন ঝড় বহিল; আর সে ঝটিকা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে হিঃ হিঃ-হাঃ হাঃ রবে অট্টহাসির তরঙ্গ ছুটিল। সে তরঙ্গে চঞ্চলার শান্তপ্রাণ ব্যস্ত হইল, তিনি আগ্রহসহকারে কহিলেন, "মাসি, এই যে সেই উন্মাদিনীর হাসি—সে কি আজও বাঁচিয়া আছে?"

মঙ্গলা—তাহাতে আর আশ্চর্য্যটা কি? মৃত্যু কাহারও ইচ্ছাধীন নহে; জীবগণই মৃত্যুর অধীন। বাবাজী বলিয়াছিলেন, অনুশীলায় উন্মাদিনী কঠোর তপস্যা করিতেছিল।

মঙ্গলার কথা শেষ হইতে না হইতে আবার সেই অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে কে বলিয়া উঠিল, "হা-হা-হা—শেষ আজ মায়ের সাধনা"

এবার কাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে এ ও সেই উন্মাদিনী অনুপমার উক্তি। তারা তড়িদ্বেগে বাহিরে আসিয়া আগ্রহ সহকারে কাতর বচনে কহিলেন, "মা একবার দেখা দাও গো মা।"

উত্তরে উন্মাদিনী কহিল :—

"শেষ মায়ের সাধনা—মরবে কাল তারার মা ;
মরিতে পরম সুখ, হেরে যদি তারার মুখ ;
সিদ্ধোদক দিলে মুখে, চলে যাব শিবলোকে ;
অনুশীলায় ছিলাম একা, তাই ঠাকুরের পেলেম দেখা।"

তারা—বল মা বল কোথা তারা পাবে মায়ের দেখা।
উ :—ক্ষিপ্রার কূলে চতুর্ভুজা, কর্‌ব সেথা নিশাপূজা !

এই বলিয়া উন্মাদিনী আবার অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে বগল বাজাইতে বাজাইতে পবনবেগে চলিয়া গেল। অতঃপর চঞ্চলা উদয়গিরিতে ফিরিলেন, কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। চঞ্চলা স্বপ্নে দেখিলেন, অনুপমা তাঁহাকে নওয়াগড়ে নিতে আসিয়াছেন ; মায়ের ভৈরবী বেশ, স্নেহময়ী মূর্ত্তি, সুপ্রসন্না ও ওজস্বিনী। তারা মায়ের সঙ্গে যাওয়ার জন্য যেমন ঘরের বাহির হইলেন, অমনি সে ভৈরবীমূর্ত্তি সুনীলাকাশে উজ্জ্বল তারকাদলে মিশিয়া গেল। আবার পর মুহূর্ত্তেই তারা দেখিলেন, রুক্ষকেশা আরক্তলোচনা উন্মাদিনী মা অনুপমা ক্ষিপ্রাকূলে দেবীঘাটে সাধনমগ্না ; যেন অঙ্গুলী সঙ্কেতে বলিতেছে—"সিদ্ধোদক দিলে মুখে, চলে যাব শিবলোকে।"

তাদৃশ স্বপ্নদর্শনে চঞ্চলার প্রাণ ভয়ে ও বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল ; আর নিদ্রা হইল না। নিশাবসানের অপেক্ষা না করিয়া সাধন কুটীরের ঘটনা ও স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত স্বামীকে জানাইলেন। এ ঘটনা শুনিয়া অনুশীলায় উন্মাদিনীর

উক্তি লালজীর মনে পড়িল; তিনি প্রিয়সম্ভাষণে পত্নীকে কহিলেন, সম্ভবতঃ উন্মাদিনীর কালপূর্ণ হইয়াছে। তাহার উক্তি আধ্যাত্মিক—অসত্য বলিয়া বোধ হয় না।

চঞ্চলা—এখন কর্ত্তব্য?

উঃ—নিশাবসানে নওয়াগড়ে যাওয়াই বিধেয়।

চঞ্চলা—স্বপ্নদৃষ্টা সে চামুণ্ডারূপিনী উন্মাদিনীর মূর্ত্তি মনে পড়িলে আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি, কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই।

স্বামী—সেজন্য ভয় কি, আমিও নওয়াগড়ে যাব।

স্ত্রী—সিদ্ধোদক কি?

স্বামী—বোধ হয় মন্ত্রপুত মায়ের চরণামৃত!

স্ত্রী—সে সংগ্রহের ভারও তোমারই উপর রহিল। কল্যাণ হইতে মায়ের চরণামৃত লইয়া তুমি নওয়াগড়ে আসিও, আমি ক্ষিপ্রার কুলে কুলে দেবীঘাটে পৌছিব। গড়ে মায়ের মন্দিরের সম্মুখে ক্ষিপ্রার কুলে যে বাঁধা ঘাট আছে, তাহারই নাম দেবীঘাট। কল্যাণ হইতে সঙ্কেতপথে না আসিলে কালবিলম্ব হইবে; নৌকা ঘাটেই বাঁধা থাকিবে।

স্বামী—সে জন্য ভাবিও না, আমি উপযুক্ত সময়েই ঘাটে পৌছিব।

অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই তারা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দ্রুতপদে দেবীঘাটে পৌঁছিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার বিস্ময়েরপরিসীমা রহিল না। উন্মাদিনী সত্য সত্যই ঘাটের

সেপানোপরি জানু পাতিয়া সাধন মগ্না। চন্দনচর্চ্চিত রক্তজবা করে, ঊর্দ্ধকৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশপানে চাহিয়া মায়ের প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণী, যেন কি আদেশবাণীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। উন্মাদিনীর দেহ শীর্ণ ও অবসন্ন; সে ঊর্দ্ধদৃষ্টি স্থির—গম্ভীর; অনুপমাকে তদবস্থ দেখিয়া তারা বাষ্পাকুললোচনে কাতর বচনে ডাকিলেন,—"মা—এই যে তোমার তারা উপস্থিত।"

এবার অনুপমা করস্থিত রক্তজবা মায়ের চরণোদ্দেশে মস্তকের উপর দিয়া ক্ষিপ্রার খরস্রোতে নিক্ষেপ করিলেন এবং আনতবদনে করুণনয়নে তারার মুখপানে তাকাইলেন, কিন্তু সে দৃষ্টি শূন্য; শীর্ণদেহ কাঁপিতে লাগিল, আর স্থির থাকিতে পারিল না। ত্রস্তহস্তে তারা স্বীয় স্কন্ধোপরি মায়ের মস্তক রক্ষা করিয়া অনিমিষলোচনে সে মুখ দেখিতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিলেন, শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল, নয়ন অর্দ্ধনিমিলিত; দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে আর এক একবার মুখ ব্যাদন করিতেছে। যেন সঙ্কেতে বলিতেছে—"সিদ্ধোদক দাও মুখে, চলে যাই শিবলোকে।" তারা উৎকণ্ঠিত প্রাণে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; আর মনে মনে উন্মাদিনীর শান্তি কামনা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে মঙ্গলা সহ লালজী মায়ের চরণামৃত লইয়া দেবীঘাটে পৌঁছিলেন। তারা মায়ের মুখে সিদ্ধোদক দিলেন, সে টুকু গলাধঃ হইলে আবার দিলেন; এবারও চরণামৃত গলাধঃ হইল—কিন্তু তৃতীয় বার প্রদত্ত জলবিন্দু উদরস্থ হইল না, গড়াইয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে নাতিদীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্বায়ুতে

মিশিয়া গেল। কেবল পঞ্চভূতাত্মক দেহপিঞ্জর দেবীঘাটে পড়িয়া রহিল। মঙ্গলা কল্যাণীর নির্ম্মাল্য উন্মাদিনীর মস্তকোপরি ছড়াইয়া দিলে আকাশবাণী হইল—শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! মঙ্গলা বুঝিলেন, আজ উন্মাদিনীর কঠোর সাধন সিদ্ধ হইল।

নওয়াগড়ে তখনও রাটগণের বাস ছিল; তারার নিদেশক্রমে জ্ঞাতি কুটুম্বগণ চন্দনকাষ্ঠে মৃতদেহের সৎকার করিল। সৎকারান্তে লালজী, মঙ্গলা ও চঞ্চলা ক্ষিপ্রার জলে অবগাহন করিয়া কল্যাণে ফিরিলেন। পথে চলিতে চলিতে চঞ্চলা কহিলেন, নওয়াগড়ের লীলাও আজ ফুরাইল। এখন দানপত্রের সমুচিত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

লালজী—সে ব্যবস্থাও মন্দিরস্বামীনীকেই করিতে হইবে।

মঙ্গলা—তাই আমি চাই, দেখি যদি এতে কিছু পাই।

সব আমি করব ঠিক—ব্যবসা টা যাজনিক;
মায়ের পালা হল শেষ,—এখন ছাড়াব তারার ভৈরবী বেশ।

শেষ কথা।

কল্যাণীর অনুগ্রহে চঞ্চলা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারিণী। অর্থানটনের কষ্ট কি তাহা চঞ্চলা বুঝিতেন না; আবার অপ্রত্যাশিত প্রাপ্ত অতুল অর্থরাশির সদ্ব্যবহারই বা কি তাহাও চঞ্চলা জানেন না। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেই চঞ্চলা সন্তুষ্টা; বসনভূষণের ঝাঁক তাঁহার নাই, উহা চঞ্চলার অঙ্গে এ পর্য্যন্ত উঠে নাই। চঞ্চলা ভাবিলেন, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসার স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, সেজন্য স্বামীর মাসিক আয়ই যথেষ্ঠ। বিষয়—বিষময়—অর্থ অনর্থের মূল; চিতুসর্দ্দারের পরিণাম দৃষ্টে এ কথা চঞ্চলার বুঝিতে বাকী ছিল না।

বাল্যকাল হইতেই চঞ্চলার যোগিনীবেশ; নিরাভরণা—বনবালা। পরিধানে গেরুয়া, কণ্ঠে ও বাহুমূলে রুদ্রাক্ষ। বিবাহের দিনে চঞ্চলাকে মাঙ্গলিকবেশে সাজাইতে গিয়া বিন্দু এক যোড়া রজত বলয় দিয়াছিলেন, তাহাই মাত্র চঞ্চলার আভরণ! চঞ্চলা এখন গৃহিণী—বীরপত্নী; সংসারীকে যোগিনীর বেশে থাকিতে নাই। সে দৃশ্য মঙ্গলার চক্ষে অসহ্য। বিবাহের কালে যৌতুকস্বরূপ রমা যাহা দিয়াছিলেন, বিন্দু বিদায় হওয়ার সময় তাহা মঙ্গলার হাতে দিয়া গিয়াছেন। আজ মঙ্গলা সেই গজদন্তনির্ম্মিত বাক্স খুলিয়া দেখিলেন, উহা মণিমুক্তাখচিত রত্নাভরণে পূর্ণ। আগ্রহ সহকারে মঙ্গলা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কণ্ঠী, কঙ্কণ, কেয়ূরবন্ধ, করণফুল ও নৎ এই পঞ্চাভরণ যৌতুক দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দেশে এই আভরণেরই বিশেষ আদর।

মঙ্গলা পরমোল্লাসে তদাভরণে চঞ্চলাকে সাজাইলেন, গেরুয়া ছাড়াইয়া শাড়ী পরাইলেন ; যোগিনীবেশ গিয়া এখন চঞ্চলার রাণীর বেশ হইল। হইল না কেবল ঐশ্বর্য্যের ছটা—রাণীগিরীর ঘটা ; সে সব চঞ্চলার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

অপর প্রাপ্ত সম্পত্তির সদ্ব্যবস্থা হইল—

১ম—উদয়গিরিতে বাসোপযোগী এক সুরম্য হর্ম্ম্য বিনির্ম্মিত হইল ; লালজী সাধ করিয়া সে ভবনের নাম রাখিলেন,—"করোঞ্চা কুটীর।"

২য়—প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এক বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নওয়া-গড়ের নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামামূর্ত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিত্য সেবার জন্য উপযুক্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করা হইল।

৩য়—মন্দিরের সঙ্গে এক পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া অন্নচ্ছত্র খোলা হইল ; বান্ধববিহীন পীড়ারীগণের জন্য এ অন্নছত্র অবারিত থাকিল। মায়ের নিত্যসেবার ভার চঞ্চলা নিজের হাতে লইলেন ; মায়ের প্রসাদ না লইয়া চঞ্চলা জলবিন্দুও গ্রহণ করিতেন না।

৪র্থ—অনুশীলায় বিন্দুর অপূর্ব্ব যোগ সাধনের স্মৃতিরক্ষার্থ একটী আশ্রম নিম্মাণ করাইয়া শৈলেশ্বরের শিবময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এ আশ্রমের নাম হইল, **"শব-সাধন।"** সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য এ আশ্রম নির্দ্দিষ্ট থাকিল। শৈলে-শ্বরের সেবার জন্যও উপযুক্ত দেবোত্তরের ব্যবস্থা হইল।

৫ম—চিতু সর্দ্দারের নির্দ্দেশানুসারে উদয়গিরির দরবার স্থানে

এক উন্নত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া শীর্ষদেশে স্বুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইল—"**ঠগী-দমন**।" পীণ্ডারী দলন ইংরাজ রাজত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি। "ঠগী দমন" সে অক্ষয় কীর্ত্তির বিজয় পতাকা উন্নত মস্তকে ধারণ করিয়া স্বর্গে মর্ত্তে ইংরাজ রাজের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

৬ষ্ঠ—কল্যাণীর নামে প্রদত্ত সম্পত্তির আয় নিতান্ত সামান্য নহে। মন্দিরস্বামিনী মঙ্গলার ইচ্ছা—উহা অন্য কোন উপযুক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হয়। ভগবানের ইচ্ছায় মায়ের সেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ই যথেষ্ট। দেবীর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ! উপর্য্যুপরি দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইলেও মায়ের নিত্য সেবার ক্রুটি হইবার আশঙ্কা নাই। সুতরাং সর্দ্দারের প্রদত্ত অর্থে কল্যাণে একটী উচ্চশ্রেণীর "আর্ত্তনিবাস" খোলা হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই মঙ্গলা ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। পরদিন দেখা গেল, কাকাতুয়াও আর বাঁচিয়া নাই! চঞ্চলার অত্যাগ্রহাতিশয়ে আর্ত্তনিবাসের নাম হইল—"**মঙ্গলাধাম**।"

অতঃপর **শব-সাধন** সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আর কোন কথা রহিল না।

সমাপ্ত।